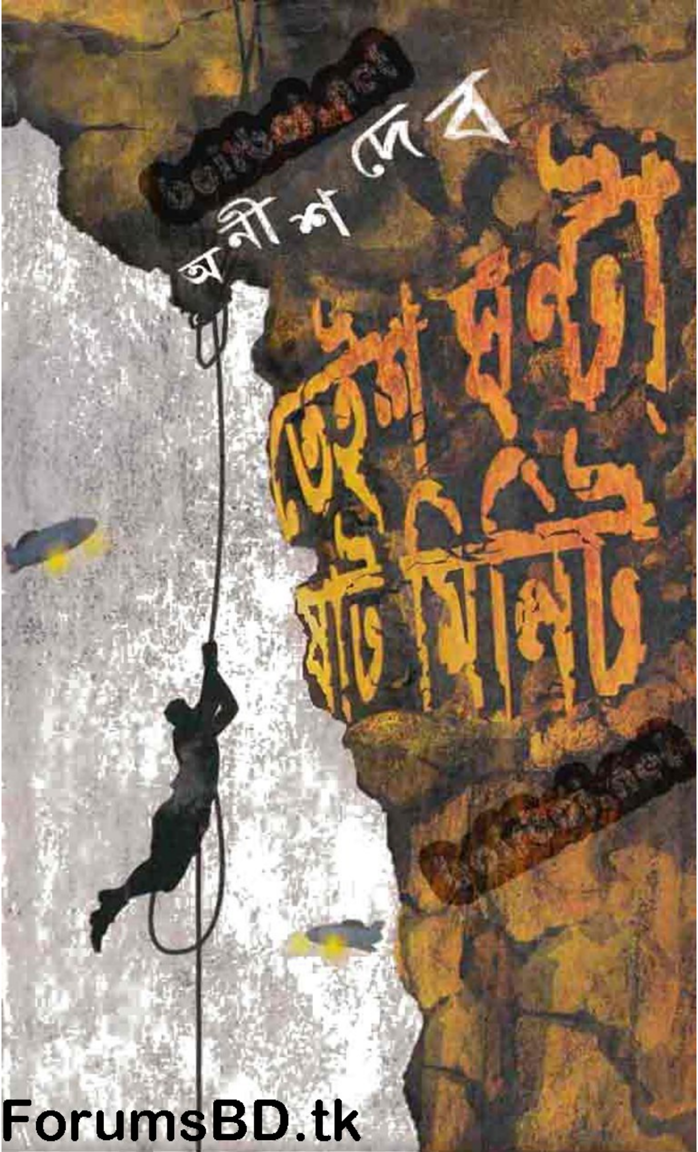
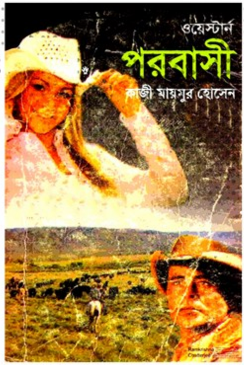

অনীশ দেব
তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট

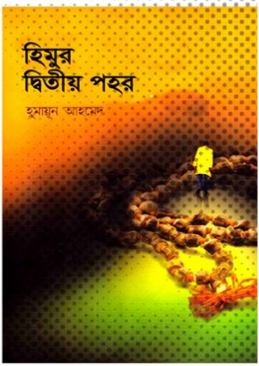
Our
Next Releases

on

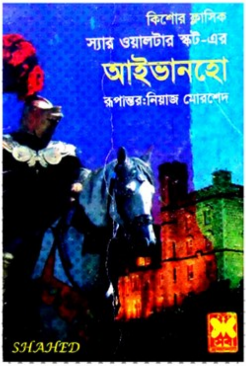
Forumsbd.tk

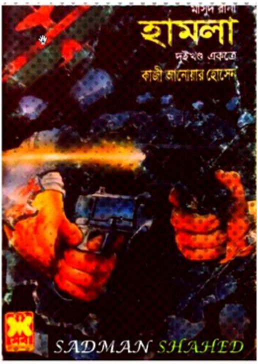
Stay TunED

















অনীশ দেব

তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট



পত্র ভারতী

TEISH GHANTA SHAAT MINUTE

by

Anish Deb

ISBN No. 978-81-8374-068-5

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সৌরীশ মিত্র

মূল্য

১৪০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com
Website . bookspatrabharati.com
Price Rs. 140.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

লেখকের অন্যান্য বই

ভয়পাতাল
হিমশীতল
আমি পিশাচ
মার্ডার ডট কম
দুঃখী রাজকুমার
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু
সহজ কথায় রোবট
সহজ কথায় ইন্টারনেট
সহজ কথায় টেলিভিশন
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
বিজ্ঞানের হরেকরকম
ভৌতিক অলৌকিক
অন্তরে পাপ ছিল
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
সেরা কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
বিশ্বের সেরা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩ (সম্পাদিত)
রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প (সম্পাদিত)

এক মিনিট—আপনাকে বলছি!

বইটা পড়া শুরু করার আগে যদি কয়েকটা কথা জেনে নেন তা হলে আমার খুব ভাল্লো লাগবে।

ফিউচারিস্টিক থ্রিলার 'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট' 'কিশোর ভারতী' পত্রিকায় শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালের পুজো সংখ্যায়। লিখতে বোধহয় অনেক সময় নিচ্ছিলাম, তাই লেখা শেষ হওয়ার আগেই পুজো সংখ্যা বেরিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে আমার লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে দেখে আশ্চর্য হলাম, লজ্জাও পেলাম। কারণ, লেখার শেষে ছাপা রয়েছে 'প্রথম পর্ব' সমাপ্ত। বন্ধু এবং সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় পুজো সংখ্যায় আমাকে জায়গা দিতে চেয়েছেন, তাই ব্যাকরণ না মেনে 'অসমাপ্ত' উপন্যাস প্রকাশ করেছেন। এই ভালোবাসা আমাকে অভিভূত করেছে।

কিন্তু তারপরই কীরকম যেন একটা আলোড়ন টের পেলাম। অনেক পাঠকই দপ্তরে ফোন করে প্রশ্ন করছেন, উপন্যাসটির পরবর্তী অংশ কবে বেরোবে। যেহেতু এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর একমাত্র লেখকই দিতে পারেন তাই দপ্তর থেকে আমার সেল ফোন নম্বর বহু পাঠককেই দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা আমাকে প্রশ্নবাণে প্লাবিত করেছেন, কিন্তু আমি কাউকে সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। কোনওরকমে বলেছি ২০০৫ সালের পুজো সংখ্যায় লেখাটি শেষ হবে। একজন পাঠিকা, যতদূর মনে পড়ে তিনি নিজের নাম বলেছিলেন ঝুমুর গাঙ্গুলি, আমাকে একাধিকবার ফোন করে অনুরোধ করেছিলেন, 'ফোনে আমাকে শেষটা বলে দিন না!' তখনও অসহায়ভাবে বলেছি, 'কী করে আপনাকে বলব? শেষটা তো আমি নিজেই জানি না!'

২০০৫ সাল এল। 'কিশোর ভারতী' পুজো সংখ্যাও বেরোল। কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করেও লেখাটা শেষ করতে পারলাম না। লেখাটা ক্রমেই যেন দৈর্ঘ্যে বেড়ে যাচ্ছিল। তাই প্রকাশিত হল 'দ্বিতীয় পর্ব'। লেখার শেষে ছাপার অক্ষরে. পাঠক এবং সম্পাদকের কাছে মার্জনা চাইলাম, উপন্যাসটা শেষ করতে পারিনি বলে। কারণ, পুজো সংখ্যায় 'ধারাবাহিক' উপন্যাস ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। সুতরাং আমার লজ্জা অনেক বেড়ে গেল।

কিন্তু উপন্যাসটা 'নির্লজ্জভাবে' দৈর্ঘ্যে বেড়েই চলল। ২০০৬, ২০০৭ এবং ২০০৮-এর পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হল আরও তিনটি পর্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখাটা শেষ হল না। আমার তখন যে কী মর্মান্তিক অবস্থা, সে

একমাত্র আমিই জানি। আমার তৈরি চরিত্রগুলো তখন আমাকে নিয়ে স্রেফ লোফালুফি খেলছে। যা খুশি তাই করছে। আমি প্রাণপণে লিখে চলেছি, কিন্তু কাহিনি কিছুতেই 'শেষ' পৃষ্ঠায় পৌঁছচ্ছে না। তখন আমার লেখার জন্য বেশি জায়গা বরাদ্দ করতে এবং আমাকে মানসিক 'যন্ত্রণা' থেকে বাঁচাতে অনেক আকুতিমিনতি ইত্যাদির পর সম্পাদক উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের বন্দোবস্ত করলেন। তাই ২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে 'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট' 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিকভাবে বেরোতে শুরু করল। সেপ্টেম্বর সংখ্যায় উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ইতি টানলাম। সেই লেখাটিই এখন বই হয়ে আপনার হাতে।

বিগত পাঁচ বছরে কত পাঠক-পাঠিকা এই উপন্যাসটি সম্পর্কে দপ্তরে খোঁজ নিয়েছেন। 'কবে শেষ হবে?' এই প্রশ্নও করেছেন বারবার। 'কলকাতা বইমেলা'-য় আমাকেও কথবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু কখনও সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। তাই আজ প্রথম খণ্ড আপনার হাতে তুলে দিতে পেরে অনেকটা হালকা লাগছে। এর পরবর্তী পর্যায় 'কিশোর ভারতী'-র পাতায় 'ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা' নামে ২০১০-এর জানুয়ারি থেকে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

এই উপন্যাস যখন লিখতে শুরু করি তখন আমাদের এখানে টিভিতে রিয়েলিটি শো শুরু হয়নি। তবে 'রোজগেরে গিন্নি' গোছের নিরীহ গেম-শোগুলো টিভিতে দেখার সময় আমার মনে হত যে, প্রাইজ মানি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়ে অভাবী—অথবা, লোভী মানুষকে দিয়ে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো যেতে পারে—হয়তো প্রাণ নিয়ে খেলা করতেও তারা রাজি হয়ে যাবে। এই ভাবনা থেকেই এই উপন্যাসের শুরু।

সবশেষে আগ্রহী পাঠক হিসেবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি—বা আপনারা—আগ্রহ এবং কৌতূহল না দেখালে এই লেখা যে-পথ ধরে এগিয়েছে সেই পথ ধরে চলতে পারত কি না কে জানে! আপনাদের নিয়মিত উৎসাহ আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে। তাই এই ফিউচারিস্টিক থ্রিলার আপনার জন্য। এই বইটা শেষ করার পর যাতে আপনাকে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে না হয় তার জন্য আমি অন্তত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব। নমস্কার—

জানুয়ারি ২০১০

অনীশ দেব

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০ ০০৯

'ধরা যাক, জঙ্গলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বাঘ এবং একজন মানুষ। মানুষটির হাতে রাইফেল থাকলেও এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, বাঘ হচ্ছে শিকার, আর মানুষ হচ্ছে শিকারি। ব্যাপারটা উলটোও হতে পারে।'

'থিয়োরি অফ গেম : হান্টার অ্যান্ড দ্য হান্টেড'

লেখক জেম্স ডি. প্যাটারসন

প্রকাশক ফিউচার টেল্স, প্রকাশকাল ২০১১

মুদির দোকানের কাছে পৌঁছে পকেটে হাত ঢোকাল জিশান। এবং সঙ্গে-সঙ্গে আঁতকে উঠল। পকেটে টাকা নেই!

অথচ একটু আগেই তো ছিল! একটা একশো টাকার নোট, একটা পঞ্চাশ টাকার নোট, একটা কুড়ি টাকার নোট, আর কিছু খুচরো পয়সা। এখন শুধু খুচরো পয়সাগুলো পড়ে আছে।

কী হবে এখন! বহু কষ্টে গতকাল দুশো টাকা রোজগার করেছে। তখনই ঠিক করেছে প্রথমেই শানুর জন্য একটা দুধের কৌটো কিনবে। ছ'মাসের বাচ্চাটা এ পর্যন্ত ছ'সপ্তাহের দুধ পেয়েছে কি না বলা মুশকিল। ওর খিদের কান্না জিশানকে পাগল করে দেয়। আর তার সঙ্গে জুড়ে যায় মিনির কান্না। বাচ্চার কষ্ট কোন মা-ই বা সইতে পারে!

কিন্তু তাই বলে মিনি কখনও জিশানকে দোষ দেয় না। কারণ, সাংঘাতিক অভাব-অনটনের কথা জেনেশুনেই তো ও জিশানকে বিয়ে করেছে। তখন জিশান একটা লোহালক্কড়ের কারখানায় কাজ করত—বিয়ের কয়েকমাস পরেই ওটা লকআউট হয়ে যায়। তারপর...তারপর থেকে জিশান রোজই কাজের খোঁজে বেরোয়। যা কাজ পায় তাই করে—শুধু কোনওরকমে কিছুটা টাকা জোগাড় করতে পারলেই হল।

বারকয়েক পকেট হাতড়ে দোকানের কাছ থেকে সরে এল জিশান। ওর নাকে একটা পোড়া গন্ধ এল। ও চোখ ঘুরিয়ে তাকাল সেদিকে। কয়েকটা লোক রাস্তার পাশে একটা আবর্জনার ভ্যাটের কাছে তার পোড়াচ্ছে। লোকগুলোর পোশাক ছেঁড়া-খোঁড়া নোংরা। তার ওপর মাথার যা অবস্থা। কতদিন স্নান করেনি কে জানে।

লোকগুলো ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে আগুনের কুণ্ডলী ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারের প্লাস্টিকটা পুড়ে গেলে ভেতরের তামা কিংবা অ্যালুমিনিয়ামটা ওরা ওজনদরে বেচে দেবে।

প্লাস্টিক পোড়া ধোঁয়া পাক খেয়ে-খেয়ে ওপরদিকে উঠছিল। মাথা তুলে ওপরে তাকাল জিশান। ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় রাতের আকাশের সুন্দর কালো রংটাই আর নেই—কেমন যেন লাল আর হলুদের আভা মেশানো ঘোলাটে হয়ে গেছে।

না, শুধু এই তার পোড়ানো ধোঁয়ার জন্য নয়। এই শহরের নানান জায়গায় শুধু কলকারখানা, গাড়ি আর উনুনের ধোঁয়া। প্রায় পনেরো বছর ধরে জিশান এই ব্যাপারটা দেখছে। এ ছাড়া রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, খানাখন্দে ভরা, যেখানে-

সেখানে নোংরার স্তূপ, বাড়িগুলো জীর্ণ মলিন, রাস্তার বেশিরভাগ আলোই খারাপ—সারানোর কেউ নেই, পুলিশ-প্রশাসন বলেও কিছু নেই। সরু ঘিঞ্জি রাস্তায় যে-গাড়িগুলো চলে তাদের মডেল এত পুরোনো যে, ভিনটেজ কার বলা যায় অনায়াসে। আর তাদের যেরকম দোমড়ানো মোচড়ানো চেহারা তাতে সেগুলো যে এখনও চলছে সেটাই বড় কথা।

এককথায় শহরটা আর বেঁচে নেই। আর বেঁচে আছে বলে যদি ধরে নেওয়া যায় তা হলে বলতে হয় শহরটার যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত এবং ক্যান্সার হয়েছে। সবাই এটাকে বলে 'ওল্ড সিটি', কিন্তু জিশান বলে 'ডেড সিটি'। এই শহরটা কেউ চালায় না—নিজে থেকে চলছে।

জিশান বাবার কাছে শুনেছে, নব্বই কি একশো বছর আগেও এই শহরের নাম ছিল কলকাতা। তারপর নতুন একটা শহর তৈরি হল তার পাশে। নাম হল 'নিউ সিটি'। নিউ সিটির গড়ে ওঠার কাজ চলতে লাগল, আর একইসঙ্গে অনাদরে অবহেলায় ভাঙতে লাগল ওল্ড সিটি।

এখন, প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছরের ভাঙা-গড়ার খেলার পরে, ওল্ড সিটি যখন ধুঁকছে, নিউ সিটি তখন টগবগ করছে—সেখানে সবকিছুই নতুন, ঝাঁ চকচকে, ব্যাপক।

মাথা তুলে আকাশে তাকাল জিশান। ধোঁয়াশা পেরিয়ে অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে পেল। গত কুড়ি-বাইশদিন ধরেই দৃশ্যটা সবার চোখে পড়ছে। দুটো প্রকাণ্ড ধূমকেতু পাখনা মেলে ছড়িয়ে রয়েছে আকাশে। একটার রং লাল..., আর অন্যটার আভা নীল। ওদের লেজদুটো ক্রমশ চওড়া হয়ে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। ওদের পাশে চাঁদের কুমড়োর ফালিটা কেমন ফ্যাকাটে অসুস্থ মনে হচ্ছে।

আনমনাভাবে পথ হাঁটতে শুরু করল জিশান। বাড়িতে ফিরে কী বলবে মিনিকে? এরকম বোকার মতো টাকা হারানোর কোনও মানে হয়। শানুর কথা ভেবে ওর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

আর ঠিক তখনই একটা লোক ছুটে এসে জিশানকে ধাক্কা দিল।

জিশান পড়ে যেতে-যেতে কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিল। তারই মধ্যে টের পেল, লোকটা ধাক্কা মারার সময় ওর পকেটে হাতটা ঢুকিয়েই আবার বের করে নিয়েছে। এবং একইসঙ্গে প্রাণপণ দৌড় লাগিয়ে ঢুকে গেছে একটা অন্ধকার গলিতে।

পকেটে হাত দিয়ে দেখল জিশান। খুচরো পয়সা খানিকটা কমে গেছে। মনে-মনে ভীষণ রাগ হল ওর। পকেটমারি-ছিনতাই এ-শহরে রোজকার ঘটনা। জিশান সবসময় সাবধান থাকে বটে, অথচ একটু আগে একশো সত্তর টাকা উধাও হওয়ার ব্যাপারটা ও একেবারেই টের পায়নি।

মুখে একটা তেতো ভাব, মনে একরাশ বিরক্তি—এই অবস্থায় জিশান

এলোমেলো দিশেহারাভাবে হাঁটতে শুরু করল। নাঃ, ওল্ড সিটিতে ওর বিরক্তি ধরে গেছে। এখানে শুধু দুঃখ আর অভাব। দিনের বেলা সূর্য উঠলেও আসলে চব্বিশ ঘণ্টাই অন্ধকার। ষোলো বছর আগে বাবা যদি হঠাৎ করে গরিব হয়ে না যেত তা হলে জিশানকে কোনওদিন ওল্ড সিটিতে আসতে হত না—নিউ সিটিতেই ও বেশ সুখে থাকতে পারত।

কিন্তু সেটা হয়নি। নিউ সিটিতে সবাই এত বড়লোক যে, সেখানে জীবন চালানোর খরচ অনেক বেশি। সবকিছুর দাম প্রায় আকাশছোঁয়া। চারিদিকে অঢেল সুখ আর আহ্লাদ। বাবার মুখেই এসব কথা শুনেছে জিশান। তখন ও খুব ছোট।

বাবা আর নেই। চোদ্দো বছর আগে বাবা চলে গেছে।

'অ্যাই, জিশু!'

কে যেন আচমকা ডাকল জিশানকে।

ফিরে তাকাল জিশান। দেখল, হনহন করে হেঁটে আসছে মানিক।

ওর ছোটবেলার বন্ধু জিশান। একসময় একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে। দুটো পয়সা উপায় করার জন্য বাগজোলা খালে মাটিও কেটেছে দুজনে।

মানিকের লম্বা শক্তপোক্ত চেহারা—অনেকটা জিশানের মতোই। তবে জিশানের মতো ফরসা নয়, ঠিক উলটো—কুচকুচে কালো। হাসলে পর অন্ধকার রাতের তারার ঝিকিমিকির মতো দাঁতের সারি ঝলসে ওঠে। এখনও তাই হল।

একটু পা টেনে টেনে চলে মানিক। কাছে এসে ও জিশানের কাঁধ চাপড়ে দিল : 'কী রে, মুখখানা এরকম আউল-অ্যাভিল কেন?'

মানিক সময়সময় পাখির নামগুলো ইংরেজিতে বলে। এককালে যে ওয়ার্ডবুক মুখস্থ করেছে সেটা কিছুতেই ভুলতে চায় না।

জিশান ওকে টাকা হারানোর গল্পটা বলল।

মানিক শব্দ করে থুতু ফেলল ঘেন্নায়. বলল, 'এই নোংরা শহরটায় সালা আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু নিউ সিটিতে যে যাব সে-ক্ষমতাও নেই। এমনই পোড়া কপাল।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মানিক বলল, 'তবে আমি হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করছি দেখি কিছু করতে পারি কি না।'

জিশান জানে, মানিক কী চেষ্টা করছে। নিউ সিটিতে অনেক গেম শো হয়। তাতে প্রচুর টাকার প্রাইজ মানি থাকে। আর প্রতিটি খেলা লাইভ টেলিকাস্ট করা হয়। এই খেলায় একবার দাঁও মারতে পারলেই নবাব। দুনিয়া মুঠঠি মে। কিন্তু খেলাগুলোয় দারুণ ঝুঁকি রয়েছে। এক-একটা খেলা তো একেবারে দম বন্ধ করা ব্যাপার। খেলাগুলোর বেশিরভাগই চালায় 'সুপারগেমস কর্পোরেশন'।

যেমন, 'স্নেকস অ্যান্ড জেমস' নামের একটা খেলায় সাপের চৌবাচ্চায় নেমে খালি হাতে ছড়ানো ছিটানো হিরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে আসতে হয়। চৌবাচ্চায় ফুটখানেক ঘোলা জল। তার মধ্যে কিলবিল করছে বিষধর সাপ। আর

জলের তলায় ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় নানান মাপের হিরে। যে-ক'টা হিরে নিয়ে যে বেঁচে উঠে আসবে সেগুলো তার। যদি সেই প্রতিযোগী হিরেগুলো বিক্রি করতে চায় তা হলে 'সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন' টাকা দিয়ে সেগুলো কিনে নেয়।

আর-একটা খেলার নাম 'ম্যানিম্যাল রেস'। ম্যান আর অ্যানিম্যাল—দুটো শব্দ জুড়ে তৈরি হয়েছে ম্যানিম্যাল। এই দৌড়ে অংশ নেয় কয়েকজন মানুষ আর একপাল তাগড়া বুনো কুকুর। এই দৌড়ে শুধু ফার্স্ট হলেই চলবে না, গায়ে কুকুরের আঁচড়-কামড়ের চিহ্ন থাকা চাই। তবেই পাওয়া যাবে পুরস্কার। দু-লক্ষ টাকা।

প্রাইজ মানির অঙ্কটা শুনলেই জিশানের বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। কতবার যে ও স্বপ্নে দেখেছে, ও খেলায় জিতে পুরস্কার নিচ্ছে, আর মিনি শানুকে কোলে নিয়ে তার লাইভ টেলিকাস্ট দেখছে। তারপর থেকে ওদের সংসারে অভাব আর নেই।

নিউ সিটির সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন এইসব বিপজ্জনক খেলার প্রতিযোগী খুঁজে পায় ওল্ড সিটি থেকেই। ওল্ড সিটির অনেকেই এই খেলায় জিতে ভাগ্য বদল করতে পেরেছে। তখন ওল্ড সিটি ছেড়ে তারা নিউ সিটির পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে গেছে। সেই কারণেই ওল্ড সিটির বহু বেপরোয়া যুবক এইসব হাই-রিস্ক গেম্‌সে জেতার স্বপ্ন দ্যাখে।

ওল্ড সিটির সব জায়গাতেই টাঙানো রয়েছে ন্যানোটেকনোলজির প্লেট টিভি। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সেই টিভিতে প্রায় একশো চ্যানেল দেখানো হচ্ছে। তার মধ্যে গোটা চল্লিশ চ্যানেলে শুধু নানারকম গেম শো। কখনও লাইভ টেলিকাস্ট, কখনও পুরোনো বাঁধানো ফটোর মতো দেখতে হালকা এবং চ্যাপটা এই টিভিগুলো নিউ সিটির 'সিন্ডিকেট' টাঙিয়ে দিয়েছে ওল্ড সিটির কম করেও এক লক্ষ জায়গায়। চারঘণ্টা সূর্যের আলো পেলেই একটা প্লেট টিভি বিনা ব্যাটারিতে চারশো ঘণ্টা চলতে পারে। গরিব এই শহরে বলতে গেলে এটাই সকলের একমাত্র মনোরঞ্জন।

মালিক প্রায়ই জিশানকে এই খেলার ব্যাপারে ওসকায়। বলে, 'চল, একটা রিস্ক নিই।'

জিশান অতটা সাহসী হতে পারে না। ও মালিকের মতো ঝাড়া হাত-পা হলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু ওর কিছু হলে তখন মিনি আর শানুর কী হবে? তা ছাড়া মিনি এ ধরনের ফাটকা খেলা পছন্দ করে না।

মালিক বলে, 'তোর যদি লটঘট কিছু হয়, তা হলে প্রাইজ মানির টুয়েন্টি পার্সেন্ট তোর ফ্যামিলি পাবে। তুই জানিস না, খেলায় নামার আগে ওরা "নিউলাইফ ইনশিয়োরেন্স" কোম্পানি থেকে স্পেশাল ইনশিয়োরেন্স করিয়ে দেয়।'

হ্যাঁ, জানে জিশান। এবং এও জানে, সেই ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির

মালিকও বকলমে সুপারগেমস্‌ কর্পোরেশন। কিন্তু তাও...।

'চল, আমাদের ওল্ড সিটির ফাইট গেম দেখবি চল।' জিশানের হাত ধরে টান মারল মালিক। নিউ সিটির দেখাদেখি ওল্ড সিটিতেও গেম শো-র হিড়িক পড়ে গেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, হাতাহাতি লড়াই—'ফাইট গেম'।

মালিক বলল, 'লাস্ট উইকে আমি আড়াইশো টাকা জিতেছি।'

শুনে হাসি পেয়ে গেল জিশানের। যে লক্ষ-কোটি টাকার স্বপ্ন দেখছে সে মাত্র আড়াইশো টাকা জিতেছে! আড়াইশোকে কত দিয়ে গুণ করলে একশো কোটি হয়? কারণ, একশো কোটি টাকা হল সুপারগেমস্‌ কর্পোরেশনের সবচেয়ে বেশি প্রাইজ মানি। ওদের 'কিল গেম' খেলায় জিততে পারলে এই মাথা-ঝিমঝিম-করা টাকার অঙ্ক পুরস্কার পাওয়া যায়। জিততে পারলে মানে বাঁচতে পারলে। কারণ, খেলাটা সত্যি-সত্যিই বাঁচা-মরার খেলা। ওল্ড সিটির কত মানুষ যে এই খেলায় নায়ক হওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে! চব্বিশ ঘণ্টার এই খেলায় যে নাম লেখাবে, ওল্ড সিটি আর নিউ সিটির মানুষের কাছে সে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সুপারহিরো। কারণ, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও একশো কোটি টাকা পুরস্কারের লোভে এই খেলায় নাম লেখানো বড় সহজ কথা নয়! আর খেলাটা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে একটানা লাইভ টেলিকাস্ট করা হয় গ্রেট টিভিতে। মাঝে-মাঝে থাকে বিজ্ঞাপনের ব্রেক।

জিশানকে হাত ধরে টানতে-টানতে এগোল মালিক। বলল, 'আজ শনিবার। খেলা ভালো জমবে। চাই কি তুইও দু-একদান লাক ট্রাই করে দেখতে পারিস। কে জানে, ফট করে জিতে গেলে হয়তো বাচ্চার দুধটা কিনে বাড়ি ফিরতে পারবি।'

'না রে, মিনি এসব জুয়া-ফুয়া পছন্দ করে না। তুই যা, আমি চলি—।'

জিশানের জামা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মালিক: 'আরে, একটু তো চল—না হয় একটা ফাইট দেখবি, তারপর কেটে পড়বি। তোর কোনও ভয় নেই—ক্রো-বার্ডও টের পাবে না।'

'কাকপক্ষী টের না পেলে কী হবে—মিনি ঠিক টের পাবে। ও খারাপ কাজের গন্ধ পায়। তা ছাড়া জুয়ায় জিতে সেই পয়সায় বাচ্চাকে দুধ খাওয়াব! নাঃ, আমায় ছেড়ে দে—আর একদিন যাব।'

'আজ আমার কথা শুনতেই হবে তোকে। একটিবার, প্লিজ। তোকে খেলতে হবে না—শুধু আমার খেলা দেখবি। ব্যস, হয়েছে তো!'

সুতরাং নাছোড়বান্দা মালিকের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল জিশান।

মাথার ওপর দিয়ে কয়েকটা 'গুটার' উড়ে গেল। নিউ সিটির পুলিশ ফোর্স আকাশে টহল দেওয়ার জন্য এই গুটার হাওয়াযান ব্যবহার করে। যন্ত্রটা নীল আর সাদা রঙের ডোরাকাটা একটা বড়সড় পটল যেন। তার গায়ে পাখনা লাগানো—লেজ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। রাতের আকাশে সেই আগুন স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

গুটারগুলো যখন হর্ন দেয় তখন মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ওদের হর্নের তীব্র শিসের মতো শব্দ কখনও-কখনও জানলার কাচও ভেঙে দেয়। শিস দিয়ে ওরা ওল্ড সিটির লোকজনকে সাবধান করে দেয়। বিপজ্জনক ভিড় বা জটলা থাকলে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আর শিসে কাজ না হলে বুলেট চলে—কখনও রবার-বুলেট, কখনও মেটাল-বুলেট।

হাঁটতে-হাঁটতে মানিকতলার খালের কাছে পৌঁছে গেল মালিক আর জিশান। পথে নানান জায়গায় দেখল, মানুষজন ভিড় করে প্লেট টিভিতে গেম শো দেখছে। নানান কোম্পানি নানারকম গেম শো দেখালেও সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের গেমগুলোই সবার সেরা।

সে-কথাই মালিককে বলছিল জিশান।

মালিক তাতে হেসে বলল, 'ওল্ড সিটির ফাইট গেমটাও কিছু কম নয়। গেমটা একবার দেখ—নেশা ধরে যাবে।'

কথা বলতে-বলতে হাসি-ঠাট্টা করতে-করতে একটা বিশাল কারখানার সামনে হাজির হল ওরা।

কারখানাটা উঠে গেছে বহুকাল। এককালে স' মিল ছিল—এখন তার ভাঙাচোরা কঙ্কাল পড়ে আছে। তার ভেতরে আলো-আঁধারিতে ঝুপড়ি বেঁধে আস্তানা গেড়েছে অসংখ্য লোক।

স' মিলের সামনের রাস্তায় পাইপ ফেটে ফিনকি দিয়ে জল বেরোচ্ছে। বাচ্চাকাচ্চা কোলে নিয়ে কয়েকজন মহিলা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। চার-পাঁচটা উনুন থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে লাল-নীল ধূমকেতুর দিকে।

স' মিলের অন্ধকার থেকে একটা মোটাসোটা ধেড়ে ইঁদুর বেরিয়ে এল। তারপর বেশ ধীরে-সুস্থে হেলেদুলে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল খালের দিকে।

একটা হইহই চিৎকার ওদের কানে আসছিল। আঙুল তুলে স' মিলের উলটোদিকের খালধারটা দেখাল মালিক, বলল, 'খালপাড়ে...নীচেটায় ফাইট হচ্ছে। জলদি চল।'

খালধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঘন আগাছা—মাঝে-মাঝে বড়-বড় গাছ। কোনও-কোনও গাছের তলায় ফেলে যাওয়া শীতলা ঠাকুর। রোদ-জল-বৃষ্টিতে ঠাকুরের হতমান অবস্থা।

ওরকমই একটা ঠাকুরের পাশে প্রচুর লোহালক্করের ডাঁই। তার মধ্যে গোটাপাঁচেক জং-ধরা ভাঙা গাড়িও আছে। একটা গাড়ির মাথায় আর-একটা গাড়ি চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তার পাশ দিয়ে এগিয়ে ঢাল বেয়ে খালের দিকে নামতে শুরু করল মালিক। জিশান ওর পিছু নিল।

একটা বড় গাছ পেরোতেই ঢালু ভাবে নেমে যাওয়া খালপাড়টা জিশানের চোখে পড়ল। খালপাড়ের ঢালে—বেশ খানিকটা নীচে—একটা এবড়োখেবড়ো সমতল জায়গা। সেখানে আগাছার জঙ্গল সাফ করে ময়দান-এ-জঙ্ তৈরি হয়েছে। তাকে ঘিরে জ্বলন্ত কেরোসিন কুপি, হ্যারিকেন আর মশালের আলো। ঠিক যেন মনে হচ্ছে দেওয়ালির রাত। আর সেই আলোর বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে বেশকিছু লোক উত্তেজনায় চিৎকার করছে : 'খতম করো! খতম করো!'

লড়াইয়ের রিং-টা খালপাড়ের ঢালে বেশ খানিকটা নীচে হওয়ায় রাস্তা থেকে চোখে পড়ার উপায় নেই। ফলে এখন ওটা নজরে আসামাত্রই জিশান একটা ধাক্কা খেল।

রিং-এর ভেতরে তখন লড়াই চলছে।

●

জিশান এই ফাইট গেমের কথা আগে শুনেছে, কিন্তু কখনও দেখেনি। তাই ও অবাক হয়ে দেখছিল।

একটা কদমছাঁট চুল লম্বা ছেলে একজন বেঁটেমতন লোকের সঙ্গে লড়ছিল।

ছেলেটার গায়ের রং ময়লা, এককানে মাকড়ি, গলায় কালো সুতোর মালায় ... লকেট ঝুলছে। ওর পোশাক বলতে একটা বাদামি রঙের হাতকাটা ..., আর ছেঁড়া জিনসের প্যান্ট।

বেঁটেমতন লোকটার গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, আর একটা কালচে হাফপ্যান্ট। মাথায় বড়-বড় চুল। কুতকুতে চোখ।

লড়াই চলছিল আর একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে একজন রোগা-সোগা লোক মিহি গলায় ফিরিওয়ালার মতো চেঁচাচ্ছিল : 'ফাইট দারুণ জমে উঠেছে। দেখা যাক, কে জেতে—কার্তিক, না ছুন্না। একে চার, একে চার...।'

ফিরিওয়ালা লোকটার হাতে অনেকগুলো নোট। মুঠো করে ধরে বাতাসে নাড়ছে। কেউ-কেউ হাত বাড়িয়ে তার হাতে টাকা দিচ্ছে। লোকটা টাকা নিয়ে একটা ... দিচ্ছে।

টাকাগুলো দেখে জিশানের তেষ্টা পেয়ে গেল, শানুর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ে গেল, কিছুক্ষণ আগে ওর পকেটের টাকাগুলো কেউ হাতিয়ে নিয়েছে।

হ্যারিকেন, কুপি, আর মশালের লাল-হলদে শিখা কাঁপছিল। সেই আলো ছিটকে পড়েছে দর্শকদের উল্লাস ভরা মুখে, লড়াকু কার্তিক আর ছুন্নার গায়ে।

আশপাশের লোকজনকে জিগ্যেস করে মালিক জানতে পারল, বেঁটেমতন লোকটার নাম কার্তিক, আর ... ছেলেটা ছুন্না। কার্তিক আগে অনেক

ম্যাচ জিতেছে। সেই তুলনায় ছুন্না একেবারেই নতুন—শুধু আগের ম্যাচটা জিতেছে। সুতরাং ছুন্নার ওপরে যারা বাজি ধরেছে, ছুন্না জিতলে তারা এক্টাকায় চারটাকা পাবে। আর কার্তিক জিতলে দশটাকায় তিনটাকা।

রিং-এর ভেতরটা সাফসুতরো করা হলেও জমি এবড়োখেবড়ো, কোথাও-কোথাও কাদা রয়েছে। তারই মধ্যে ছুন্না আর কার্তিক জন্তুর মতো লড়ছিল। ছুন্নার পা চলছিল বেশি, আর কার্তিকের হাত। আর দুজনেই মাঝে-মাঝে বিশ্রী ভাষায় একে অপরকে গালিগালাজ করছিল।

ছুন্না মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই কার্তিকের তলপেটে এক লাথি কষিয়ে দিল। 'ওঁক' শব্দ করে উঠল কার্তিক, ওর শরীরটা ভাঁজ হয়ে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। ছুন্না বেজির ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে উঠে খামচে ধরল কার্তিকের চুল—এক প্রবল হ্যাঁচকা টানে ওকে ছিটকে ফেলে দিল চারহাত দূরে। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে কার্তিক সপাটে এক ঘুষি কষিয়ে দিল ছুন্নার মুখে।

একটা ভোঁতা শব্দ হল। তারপরই ছুন্না চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আর কার্তিক শরীরটাকে গড়িয়ে ওর কাছে নিয়ে গেল। একখাবলা মাটি তুলে নিয়ে ঘুঁটে দেওয়ার মতো ঢঙে সজোরে থাবড়ে দিল ছুন্নার মুখে। এবং পলকে উঠে দাঁড়িয়ে ছুন্নার একটা পা একটানে তুলে নিল। সেটাকে গোড়ালি ধরে মুচড়ে শরীরটাকে বাঁকিয়ে চাপ দিতে লাগল। আর ছুন্না অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল।

বোঝা গেল, লড়াই শেষ।

দর্শক উল্লাসে জিগির তুলতে লাগল : 'কার—তিক! কার—তিক! কার—তিক!'

মালিক জিশানের কানে ফিসফিস করে বলল, 'সালা আমার তিরিশটা টাকা গেল।'

জিশান অবাক হয়ে মালিকের দিকে তাকাল। ও কখন ছুন্নার ওপরে বাজি ধরেছে কে জানে!

'তুই কখন টাকা লাগালি?'

'এখানে এসেই—।'

'এভাবে যখন-তখন বাজি ধরা যায়?'

'যায়। সেটা অ্যালাউ করবে কি না ঠিক করবে রেফারি—ওই যে, ওই টিংটিঙে লোকটা—যে নোটের গোছা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।'

রেফারি তখন বাজি জেতা লোকগুলোকে টাকা দিচ্ছে। কার্তিক আর ছুন্না একবালতি জল থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে রক্ত আর কাদা ধুয়ে নিচ্ছে। দু-তিনটে ছেলে ওদের সাহায্য করছে।

মিনিটপাঁচেক পরেই রেফারি আবার হাঁকতে শুরু করল : 'এবার পরের

ফাইট। সব সরে যাও—এবা[illegible] হবে পরের ফাইট। কে লড়বে বলো—কে লড়বে?'

জনতার মধ্যে তখন চাপা উত্তেজনা, জোর আলোচনা চলছে, কথাকাটাকাটিও হচ্ছে। কেউ বলছে, ভুমার মুখে কাদা লেপটে না দিলে কার্তিক মোটেই জিততে পারত না। আবার কেউ-বা বলছে, কার্তিকের গায়ে অসম্ভব জোর—আর প্রতিপক্ষের মার সহ্য করার ক্ষমতাও সাংঘাতিক।

রিং-এ কেউ ছিল না। হঠাৎই কার্তিক লাফিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর বক্সার কিংবা কুস্তিগিরদের ঢঙে নেচে-নেচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর রেফারি তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, 'বন্ধুগণ, দোস্তো, মাই ফ্রেন্ডস—কার্তিক আবার লড়তে রাজি আছে। আমাদের ফেবারিট ফাইটার কার্তিক। কে লড়বে ওর সঙ্গে? কে লড়বে? একজনও হিম্মৎদার ব্যাটাছেলে এখানে নেই? একটাও সাচ্চা বাপের ব্যাটা নেই?'

রেফারির চেঁচানি চলছিল, আর জনতার গুঞ্জনও চলছিল সমান তালে। মশাল, হ্যারিকেন আর কুপির আলোয় এ ওর দিকে তাকাচ্ছিল—চোখে প্রশ্ন : পয়সার লোভে কে কার্তিকের সঙ্গে লড়ার ঝুঁকি নেবে?

রেফারি তখন বুঝেছে বাজির দর না বাড়ালে কাউকে পাওয়া যাবে না। অথচ আর-একটা লড়াই হলে তার কমিশনটাও বাড়বে। তা ছাড়া এই ছন্নছাড়া গরিব মানুষগুলোর কাছে পয়সা বিরাট ব্যাপার। সুতরাং সে বাজির দর চড়াতে লাগল। বলতে লাগল, নতুন ফাইটার জিতলে একটাকায় ছ'টাকা। আর ফাইটারকে দেওয়া হবে একহাজার টাকা। ফাইটার যদি হেরে যায়, তা হলে পাবে মাত্র পঞ্চাশ টাকা।

জিতলে একহাজার টাকা!

শ্বাস টানল মালিক। চাপা গলায় জিশানকে বলল, 'একহাজার টাকা মাইরি অনেক। লড়ে গেলে হয়।'

জিশান অবাক হয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে। কী বলছে মালিক! কার্তিক পেশাদার ফাইটার—মালিক তার সঙ্গে কী করে পেরে উঠবে? মালিকের প্লাস পয়েন্ট একটাই—ওর জন্য চোখের জল ফেলার কেউ নেই। একমাত্র জিশান ছাড়া।

মালিক দিন-রাত এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, নানান ফুর্তি-ফার্তা করে, টাকা ওড়ায়। গুছিয়ে বাঁচার ইচ্ছেটা ওর মধ্যে একদম নেই। ওর নীতি হচ্ছে, রঙ্গরৌলি করে জিন্দেগি কাটাও। কিন্তু তাই বলে কার্তিকের সঙ্গে ফাইট।

জিশান বলল, 'তুই কি খেপেছিস?'

'কিন্তু জিশু, ভেবে দেখ, একহাজার টাকা। একবার রিস্ক নিলে হয়...।'

'ধুৎ, তুই কার্তিকের সঙ্গে পারবি না—।'

'পারতেও তো পারি!'

আশপাশের কয়েকজন দর্শক ওদের কথাবার্তা শুনছিল। তাদেরই একজন বলে উঠল, 'লড়ে যাও। তোমার তো দারুণ বডি।'

আর-একজন বলল, 'শুনলে না, জিততে পারলে হাজার টাকা। ঢুকে পড়ো, রিং-এ ঢুকে পড়ো।'

আচমকা দুজন লোক মালিকের একটা হাত ধরে শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ লড়বে! এ লড়বে!'

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে তুলকালাম ঘটে গেল।

টুলে দাঁড়ানো রেফারির কাছে পটাপট বাজির টাকা জমা পড়তে লাগল। জনতা নতুন লড়াই দেখার আশায় হইহই করে উঠল।

মালিক একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল—কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। আর জিশান লোকদুটোর হাত থেকে মালিককে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। বারবার বলতে লাগল, 'ও লড়বে না। ও লড়বে না।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। কয়েকটা হাত প্রবল ধাক্কায় মালিককে ছিটকে দিল রিং-এর ভেতরে। মালিক চিতপাত হয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে রেফারি একটা হুইস্‌ল বাজিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'স্টার্ট।' আর হিংস্রভাবে নেচে বেড়ানো কার্তিক চুলের মুঠি ধরে মালিককে একটানে তুলে নিল। কয়েকপলক তাকাল গোল হয়ে ঘিরে থাকা দর্শকদের দিকে। তারপর এক ভয়ঙ্কর চাপড় বসিয়ে দিল মালিকের গালে—কিন্তু ওর চুলের মুঠি ছাড়ল না।

মালিকের মুন্ডুটা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। অসহ্য ব্যথায় মনে হল চোয়ালটা বোধহয় এখনই খুলে পড়বে। কয়েক লহমার জন্য অসাড় হয়ে গেল মালিক। ওর চোখ বুজে গেল।

কিন্তু প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে একটা ব্যাপার আছে। বাঁচার তাগিদ কারও কিছু কম নেই। আত্মরক্ষার তাগিদও। হয়তো সেই তাগিদেই অনেকটা অটোমেটিক পুতুলের মতো কার্তিকের গলা টিপে ধরল মালিক। নদীতে ডুবে যাওয়ার সময় মানুষ যেরকম প্রাণপণে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, অনেকটা সেই ঢঙে মালিক কার্তিকের গলা টিপে ধরেছিল—যেন বাঁধন আলগা করলেই ও জলে ডুবে মারা যাবে।

কিন্তু কার্তিক পেশাদার ফাইটার। এ-লাইনে পুরোনো পাপী। তাই মালিক গলা টিপে ধরতেই ও ডান হাঁটু দিয়ে মালিকের দু-উরুর মাঝে এক জোরালো গুঁতো মারল। সঙ্গে-সঙ্গে হেঁচকি তোলার শব্দ করে মালিক মাটিতে খসে পড়ল, শরীরটাকে কেন্নোর মতো গুটিয়ে কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগল।

জিশান চিৎকার করে উঠেছিল, 'কী হচ্ছে কী? এখনই লড়াই বন্ধ করো। এভাবে যেখানে-সেখানে মারার নিয়ম নেই। বন্ধ করো ফাইট।'

দর্শকরা জিশানের কথা কানেই তুলল না। রক্ত দেখার খিদেয় জন্তুর মতো চিৎকার করতে লাগল। কে একজন বলল, 'ফাইটের মাঝে আবার নিয়ম দেখাচ্ছ! ধ্যাত্ বুরবাক!'

জিশান দু-হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে চাইল রেফারির কাছে। ধার[illegible]তে একটা মশাল থেকে আগুনের কুচি ছিটকে পড়ল ওর গলার কাছে। পিন ফোটানোর মতো যন্ত্রণা হল। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন গালাগাল দিল জিশানকে।

কোনওরকমে টুলে দাঁড়ানো রেফারির কাছে এসে পৌঁছল ও। লোকটা গভীর মনোযোগে মালিক আর কার্তিকের লড়াই দেখছে, একইসঙ্গে ফুকফুক করে বিড়ি টানছে।

জিশান চেঁচিয়ে অনেক কিছু বলছিল, কিন্তু লোকটা সেদিকে কোনও কানই দিচ্ছিল না।

রেফারির গায়ের তেলচিটে নোংরা পোশাকের বোটকা গন্ধ জিশানের নাকে আসছিল। ছুঁতে ঘেন্না করলেও শেষ পর্যন্ত ও মনের জোরে লোকটার প্যান্ট ধরে টান মারল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'এভাবে যেখানে-সেখানে মারার কোনও নিয়ম নেই—।'

লোকটা বিরক্ত হয়ে চোখ নামিয়ে তাকাল জিশানের দিকে। চোখের পলকে কুকুর-তাড়ানোর ভঙ্গিতে একটা লাথি চালাল জিশানের বুকে এবং দাঁত বের করে খিঁচিয়ে উঠল, 'কেট, সালা—কেট। এ ফাইটে ইল্লিগাল বলে কিছু নেই।'

তারপরই আবার খেলা দেখায় মন দিল।

জিশান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন দর্শক অশ্রাব্য গালিগালাজ করে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল সামনে থেকে।

লাথি-খাওয়া কুকুরের মতো সরে এল জিশান। ভিড় ঠেলে উঁকি মারল রিং-এর ভেতরে।

মালিকের অবস্থা তখন ভালো নয়। ওকে উপুড় করে একটা পা মুচড়ে ধরেছে কার্তিক। মালিকের অন্য পা-টা শূন্যে ছটফট করছে। সেই অবস্থায় কার্তিক কনুই দিয়ে মালিকের পিঠে গুঁতো মারছিল।

মালিক অতিকষ্টে পালটি খেল। কোনওরকমে জোড়া পায়ে ঝটকা দিয়ে ঠেলে দিল কার্তিককে। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল।

জিশান দেখল, মালিকের ঠোঁটের কোণ আর কপাল থেকে রক্ত পড়ছে। ওর গায়ের রং কালো বলে ব্যাপারটা খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে না। তবে জ্বলন্ত মশালের আগুনের আভায় গড়িয়ে পড়া রক্ত চকচক করছে।

জিশান বুঝতে পারছিল মালিকের হয়ে এসেছে। ও চিৎকার করে ডেকে

উঠল, 'মালিক। বেরিয়ে আয়—আর ফাইট করতে হবে না! চলে আয়...! মালিক। চলে আয়—!'

জিশানের গলার আওয়াজ পেয়ে মালিক সেদিক লক্ষ করে তাকাল। আলো-ছায়ার খেলার মাঝে জিশানকে খুঁজে নিতে চাইল।

মালিক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সেইজন্যই ছুটে আসা কার্তিককে ও খেয়াল করেনি। যখন করল তখন দেরি হয়ে গেছে।

বুলেটের মতো ছুটে এসে কার্তিক মাথা দিয়ে গুঁতো মারল মালিকের পেটে। বুনো ষাঁড়ের মতো ওর শরীরটাকে ঠেলে নিয়ে চলল রিং-এর ধারে দাঁড়ানো দর্শকদের দিকে।

প্রচণ্ড উত্তেজনার চিৎকার শোনা গেল। হুড়মুড়িয়ে দর্শকরা সরে গেল জায়গা থেকে—যাতে ফাইটারদের সঙ্গে সংঘর্ষ না হয়। আর তখনই রিং-এর বাইরে লোহালক্কড়ের ডাঁইটা নজরে পড়ল জিশানের। এতক্ষণ দর্শকদের ভিড়ে ওগুলো আড়াল হয়ে ছিল।

জিশান আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। ওর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠল। আর সেই বিস্ফারিত চোখের সামনেই মালিকের শরীরটা জং-ধরা লোহালক্কড়ের স্তূপে গিয়ে ধাক্কা খেল।

ঠিক কী যে হল ভালো করে বোঝা গেল না। বোঝা গেল একটু পরে কার্তিক যখন সরে এল মালিকের কাছ থেকে।

মালিকের দেহটা তখনও বলতে গেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চোখ বোজা। মাথাটা ঝুঁকে পড়ে চিবুকটা প্রায় বুকে ঠেকে গেছে।

কার্তিক তখন রিং-এর মধ্যে নৃশংস উল্লাসে নেচে বেড়াচ্ছে। ওর দেহের দু-চার জায়গা কেটে-ছড়ে গেলেও ও বিন্দুমাত্রও কাহিল হয়ে পড়েনি।

চারপাশে দর্শকদের হইচই চলছে। রিং-এর মধ্যে অনেকে ঢুকে পড়েছে। রেফারি সরু গলায় 'কার্তিক! কার্তিক!' বলে চেঁচাচ্ছে। সেই তালে-তালে দর্শকও চেঁচাচ্ছে, 'কার—তিক। কার - তিক!'

জিশান ছুটে গেল মালিকের কাছে। আর কাছাকাছি এসেই ওর মনে হল, মালিক বোধহয় আর বেঁচে নেই। হঠাৎই ক্রুশবিদ্ধ জিশুর ছবিটা ঝলসে উঠল ওর চোখের সামনে। ও হাত বাড়িয়ে মালিককে জড়িয়ে ধরল, টান মেরে তুলে নিতে চাইল বুকে, কিন্তু ওকে নড়াতে পারছিল না।

জিশান কেঁদে ফেলেছিল। বারবার মালিকের নাম ধরে ডাকছিল। তখন কয়েকজন দর্শক আর রেফারি মিলে জিশানের সঙ্গে হাত লাগাল। পিঠে গেঁথে যাওয়া লোহাগুলো অনেক কষ্টে ছাড়িয়ে মালিককে বের করে নিয়ে এল ওরা। মালিকের শরীরের পিছনদিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

জিশান [illegible] হাতিয়ারের [illegible] কাছাকাছি [illegible] টাওয়ার

জন্য এভাবে ঝুঁকি নিল মালিক।

কিন্তু মালিক তো ঝুঁকি নিতে চায়নি! উত্তেজনায় পাগল দর্শকের দল ওকে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিয়েছে রিং-এর ভেতরে। প্রেট টিভির গেম শো-গুলোই সবার সর্বনাশ করেছে। রোজ-রোজ নতুন-নতুন গেম চালু হচ্ছে টিভিতে। কী করে পলকে বড়লোক হওয়া যায়—এই চিন্তাটাই ঢুকে গেছে সবার মনের ভেতরে।

নিউ সিটির সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের ওপরে ভীষণ রাগ হল জিশানের। ওদের বিপজ্জনক খেলাগুলোয় সবসময় নাম দেয় ওল্ড সিটির লোকজন—যারা চট করে বড়লোক হতে চায়, যাদের জানের এমনিতে খুব একটা দাম নেই।

আর নিউ সিটির বড়লোকগুলো! এক-একটা সব ভিতুর ডিম! একটা গেম শো-তেও ওরা কেউ নাম দেয় না। ওরা শুধু বাড়িতে নিশ্চিন্তে বসে প্রেট টিভিতে খেলা দ্যাখে আর চিকেন-প্রন পকোড়ার সঙ্গে সুস্বাদু পানীয় খায়।

গেম শো-গুলোকে জনপ্রিয় করার জন্যই 'সিন্ডিকেট' অসংখ্য প্লেট টিভি বিনা পয়সায় লাগিয়ে দিয়েছে ওল্ড সিটিতে। টিভির ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রোগ্রামে স্রেফ বোতাম টিপেই গেম শো-তে নাম দেওয়া যায়।

সেই গেম শো নকল করতে পাগল ওল্ড সিটি। নকল নবিশির জেরে শেষ হয়ে গেল মালিক। এর হিসেব সমান করবে কে? জিশান?

গেম শো নিয়ে ঘৃণা আর টানের ফাঁদে পড়ে গেল জিশান। ওর চোখ ফেটে জল বেরোচ্ছিল।

মালিকের শরীরের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল ও। হঠাৎই টের পেল, মালিকের শ্বাস পড়ছে। চোখের জল মুছে ও 'মালিক!' বলে ডেকে উঠল। ওর মুখের ওপরে আরও ঝুঁকে পড়ল।

মালিক ধীরে-ধীরে চোখ খুলে জিশানকে দেখল। অনেকক্ষণ ঘোলাটে নজরে তাকিয়ে থেকে তারপর খুব অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে বলল, 'জিশু, ভেবেছিলাম লড়ব যখন ফ্যালকনের মতো লড়ব...কিন্তু সালা স্প্যারোর মতো লড়লাম। তুই ওকে উড়িয়ে দে। ওই কার্তিক সান্যালকে না উড়িয়ে তুই জল খাবি না। গড প্রমিস!'

মালিকের চোখ বুজে গেল। আর শ্বাস পড়ছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। আশেপাশে ভিড় করে থাকা লোকজন এতক্ষণ 'হাসপাতাল...ডাক্তার...' এসব বলছিল। ওরা হঠাৎই চুপ করে গেল। কে একজন চিৎকার করে বলল, 'সালা টেঁসে গেছে। বডিটা খালাস করে দে।'

সঙ্গে-সঙ্গে দু-তিনজন লোক এসে মালিকের বডিটা টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল।

জিশান প্রথমটা আটকাতে গিয়েছিল—কিন্তু কী ভেবে ছেড়ে দিল। কী হবে মালিকের বডি নিয়ে? বডি নিয়ে কোথায় যাবে ও? শ্মশানে ছাড়া?

জিশানের হাতে-জামায় রক্ত। নাকে মালিকের গায়ের গন্ধ টের পাচ্ছিল ও—বন্ধুত্বের গন্ধ।

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল জিশান। ঠিক তখনই একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ওর সামনে বাড়িয়ে ধরল কেউ।

মুখ তুলে তাকাল জিশান। ওর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে রেফারি। মালিকের হেরে যাওয়ার টাকাটা জিশানকে দিচ্ছে।

জিশানের বমি পেয়ে গেল। মুখে একগাদা থুতু উঠে এল পলকে।

টাকাটা জিশান নিতে চায়নি, কিন্তু হঠাৎই ওর মনে হল, ওটা মালিকের স্মৃতি। তা ছাড়া মালিক মারা যাওয়ার আগে ফিসফিস করে যা বলে গেছে সেই কথাগুলো এখন দামামা হয়ে জিশানের কানে বাজছে : '...কার্তিক সালাকে না উড়িয়ে তুই জল খাবি না। গড প্রমিস।'

মালিকের পাওনা টাকা আর পাওনা শপথের দায় এখন জিশানের।

জিশান আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল। ও ভালো করেই জানে, ওখানে গড বলে কেউ নেই—সেইজন্যেই আকাশটা দিনের বেলায় ফাঁকা আর রাতের বেলা অন্ধকার—এই নষ্ট শহরটার মতো অন্ধকার।

রঙিন ধূমকেতু দুটোর লাল-নীল আভা জিশানের চোখে পড়ল। ও মালিককে যেন আকাশে দেখতে পেল কোথায়। চোখ মুছে নজর নামাল জিশান। পঞ্চাশ টাকার নোটটা নিল রেফারির কাছ থেকে। লোকটার সারা গা থেকে বিড়ির গন্ধ বেরোচ্ছিল, তার সঙ্গে বোটকা গন্ধ।

জিশান দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আর-একটা ফাইট হয়ে যাক। এই কার্তিকের সঙ্গে আমি লড়ব।'

সঙ্গে-সঙ্গে রেফারির দু-চোখে ফস করে খুশির আলো জ্বলে উঠল। ডানহাত ওপরে তুলে লোকটা মিহি গলায় চেঁচাতে শুরু করল, 'কেউ চলে যেয়ো না। শুরু হচ্ছে নয়া ফাইট। কার্তিকের সঙ্গে লড়বে নতুন আনকোরা এক ইয়ং ফাইটার—' লোকটা চেঁচানো থামিয়ে নিচু গলায় জিশানকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'জিশান।'

'বন্ধুগণ, নতুন ফাইটার জিশান—আর আমাদের চ্যাম্পিয়ন কার্তিক।' আবার চেঁচানি শুরু হয়ে গেল : 'এটাই আজকের লাস্ট ফাইট। আজকের মারাত্মক লাস্ট ফাইট। জিশান ভার্সেস কার্তিক—দেখা যাক সালা কে জেতে—!'

চেঁচাতে-চেঁচাতে লোকটা চলে গেল ওর টুলের কাছে। প্রায় লাফিয়ে টুলের ওপরে উঠে দাঁড়াল। আর সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকরা ওর দিকে হামলে পড়ল। নানান প্রশ্ন করতে লাগল।

'একে বিশ, একে বিশ! জলদি করো! লাস্ট ফাইট—টিসুম-টিসুম—কাম

অন, কাম অন...।'

মাল্লিকের সঙ্গে লড়াই শেষ হওয়ার পর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা করছিল অনেকে। অনেকে আবার বাড়ির পথ ধরেছিল। মাল্লিকের মারা যাওয়ার ব্যাপারটা ওদের মনে তেমন দাগ কাটেনি। কারণ, এই ফাইট গেমে মাঝে-মাঝেই দু-একজন মারা-টারা যায়। এই গেমে যে ঝুঁকি আছে সেটা সবাই জানে। আর ঝুঁকি আছে বলেই খেলাটায় এত রোমাঞ্চ, এত উত্তেজনা।

রেফারির চিৎকার শুনে দর্শকদের ভাব-ভঙ্গি পালটে গিয়েছিল। শান্ত হয়ে যাওয়া মানুষগুলো আবার যেন রক্তের খিদেয় পাগল হয়ে গেল। ছত্রভঙ্গ জনতা চটপট নিজেদের গোল করে সাজিয়ে নিল—মাঝে জল-কাদা মাখা এবড়োখেবড়ো রিং। জনতার অনেকেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল রেফারির কাছে—ওকে মাছির মতো ছেঁকে ধরল। রেফারিও চটপট পেশাদারি ঢঙে বাড়িয়ে ধরা হাতগুলো থেকে ছোঁ মেরে টাকা নিয়ে ছোট-ছোট স্লিপ গুঁজে দিতে লাগল।

রিং-এর ভেতরে কার্তিক ততক্ষণে হিংস্র উল্লাসে লাফাতে শুরু করেছে। বড় বড় লাফ দিয়ে দর্শকদের নাকের ডগা ছুঁয়ে গোল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে গালাগালির ফোয়ারা।

জিশান রিং-এর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ওর গায়ে গোলাপি-সাদা চেক কাটা হাফশার্ট। তার এখানে সেখানে রক্ত লেগে রয়েছে—মাল্লিকের রক্ত।

জিশান শার্টটা খুলতে শুরু করতেই ঝিরঝিরে গুঁড়োর মতো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। শার্টটা খুলতে-খুলতে দর্শকদের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিল ও। আগ্রহে উত্তেজনায় ওরা কার্তিকের নাম ধরে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে : 'কার—তিক! কার—তিক! কার—তিক!'

কার্তিক রিং-এ পাক খেতে-খেতে জিশানের গায়ে থুতু ছিটিয়ে গেল। জিশান তাকিয়ে দেখল শুধু—কিছু বলল না।

রেফারি একটা হুইসল বাজাল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'স্টার্ট!'

বাস, লড়াই শুরু হয়ে গেল।

জিশান দু-পা ফাঁক করে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল—যেন এখনই শিকার লক্ষ্য করে লাফ দেবে। ওর ফরসা খালি গা, উজ্জ্বল চোখ, মাথার ঢেউ খেলানো চুল, রং ওঠা জিনসের প্যান্ট, কোমরে কালো বেল্ট—দেখে মনে হয় না, ও ওল্ড সিটিতে থাকে।

আর কার্তিক! ওর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, নিরীহ ভেড়ার ছানাদের রিং-এ টেনে এনে কুচিকুচি করে জবাই করাটাই ওর পেশা।

ও জিশানকে ঘিরে যেন কোশলে ছবির মতো পাক খাচ্ছিল, আর তীক্ষ্ণ নজরে প্রতিপক্ষকে মেপে নিচ্ছিল। ও বেঁটে হলে কী হবে, হাফপ্যান্টের নীচে

ওর উরুর শক্তিশালী পেশি চোখে পড়ছিল। মিহি বৃষ্টিতে ওর মাথায়, গায়ে, বৃষ্টির কণা চিকচিক করছিল।

আচমকা জিশানের দিকে ছুটে এল কার্তিক। আফ্রিকার আদিবাসী যোদ্ধাদের মতো কানফাটানো এক চিৎকার তুলে শূন্যে লাফ দিল। ওর পেশিবহুল শক্ত ডান-পাটা টান-টান করে সামনে বাড়ানো। ও তাক করেছে জিশানের গলা। একবার সংঘর্ষ হলেই লড়াই খতম।

জিশান শূন্যে ধেয়ে আসা হিংস্র কার্তিককে দেখল। ওর মনে পড়ল, এ-খেলায় নিয়ম বলে কিছু নেই, বে-আইনি বলে কিছু নেই।

তাই পলকে এক হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে বসে পড়ল জিশান। কার্তিক তখন শূন্যে, ওর মাথার ওপরে।

কার্তিকের উরুসন্ধি লক্ষ করে লোহার মুঠি চালিয়ে দিল জিশান। সে-ঘুষির পিছনে ওর সমস্ত শক্তি একজোট করা ছিল।

কার্তিক সটান খসে পড়ল মাটিতে—যেন গুলি খাওয়া চড়ুইপাখি। আর বাজপাখি জিশান ছোঁ মেরে তুলে নিল ওর ছটফটে দেহটা। মাথার ওপরে তুলে এগিয়ে গেল লোহালক্কড়ের ডাঁইয়ের দিকে।

ওকে এগিয়ে আসতে দেখে দর্শকরা ভয়ে সরে গেল দুপাশে। কিন্তু ওরা পাগলের মতো চিৎকার করছিল, 'জি—শান! জি—শান! জি—শান!'

জিশানের সামনেই জং-ধরা লোহার স্তূপ—খোঁচা-খোঁচা লোহার শিক বেরিয়ে আছে সেখান থেকে।

মানিকের কথা মনে পড়ল জিশানের। অন্ধ রাগে ও পাগল। ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, তারপরই কার্তিকের দেহটা ছুড়ে দিল লোহালক্কড়ের ওপরে।

জনতা উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল।

ব্যস, ফাইট খতম।

কার্তিককে উড়িয়ে দিয়েছে জিশান। মানিকের আত্মা নিশ্চয়ই [illegible] ক্যানকল, আর কে স্প্যাবো। জিশানের শপথ পূর্ণ হয়েছে। এবার জিশান জল খেতে পারে।

জিশান হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল রিং-এর জল-কাদার [illegible] হাঁ করে তাকাল ওপর দিকে।

বৃষ্টির ফোঁটা এখন মাপে একটু বড় হয়েছে। সেগুলো টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে জিশানের হাঁ করা মুখের ভেতরে। [illegible] থেকে চোঁয়ানো শান্তির জল।

পাবলিক তখন বেসামালকে ঘিরে ধরেছে। হইচই চেঁচামেচি হচ্ছে। অপনেন্ট রেজাল্ট বেশিরভাগেরই মুখ বাংলার। যারা জিতেছে তাদের মুখে চওড়া হাসি। কেউ-কেউ চেঁচিয়ে গান ধরেছে।

ভেজা গায়ে উঠে দাঁড়াল জিশান। রিং-এর একপাশে পড়ে থাকা

দলাপাকানো ভেজা শার্টটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল। তারপর বোতাম লাগাতে-লাগাতে রেফারির কাছে গেল। আড়চোখে লক্ষ করল, কার্তিকের দেহ অথবা মৃতদেহ ঘিরে বেশ বড়সড় জটলা তৈরি হয়ে গেছে।

ভীষণ আপসেট রেজাল্ট—এ-রেজাল্ট কেউ ভাবতেও পারেনি। তাই জিশানের হাতে অনেকগুলো টাকা ধরিয়ে দিল রেফারি। তারপর মিহি গলায় বলল, 'পরশু রাতে আবার ফাইট আছে। জরুর আসবে—সেদিন তোমার হয়ে মোটা মাল লড়িয়ে দেব...।'

টাকাগুলো নেওয়ার সময় জিশানের ডানহাতটা ব্যথা করছিল। ঘুষিটা কার্তিককে ও এত জোরে মেরেছে যে, এখনও কাঁধ পর্যন্ত টনটন করছে। কিন্তু ওইটুকু ব্যথা নিয়েও অনায়াসে এই রেফারি লোকটাকে একটা থাপ্পড় মারা যায়। কারণ, খানিকক্ষণ আগে এই লোকটাই জিশানকে কুকুরের মতো লাথি মেরেছিল।

যে-এলাকার যা নিয়ম।

জিশান প্রথমে রেফারির মুখে শব্দ করে থুতু দিল। তারপর সপাটে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল লোকটার গালে।

পটকা ফাটার মতো শব্দ হল এবং লোকটা চোখ উলটে ভিড়ের গায়ে ঢলে পড়ল।

জিশান আর দাঁড়াল না। দর্শকদের ভিড় ঠেলে খালপাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। ততক্ষণে বৃষ্টি আরও বেড়ে গেছে। কাদায় ওর পা পিছলে যেতে চাইছিল বারবার।

রাস্তায় উঠে এসে তাড়াতাড়ি পা চালাল জিশান। অনেক দেরি হয়ে গেছে—মিনি চিন্তা করবে। কিন্তু একটা কথা ভেবে ওর ভালো লাগছিল—পকেটে এখন অনেকগুলো টাকা। শানুর জন্য একটা কেন, ও এখন চাইলে দশটা দুধ কিনতে পারে।

ওষুধের দোকানের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎই কান্না পেয়ে গেল জিশানের। প্রথমে মালিকের জন্য। ও ভাবতেই পারছিল না, ওকে আর কেউ 'জিশু' বলে ডাকবে না। বিশৃঙ্খল এই শহরে উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটানোর জন্য কেউ তাকে আর বারবার করে লোভ দেখাবে না। ভাবতেই পারছিল না, মালিক আর নেই।

কিন্তু জিশানও কি আর আছে! আগের জিশান?

দ্বিতীয়বার কান্না পেয়ে গেল জিশানের। এবারে নিজের জন্য। রাগে দুঃখে এ কী করে বসল ও! অভাবের তাড়না ওকে রোজ কোণঠাসা করে তুলছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে...!

পথ চলতে-চলতে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল জিশান। শুধু মালিক নয়, জিশানও আজ মারা গেছে। মারা যাওয়া অধঃপাতে যাওয়া এই জিশান এখন

জুয়ায় জিতে সেই টাকায় ছেলের জন্য দুধ কিনতে যাচ্ছে।

এ-কথা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে ওর ভেতর থেকে কে যেন প্রতিবাদ করে উঠল : না, জুয়ায় জেতা টাকা নয়—পরিশ্রম দিয়ে উপার্জন করা টাকা। গায়ের শক্তি দিয়ে ও কার্তিককে হারিয়ে তারপর এই টাকা পেয়েছে।

তখনই ওর বুকের ভেতরে হেসে উঠল মালিক, বলল, 'জিশু, এ আমার প্রাণের দাম। এতে কোনও পাপ নেই। এ-টাকা দিয়ে তুই শানুর জন্যে দুধ কিনে নিয়ে যা...মেয়েদের মতো কাঁদিস না সালা—।'

জিশান যন্ত্রণায় চোখ বুজল। ওর দু-চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে ও ওষুধের দোকানে পৌঁছে গেছে।

●

রোজ বিকেলে শানুকে কোলে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় জিশান। এক-একদিন মিনিও ওর সঙ্গে থাকে। যেমন আজ।

রাতের অন্ধকারে ওল্ড সিটির চেহারা একরকম—কেমন যেন অপার্থিব, ছমছমে রহস্যে ঢাকা। আর দিনের চড়া আলোয় শহরটা কী কুৎসিত, হতমান।

শহরের বেশিরভাগ গাছপালাই নেড়া, তাতে কোনও ফুল-পাতা নেই। শুধু কঙ্কালটা কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। এমনকী বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, হাটবাজার, সবই ধুঁকছে—সেই সঙ্গে শহরের মানুষগুলোও। তবে মানুষগুলোর মধ্যে এখনও স্বপ্ন আছে। বেশিরভাগেরই স্বপ্ন নিউ সিটিতে যাওয়ার।

কিন্তু জিশান বা মিনির স্বপ্ন পুরোপুরি সেটা নয়। ওরা চায়, এই শহরটা আবার বেঁচে উঠুক—গাছপালা, বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, হাটবাজার, আর মানুষগুলোও বেঁচে উঠুক আবার। নানান রঙের ফুল আর পাখিরা ফিরে আসুক।

এখন তো পাখি বলতে শুধু কাক, চড়ুই, শালিখ, চিল আর শকুন—এ ছাড়া কখনও-কখনও ছিটকে চলে আসা দু-একটা পায়রা চোখে পড়ে। মৌমাছি বা প্রজাপতি শেষ কবে দেখেছে জিশানের মনে নেই। আর ফুল? জংলা ঝোপ-ঝাড়ে দয়া করে যেটুকু যা ফুটে থাকে। নইলে রোজ বাগান আর শখের পয়সার জোগান দেবে কে!

নোংরা রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ওরা। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। সেই আলো পড়েছে পুবে দাঁড়ানো নিউ সিটির গায়ে। শহরটা ঝলমল করছে। তার মাথায় অল্পবিস্তর শেষবর্ষার মেঘ। তার কিনারায় বিকেলের রং লেগেছে।

সেদিকে তাকিয়ে মিনি বলে উঠল : 'কী দারুণ দেখাচ্ছে!'

মিনি বলল, 'একদিন আমাদের শহরটাও ওরকম হবে।'

'হবে তো?' জিশানের দিকে তাকাল মিনি। ওর চোখে স্বপ্ন।

'নিশ্চয়ই!' বলে শানুর গালে একটা চুমু খেল জিশান।

শানুর চোখে কাজল, কপালে টিপ। ও জুলজুল করে বাবাকে দেখতে লাগল।

একটা ঝরঝরে গাড়ি ছুটে যাওয়ার সময় বৃষ্টির জল ভরা খন্দে পড়ে লাফিয়ে উঠল। জিশান চট করে সরে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু পুরোটা এড়াতে পারল না। কাদা-জল ছিটকে এল ওর গায়ে।

মিনি বলল, 'ইস, ভালো জামাটা নষ্ট হয়ে গেল।'

জিশান কোনও জবাব দিল না। ওর ভালো জামা-প্যান্ট বলতে আজকের পোশাকটাই সম্বল। বাকি আর যা-কিছু আছে সেগুলো দিনের বেলায় না পরাই ভালো।

পোশাকের ব্যাপারে মিনির অবস্থাও একইরকম। তবে রাতে ওকে বেরোতে হয় না কখনও। কারণ, অন্ধকার হয়ে গেলে জিশানই ওকে বেরোতে দেয় না। ভয়ের এই শহরে রাতে মেয়েরা একরকম বেরোয় না বললেই চলে।

জিশানরা আনমনাভাবে হেঁটে যাচ্ছিল। ডানদিকে, খানিকটা দূরে, একটা খাল। খাল না বলে পরিখা বলাই ভালো। কারণ, ওই পরিখা ওল্ড সিটি আর নিউ সিটিকে আলাদা করে রেখেছে। দুটো শহরের মধ্যে যোগাযোগ বলতে একটা ইস্পাতের সেতু—তার নাম 'মাস্টার ব্রিজ'। ব্রিজের দুপাশে দুটো প্রকাণ্ড লোহার দরজা। দরকার পড়লে ওই দরজা খুলে নিউ সিটি থেকে 'পিস ফোর্স' আসে ওল্ড সিটিতে। এই শহরে ওদের অনেকগুলো যোগাযোগ অফিস আছে। আর একটা হেডঅফিস। সেই অফিসের মাধ্যমে ওরা নিউ সিটির জন্য 'কাজের লোক' জোগাড় করে। আর ইচ্ছে করলে ওইসব অফিসে যোগাযোগ করেও নানান গেম শো-তে নাম দেওয়া যায়।

মাস্টার ব্রিজের নিরাপত্তার জন্য পিস ফোর্সের লোক তো আছেই, তা ছাড়া আছে নানানরকম অটোমেটিক কন্ট্রোল। মাস্টার ব্রিজের কন্ট্রোল সিস্টেম অকেজো করে কারও পক্ষে ওই জোড়া লোহার দরজা ভেঙে নিউ সিটিতে ঢোকা সম্ভব নয়।

আর যদি কেউ সাঁতরে পরিখা ডিঙিয়ে নিউ সিটিতে যাওয়ার কথা ভাবে!

সেটাই হবে তার জীবনের শেষ ভাবনা।

কারণ, পরিখার দু-পাড়ের খাড়া দেওয়াল কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো। আর জল শুরু হয়েছে পঁচিশ ফুট নীচে।

সেই জলে কিলবিল করছে বিষধর সাপ আর পিরানহা মাছ। ওরা সবসময় জল পাহারা দেয়। ওই জলের উষ্ণতা, নোনাভাব, সবকিছুই সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ

করা হয়।

মাস্টার ব্রিজ কিংবা পরিখার নিরাপত্তার কথা ওল্ড সিটির বহু জায়গায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জাহির করা আছে—এই শহরের বাসিন্দাদের সাবধান করার জন্য।

সেইরকম একটা বিজ্ঞাপন পরিখার কিনারায় দেখতে পেল জিশান। বিশাল-বিশাল ফ্লুওরেসেন্ট হরফে রং-বেরঙের বিজ্ঞাপন।

নিউ সিটিতে এত নিরাপত্তা যে, ওল্ড সিটিতে তার ছিটেফোঁটাও নেই। এ-কথা ভেবে তেতো হাসি পেয়ে গেল জিশানের। ও মিনিকে জিগ্যেস করল, 'নিউ সিটিতে যেতে ইচ্ছে করে?'

মিনি তাকাল জিশানের দিকে। বলল, 'করে। মাঝে-মাঝে সত্যি যেতে ইচ্ছে করে।'

'বেড়াতে, না পাকাপাকিভাবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মিনি। চারপাশটা চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখল। তারপর ইতস্তত করে জিগ্যেস করল, 'আমাদের এই শহরটার আর কিছু হবে না, না?'

মিনি শহরটাকে নিয়ে সবসময় খুব ভাবে।

জিশান ওর কথায় হেসে ফেলল। শানুকে মিনির কোলে দিল। একটা শ্বাস নিয়ে বলল, 'হওয়া তো দরকার। শহরটা আর বেশিদিন এরকম থাকলে আমরা সবাই খারাপ হয়ে যাব, মিনি।'

শানু মুখে আঙুল ঢুকিয়ে অর্থহীন কয়েকটা শব্দ করে উঠল। জিশানের মনে হল, বাচ্চাটা যেন বলছে, 'ঠিক বলেছ।'

সত্যিই তো। এই বর্বর শহরটার চাপে পড়ে জিশানরা সবাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মিনি যদি পাশে না থাকত, এতদিনে জিশান কোথায় তলিয়ে যেত কে জানে। সেদিন যেভাবে কার্তিকের সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপারটা হুট করে হয়ে গেল...যেভাবে চলে গেল মালিক...জিশানের বুকের ভেতরে তিন-চারদিন ধরে এক অস্থির তোলপাড় চলেছিল। মিনিকে আঁকড়ে ধরে অনেক চোখের জল ফেলেছে ও। ওর বারবার মনে হচ্ছিল, এক জিশান আর-এক জিশানের জন্য চোখের জল ফেলছে।

মিনি এমনিতে খুব চাপা ধরনের মেয়ে। বুঝতে পারে সবকিছু, কিন্তু সহজে ওর মুখ ফোটে না। সংসারের অভাব নিয়ে জিশানের নানান অভিযোগ আছে, কিন্তু মিনির কোনও অভিযোগ নেই। ওর কথা ভাবলেই মনে কেমন একটা জোর পায় জিশান।

সূর্য যত হেলে পড়ছিল, বাদল মেঘ ততই আকাশের দখল নিচ্ছিল। দুটো গুটার তীব্র শিস দিয়ে মাথার ওপরে উড়ে গেল। মিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল, বলল, 'এবার বাড়ি চলো'। যদি পট করে বৃষ্টি এসে যায় তো হলে

শানু ভিজে যাবে।'

জিশানও দেখল আকাশটাকে। এই একই আকাশ নিউ সিটির ওপরে। অথচ দুটো শহরে কত তফাত!

সামনেই একটা জটলা চোখে পড়ল ওদের। জটলাটা নিউ সিটির একটা ছোট ট্রাভেল অফিসের সামনে।

শানুর পিঠ চাপড়াতে-চাপড়াতে মিনি জিগ্যেস করল, 'কীসের ভিড় ওখানে?'

'কে জানে! হয়তো নিউ সিটিতে কিছু কাজের লোক নেওয়া হবে—তারই অন-লাইন ফর্ম ফিল-আপ চলছে।'

সত্যি, এই শহরটা যেন শুধু চাকরবাকরদের শহর হয়ে গেছে! ভাবল জিশান।

মিনি বলল, 'সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের খেলায় নাম দেওয়ার ভিড়ও হতে পারে।'

'হতে পারে—।'

'চলো তো, কী খেলা দেখি। দেখি কত টাকা প্রাইজ মানি!'

জিশান ভেতরে-ভেতরে একটু দুঃখ পেল। কৌতূহল আর লোভ। এই দুটো ব্যাপারকে উসকে দিয়ে সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন দিব্যি ব্যাবসা চালাচ্ছে। এ ছাড়া অভাব বড় সাংঘাতিক জিনিস। ভেতর থেকে মানুষকে ধীরে-ধীরে নরম করে দেয়।

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে জটলার কাছে এগিয়ে গেল। আর তখনই ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন একটা নতুন খেলা লঞ্চ করছে। খেলাটার নাম 'হাংরি ডলফিন'। গ্রেট টিভিতে তারই প্রোমো দেখানো হচ্ছে। দুজন প্রেজেন্টার খেলাটা সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সমুদ্রের মধ্যে প্রকাণ্ড মাপের একটা খাঁচা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই খাঁচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একডজন ডলফিন। তার মধ্যে ছ'টা ডলফিন আসলে হাঙর—তাদের বৈজ্ঞানিক কায়দায় ডলফিনের ছদ্মবেশ পরানো হয়েছে। এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ যে, বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই।

এবারে এই খাঁচার মধ্যে নেমে পড়ছে একজন খেলোয়াড়। তাকে সাঁতার কেটে ঘুরে বেড়াতে হবে সেই খাঁচায়। এবং ছদ্মবেশী হাঙরের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে। আত্মরক্ষার জন্য তাকে দেওয়া হবে দুটো ছুরি—একটা ছোট, একটা বড়। এ ছাড়া খেলোয়াড়ের কাছে থাকবে একটা ইলেকট্রনিক রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট। সে রিমোট টিপে সংকেত পাঠালেই খাঁচার দরজা খুলে যাবে এবং খেলোয়াড় পালিয়ে বাঁচতে পারবে।

'হাংরি ডলফিন' খেলার মোট সময়সীমা কুড়ি মিনিট। যদি কোনও খেলোয়াড় কুড়ি মিনিট ওই খাঁচায় কাটিয়ে আহত কিংবা অক্ষত অবস্থায় বেঁচে ফিরে আসতে পারে, তা হলে সে পাবে বিশলাখ টাকা। যদি কেউ তার আগে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে, তা হলে তার পুরস্কার হল মিনিটপিছু এক লক্ষ টাকা। তবে কমপক্ষে পাঁচমিনিট খাঁচায় তাকে কাটাতেই হবে।

তারপরেই প্রেজেন্টাররা বলছে খেলার নানান শর্ত এবং নিয়মকানুন। বিশ লাখ টাকা প্রাইজ মানি দিয়ে নিউ সিটি থেকে কী-কী সুখ এবং আরাম কেনা যেতে পারে। কোথায়-কোথায় বেড়ানো যেতে পারে। কোন-কোন স্বপ্ন সত্যি হয়ে উঠতে পারে সফল প্রতিযোগীর জীবনে।

জিশান অবাক হয়ে দেখছিল।

সত্যি, সুপারগেমস কর্পোরেশনকে সেলাম জানাতে হয়। মাথা খাটিয়ে কী করে যে ওরা এতসব অদ্ভুত-অদ্ভুত খেলা বের করে কে জানে!

শানুকে কোলে নিয়ে এক্স-এক্স-এল সাইজের প্লেট টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল মিনি। ওর চোখের পলক পড়ছিল না। খেলোয়াড়দের লোভ দেখানোর কায়দাটা দারুণ। ডলফিনের ছদ্মবেশে হাঙর। মিনিটপিছু একলক্ষ টাকা। কোনওরকমে পাঁচমিনিট কাটাতে পারলেই পাঁচ লাখ।

মিনি এমনিতে এসব খেলায় নাম দেওয়াটা খুব একটা পছন্দ করে না। কিন্তু বেশ কয়েকবছর ধরে অভাবের সঙ্গে লড়তে-লড়তে মাঝে-মাঝে ওর মনে হয়, এরকম দু-একটা খেলায় জেতার স্বপ্ন দেখলে ক্ষতি কী!

প্রেজেন্টার দুজন তখন 'বার গ্রাফ' আর 'পাই চার্ট' এঁকে খেলাটার অঙ্ক বোঝাচ্ছিল।

অর্থাৎ, একজন খেলোয়াড়ের প্রথম পাঁচমিনিট বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কত। তার পরের পাঁচমিনিটে সেই সম্ভাবনার মান কত হওয়ার সম্ভাবনা। কিংবা খেলোয়াড়ের আই. কিউ.-র সঙ্গে সারভাইভাল ফ্যাক্টরের সম্পর্ক কী। কী করে হাঙরের আক্রমণ এড়াতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব বিজ্ঞানের কচকচির পরই শুরু হল একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান : শার্ক ভার্সাস ডলফিন। একজন হাঙর বিশেষজ্ঞ এবং একজন ডলফিন বিশেষজ্ঞ মুখোমুখি বসে হাঙর এবং ডলফিনের আচার-আচরণ নিয়ে দুজন প্রেজেন্টারের সঙ্গে তুমুল আলোচনায় মেতে উঠলেন।

প্রোমোর সবশেষে টিভিতে ফুটে উঠল নিয়মাবলী।

তাতে রয়েছে খেলার নানান শর্ত এবং কীভাবে প্রতিযোগীরা খেলাটায় নাম দেবে তার সুলুকসন্ধান।

মিনির আশেপাশে ভিড় করে থাকা লোকজন হাঁ করে প্রোমো প্রোগ্রামটা গিলছিল। ওদের অনেকের চোখ দিয়ে লালা ঝরছিল।

নিউ সিটির যে-দুজন এজেন্ট টিভির পাশে চুপটি করে বসে ছিল, তাদের ছেঁকে ধরল কয়েকজন। '[illegible]রি ডলফিন' গেম নিয়ে প্রশ্নে-প্রশ্নে পাগল করে তুলল।

জিশান জানে খেলাটায় সারভাইভাল ফ্যাক্টর 0.61। অর্থাৎ, না-বাঁচার সম্ভাবনা শতকরা উনচল্লিশ ভাগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিপজ্জনক খেলায় নাম দেবে অনেকে। তার কারণ, ঝুঁকি নিয়ে জুয়া খেলতে চাওয়া লোকের সংখ্যা ওল্ড সিটিতে খুব একটা কম নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ হল লোভ—টাকা দিয়ে সুখ এবং আরাম কেনার লোভ। এই লোভের টোপ বড় সাংঘাতিক জিনিস।

মিনি জিশানের জামা ধরে টান মারল, বলল, 'চলো, শানুর ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে আধ দুধ খেতে চাইবে না।'

জিশানের চোখ দেখে মিনির বুকটা কেঁপে উঠল। আশপাশের মানুষগুলোর চোখের সঙ্গে কিছুটা যেন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। না, আর বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়।

মিনি দোটানায় দুলতে-দুলতে হঠাৎই যেন ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠল। আর-একবার জিশানের হাত ধরে আলতো টান মারতেই জিশান বিরক্ত হয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল : 'আঃ! একমিনিট দাঁড়াও না!'

ততক্ষণে প্রোমোর পরের অংশ শুরু হয়ে গেছে।

ওল্ড সিটির যেসব মানুষ সুপারগেমস্ কর্পোরেশনের অন্যান্য শো-তে নাম দিয়ে ভাগ্য ফেরাতে পেরেছে তাদের ফটোগ্রাফ দেখানো শুরু হল।

প্রথমে এল বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের একজন লোক। ঝকমকে পোশাক, চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা, ঠোঁটে সিগারেট, মুখে চওড়া হাসি।

ভদ্রলোকের নাম সেন্টালি মজুমদার। একটা সোফায় আরাম করে বসে আছেন। পায়ের কাছে একটা লোমওয়ালা পুঁচকে কুকুর। সামনের টেবিলে কফির কাপ।

ক্যামেরা ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাল। আর সেইসঙ্গে বলতে লাগল, সেন্টালি মজুমদার নিউ সিটির এই ফ্ল্যাটে কী আরামেই না আছেন! এই আরাম সেন্টালি কিনেছেন সুপারগেমস্ কর্পোরেশনের গেম শো-তে নাম দিয়ে। এবং জিতে।

জিশান এই প্রোমো দেখতে-দেখতে আরামের গন্ধ পাচ্ছিল। কয়েক লহমার জন্য আনমনা হয়ে গেল ও।

শুধু জিশান কেন, দর্শকদের আরও অনেকেই ওই আরামের সুবাস পাচ্ছিল।

প্রোমো দেখতে-দেখতে হঠাৎই একটা ধাক্কা খেল জিশান।

কারণ প্রেজেন্টার মেয়েটি তখন বলছে, '...কিন্তু গেম শো-তে জেতার আগে কেমন ছিল সেন্টালি মজুমদারের জীবন? এবারে দেখুন, কোথা থেকে

কোথায় এসেছেন তিনি!'

সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরা দেখাতে শুরু করেছে গুন্ড সিটির একটা জঘন্য বস্তি অঞ্চল। নোংরা, অন্ধকার, ক্লেদাক্ত জীবনযাত্রার ভয়াবহ ছবি। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকসমেত প্রায় আধমিনিট ধরে সেগুলো দেখানো হল। তারপর টিভির ফ্রেমে ফিরে এল প্রেজেন্টার। দর্শকদের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'আপনি কি চান না আপনার জীবনটাকে ফেরাতে? জীবন বদলানোর অধিকার সবার আছে—আপনারও। সেই বদলের জন্য নিতে হবে সামান্য ঝুঁকি। কী, পারবেন না একটু ঝুঁকি নিতে? আমাদের গেম শো-র সামান্য ঝুঁকির বিনিময়ে আমূল বদলে যেতে পারে আপনার জীবন।'

এরপর শুরু হল সেন্টালির ইনটারভিউ। গেম শো-তে ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষে অনেক ভালো-ভালো কথা বললেন সেন্টালি। শোনালেন 'মাই লাইফ উইথ আ টাইগার' গেম-এ তাঁর রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের কাহিনি।

একটা বাঘের খাঁচায় তাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল একটা ছোট হান্টিং নাইফ আর চোদ্দো কেজি মাংসের টুকরো। মোক্ষম সময়ে বাঘের মুখে বারবার মাংসের টুকরো ছুড়ে দিয়ে, খাঁচার জাল বেয়ে টিকটিকির মতো পালিয়ে বেড়িয়ে, তাঁকে একঘণ্টা বাঁচতে হয়েছিল। এই লড়াইয়ে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল সেন্টালির। মনের ওপরে কী সাংঘাতিক চাপই না পড়েছিল। একঘণ্টা পর যখন খাঁচার দরজা খুলে তাঁকে বের করা হয় তখন তিনি যন্ত্রণা আর টেনশানে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফেরার পর তাঁর মনে হয়েছিল, বাঘের খাঁচার ব্যাপারটা সত্যি নয়—স্বপ্ন। কিন্তু খাঁচার ভেতরে তাকিয়ে দেখেছিলেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটা তখন মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে। সেটা কিন্তু মোটেই স্বপ্ন ছিল না।

এই খেলায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জিতেছেন সেন্টালি মজুমদার। তাঁর স্ত্রী আর দু-ছেলের তো আনন্দে পাগল হওয়ার জোগাড়। ওঁদের সবার জীবনটাই সেই মুহূর্ত থেকে বদলে গিয়েছিল।

ক্যামেরা এবার সেন্টালির পায়ের দিকে এগোল। সেন্টালি [illegible] প্যান্টের ডান পা-টা ওপরদিকে গোটাতে শুরু করলেন। ক্যামেরা ডান পায়ের ক্লোজ আপ শট দেখাচ্ছে। তাতে স্পষ্ট দেখা গেল, সেন্টালির ডান পায়ের গোলাপি রং চকচক করছে এবং সেই পায়ে একটাও লোম নেই।

পা-টা ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলেন সেন্টালি। তাঁর ডান পা-টা হাঁটুর কাছ থেকে খুলে চলে এল হাতে।

প্লাস্টিকের নকল পা।

একঘণ্টা ধরে রয়্যাল বেঙ্গলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে একটা পা খুইয়েছেন সেন্টালি। অবশ্য তার জন্য সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের সিস্টার

কোম্পানি নিউলাইফ ইনশিয়োরেন্স সেন্টালিকে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছে।

অর্ধেক ডান পায়ের দাম।

জ্ঞান ফিরে আসার পর সেন্টালি দেখেছিলেন, বাঘটা মাংস চিবোচ্ছে। আসলে বাঘটা তখন তাঁর কামড়ে কেটে নেওয়া ডান পা-টা চিবোচ্ছিল।

শোটা দেখতে-দেখতে এতক্ষণ বেশ ভালোই লাগছিল জিশানের। প্রোগ্রামের সঙ্গে-সঙ্গে জাম্প কাট করে গেম শো-টার ফুটেজ দেখানো হচ্ছিল বারবার। মাঝে-মাঝে আবার স্লো মোশানে দেখানো হচ্ছিল, কী কায়দায় সেন্টালি বাঘের দাঁত-নখ এড়িয়ে বাঘকে ফাঁকি দিচ্ছেন।

টিভিতে সেসব দেখতে-দেখতে উত্তেজনা আর আনন্দে দর্শকরা হইহই করছিল, হাততালি দিচ্ছিল। কিন্তু একেবারে শেষে যখন সেন্টালির খোয়া যাওয়া পা-টা দেখানো হল, দেখানো হল বাঘের পা চিবিয়ে খাওয়ার দৃশ্য, তখন পলকে সব হইচই থেমে গেল।

জিশানের হাত ধরে হিংস্রভাবে টান মারল মিনি ঃ 'এক্ষুনি চলে এসো বলছি!'

জিশানের হঠাৎই গা গুলিয়ে উঠল। ও তাড়াতাড়ি সরে এল টিভির সামনে থেকে। প্রেজেন্টার মেয়েটি তখন বলছে, 'ভাবুন তো! এ-খেলায় কী মারাত্মক থ্রিল! আর কী মারাত্মক পুরস্কার—প-ন্‌-চা-শ ল-ক্ষ টা-কা! হোয়াও! আর তার সঙ্গে বোনাস ইনশিয়োরেন্সের তিন লক্ষ টাকা। ভাবা যায়!'

সত্যিই ভাবা যায় না। লোভের টোপ ফেলে সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন সেন্টালির ডান পায়ের অর্ধেকটা নিয়ে নিয়েছে। কে জানে, একটু এদিক-ওদিক হলে সেন্টালির প্রাণটাই হয়তো খরচের খাতায় জমা পড়ে যেত!

সেন্টালির পরই দেখা গেল আর-একজন সফল প্রতিযোগীকে। সে তার সাফল্যের সাতকাহন শুরু করতেই জিশান সরে এল। কারণ, মিনি ওকে টানতে-টানতে রাস্তা ধরে হাঁটা দিয়েছে। আর ওর ডান কাঁধের ওপরে মাথা রেখে ছোট্ট শানু ঘুমিয়ে পড়েছে।

আকাশের রং এতক্ষণে অনেকটা ছায়া-ছায়া ঘোলাটে হয়ে গেছে। ধূমকেতু দুটো ধীরে-ধীরে রঙিন এবং স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে জিশানের মন খারাপ হয়ে গেল। এইভাবে খেলতে-খেলতেই কি সবার জীবন শেষ হবে?

হাঁটতে-হাঁটতে ও মিনির দিকে তাকাল ঃ 'মিনি—।'

'উঁ—।' আনমনাভাবে শব্দ করল মিনি। ও পথচলা দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। বয়েস ওদের আট কি নয়। গায়ে ময়লা পোশাক। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত বিড়ি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে-করতে হেঁটে যাচ্ছিল। ওদের কথা যেটুকু শোনা গেল তাতে কানে আঙুল দিতে হয়।

কিন্তু আজকাল খুব একটা কেউ কানে আঙুল দেয় না—অনেকটা যেন গা সওয়া হয়ে গেছে।

জিশান আক্ষেপের একটা শব্দ করে বলল, 'হুঁঃ, এই আমাদের পরের জেনারেশন।'

মিনি বলল, 'এর মাঝে আমাদের শানুকে বড় করে তোলা...আমার খুব ভয় করে।'

'জানো, আমাদের ছোটবেলাটা এরকম ছিল না...মানে, এতটা খারাপ ছিল না।'

মিনি ম্লান হেসে বলল, 'সব জানি।' একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর : 'তখন তো আর সুপারগেমস কর্পোরেশন ছিল না। আর এত প্রাইজ মানিও ছিল না।'

সত্যি, বাজি ধরা, জুয়া খেলা, যেন জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বাবা বলতেন, 'শ্রমের মর্যাদা কক্ষনও নষ্ট করবে না।'

হুঃ। কোথায় শ্রম আর কোথায় মর্যাদা!

হাঁটতে-হাঁটতে নিজের পাড়ায় পৌঁছে গেল জিশান।

ভাঙাচোরা গলিপথের ওপরে দুপাশ থেকে ঝুঁকে রয়েছে জরাজীর্ণ একতলা সব বাড়ির কাঠামো। বাড়িগুলোর সর্বত্র জোড়াতালি দেওয়া। কালচে দেওয়াল। ফাটল ধরা দরজা-জানলা। দেখেই বোঝা যায়, এখানে যে-মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়েছে তার নাম অভাব।

গলিতে টিমটিম করে কয়েকটা বাল্‌ব জ্বলছিল। সামনের একটা টিনের চালের আড়ালে প্যাঁচা বাসা বেঁধেছে। মাঝে-মাঝে রাতবিরেতে ওটা ডেকে ওঠে। মিনি বলে, প্যাঁচাটা খুব জাগ্রত—বিপদের গন্ধ পেলেই ডাক ছেড়ে গলির সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেয়।

জিশান আর মিনি গলিতে পা রাখামাত্রই প্যাঁচাটা দুবার ডেকে উঠল।

মিনি কেঁপে উঠল। চকিতে তাকাল প্যাঁচাটার আস্তানার দিকে। অন্ধকারের ভেতরে সাদাটে পাখিটার নড়াচড়া অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল ও।

জিশান এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। তাই মিনির মুখের চেহারা দেখে মজা করে হাসল।

ঠিক তখনই জিশান খেয়াল করল, আশেপাশের বাড়ির জানলা-দরজা ফাঁক করে কয়েকটা মুখ জিশানদের কৌতূহলে দেখছে।

কিন্তু কেন? ওরা তো জিশানদের প্রতিবেশী! রোজই দেখতে পায় জিশানদের। তা হলে আজ এত উঁকিঝুঁকি মারা কেন?

সেটা বোঝা গেল বাড়িতে ঢোকার পর।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে জিশান দ্যাখে, ওদের ঘরে চারজন লোক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের প্রত্যেকের হাতে নীল দস্তানা এবং নীল রঙের অটোমেটিক পিস্তল।

চারজনের মধ্যে তিনজন কালো রঙের য়ুনিফর্ম পরে রয়েছে। পোশাকে সোনালি রঙের লাইনিং। বুকে লাগানো সোনালি হলোগ্রাম ব্যাজ থেকে আলো ঝলসে বেরোচ্ছে। তার মধ্যে সুন্দর হরফে লেখা 'পি.এফ.'—পিস ফোর্সের প্রথম দুটো অক্ষর। ওদের মুখগুলো মরা মানুষের মুখের মতো—অভিব্যক্তিহীন।

ওদের তিনজনের চোখই জিশানের দিকে। চোখের পাতা পড়ছে না।

চতুর্থজনের পোশাক ধবধবে সাদা। তাতে ঝকঝকে সোনালি বোতাম আঁটা। বুকপকেটের ওপরে জ্বলজ্বলে নীল হলোগ্রাম।

লোকটা সামান্য হেসে জিশানের দিকে দু-পা এগিয়ে এল। পিস্তলের নলটায় এমনভাবে আঙুল বোলাতে লাগল যেন পোষা কুকুরের গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করছে।

'গুড ইভনিং, মিস্টার পালচৌধুরী, এভাবে হানা দিয়ে আপনাকে আচমকা চমকে দেওয়ার জন্যে মাপ চাইছি। আর একইসঙ্গে সাফ জানাই, আমরা পিস ফোর্সের কাট-পিস। প্র্যাকটিক্যালি ফোর্স করে আমাদের চার পিসকে এখানে পাঠানো হয়েছে· –সিন্ডিকেটের ইন্ডিকেশানে। আমার নাম শ্রীধর পাট্টা। নিউ সিটির পিস ফোর্সের ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্টের মার্শাল। বোঝেনই তো হালচাল!'

শ্রীধর পাট্টা কথা বলছিলেন চিবিয়ে-চিবিয়ে, আর একইসঙ্গে হাসছিলেন। ওঁর ফরসা মুখে অনেক ভাঁজ। সূচিতীক্ষ্ণ ভুরুর রেখা—দেখে মনে হয় প্লাক করা। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল এবং ঝকমক করছে। নিশ্চয়ই ফ্লুওরেসেন্ট লিপস্টিক লাগিয়ে এসেছেন।

শ্রীধর কথা বলছিলেন মেয়েলি টানে সুর করে। ওঁর দাড়ি-গোঁফ কামানো মসৃণ লম্বাটে মুখ আর লম্বা-লম্বা চুল মেয়েলি ভাবটাকে আরও জোরালো করেছে।

'আমরা আপনাকে রিফর্ম করতে এসেছি, জিশান—তাই আপনাকে একটা ফর্ম ফিল-আপ করতে হবে। ভে-রি সিম্পল...আপনার ওয়াইফের গালে তো হেভি নাইস ডিম্পল! কমপ্লিমেন্টস, ম্যাডাম—' মিনির দিকে ফিরে বললেন শ্রীধর, 'তা আপনার ছানাটি তো বেশ!...বেশ ঘুম-ঘুম ছানা। বদন চাঁদপানা। কী নাইস ঘুমিয়ে রয়েছে!'

জিশান আর মিনি হতবাক হয়ে শ্রীধরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। জিশানের মাথার ভেতরে বনবন করে একটা মেরি-গো-রাউন্ড ঘুরতে শুরু করে দিয়েছিল। পিস ফোর্সের লোকজন কেন ওর বাড়িতে এসেছে সেটাই বুঝতে পারছিল না জিশান। তা ছাড়া মার্শাল, শ্রীধর পাট্টা, ঠিক কী যে বলতে চাইছেন তাও মাথায় ঢুকছিল না।

ঘুমন্ত শানুর মাথায় হাত ছোঁয়ালেন শ্রীধর, বললেন, 'বে বি! হুইট বেবি।

মিনিদেবী, আপনার পারমিশান নিয়ে আমি কি ওকে কোলে নিতে পারি?'

মিনি শ্বাস টানল শব্দ করে। শ্রীধরের ছোঁয়া থেকে এক ঝটকায় শানুকে সরিয়ে নিতে চাইল।

হেসে ফেললেন শ্রীধর। একঝাঁক কাচের চুড়ি এ ওর গায়ে ঢলে পড়লে যেমন রিনরিনে শব্দ হয়, অনেকটা সেইরকম শোনাল ওঁর হাসিটা। মিনির গালে দস্তানা পরা আঙুলের আলতো টোকা দিয়ে বললেন, 'ও মা গো! মা ভয় পেয়েছে গো। ও. কে.—দেন য়ু গো, গো। য়ু গো টু নেক্সট রুম। আমরা আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চাই—।'

মিনিকে ইশারা করে পাশের ঘরে যেতে বললেন শ্রীধর। পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করে তা থেকে দু-ফোঁটা তরল হাঁ করে মুখে ঢাললেন। জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে স্বাদ নিয়ে 'চকাস। চকাস।' শব্দ করলেন দুবার। তারপর পলকে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

জিশান আন্দাজ করল, ওই শিশিতে নেশা-ধরানো কোনও জিনিস রয়েছে। নিউ সিটিতে এরকম নতুন-নতুন বহু মাদক পাওয়া যায়।

মিনি জিশানের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমার কাছে থাকব।'

জিশান ইশারায় ওকে শান্ত হতে বলল।

হঠাৎই মাথা ঝাঁকালেন শ্রীধর। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের কয়েকটা কাগজ বের করলেন।

কাগজগুলো দোমড়ানো মোচড়ানো। পাতা উলটে-উলটে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। আর মুখে 'উ-উঁ' শব্দ করতে লাগলেন।

অবশেষে একসময় শ্রীধর পাঠ্যা হেসে উঠে বললেন, 'গট ইট। আইটেম ভেরি হট। পড়ে ফেলি চটপট।'

একটা পৃষ্ঠা মুখের কাছে নিয়ে তিনি পড়তে শুরু করলেন।

'জিশান পালচৌধুরী। বয়েস আটাশ। ওল্ড সিটি। সিটিজেনশিপ নাম্বার কে বাই এইচ ২১০৩৪। ওয়াইফ মিনি। একমাত্র ছেলে অর্কনিশান—ডাকনাম শানু। চার্জ : উইলফুল মার্ডার অ্যান্ড ইল্লিগাল গ্যাম্বলিং।'

থামলেন শ্রীধর। কালো য়ুনিফর্ম পরা তিনজনের একজনকে সদর দরজাটা দেখিয়ে চোখের ইশারা করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে মরা মানুষটা রোবটের মতো এগিয়ে গেল ঘরের দরজার দিকে। রীতিমতো শব্দ করে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিল।

'এইবার আমরা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারি। বাইরের কেউ আর আমাদের কথা শুনতে পাবে না—' শ্রীধর ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন, বললেন, 'আসুন, শ্রীপালচৌধুরী, বসে পড়া যাক এখানে-ওখানে। এখানে বসেই

কাজের কথা হোক। আর শ্রীমতী পালচৌধুরী—' মিনির দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে বললেন শ্রীধর পাট্টা, 'আপনি স্বামীর কাছে থাকুন, তবে ছানাটাকে রেখে আসুন। নইলে [illegible] লোহার সঙ্গে খোকার ঠোকাঠুকি লেগে যায়...' হাতের পিস্তলটা নাচিয়ে দেখালেন : '...কে বলতে পারে!'

ঘরটার অবস্থা নোংরা, ছন্নছাড়া। এলোমেলো দড়িতে উলটোপালটা জামাকাপড় ঝুলছে। দেওয়ালের তাকে পুরোনো বইপত্র, অচল ঘড়ি, গায়ে মাখার সাবান আর প্লাস্টিকের খেলনা।

একটা ভাঙা টুল নিয়ে বসে পড়লেন শ্রীধর—পায়ের ওপরে পা তুলে মজেলদের ভঙ্গিতে বসলেন।

জিশান মেঝেতে বসে পড়ল।

মিনি শানুকে পাশের ঘরে রেখে ফিরে এল—বসল জিশানের পাশে।

প্যাঁচাটা তা হলে এমনি-এমনি ডাকেনি! ভাবল মিনি।

জিশান স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে মৃতদেহের দিকে একপলক তাকাল। তারপর শুকনো ঠোঁটের ওপরে জিভ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, স-স-স্যার!'

কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটগুলো পকেটে ঢুকিয়ে হাসলেন শ্রীধর, বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই—আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এত সুন্দর যে, আপনার বউয়ের চেয়েও সুন্দর—ঠিক আছে? গত শনিবার রাতে মানিকতলার খালধারে আপনি ইল্লিগ্যাল একটা ফাইট গেমে নাম দিয়ে গ্যাম্বল্ করেছেন—বে-আইনিভাবে জুয়া খেলেছেন। সেই সময়ে কার্তিক তপাদার নামে ওল্ড সিটির একজন সিটিজেনকে—সিটিজেনশিপ নাম্বার এল বাই ডি-৭৬৬১৮—আপনি ইচ্ছে করে খুন করেছেন। উইলফুল মার্ডার।'

'মিথ্যে কথা। আমি জুয়া খেলিনি।'

'তাই?' কপট বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় করলেন শ্রীধর পাট্টা, ন্যাকা ঢঙে বললেন, 'আমার নক্কী ছোনা চাঁদের কণা! আমার ছোনা কি-চ্ছু করেনি। ন-এ ন্যাকা, আর ব-এ বোকা! শুনুন—' শ্রীধরের কথা বলার ঢং হঠাৎই বদলে গেল। রঙ্গপ্রিয় মেয়েলি ভাব উধাও হয়ে তিনি পুরোপুরি মার্শাল হয়ে গেলেন : 'শুনুন, পালচৌধুরী। আমাদের কাছে অনেক উইটনেস আছে। স্যাটেলাইট ডেটাও আছে। সেইসঙ্গে ডিজিটাল ফটোগ্রাফ। জুয়া আপনি খেলেছেন আর খুনও করেছেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হান্ড্রেড পার্সেন্ট। আমাদের সিন্ডিকেটকে নিগেট করে কখনও কিছু করা যায় না। আমাদের লক্ষ-লক্ষ চোখ।'

জিশান অবাক হয়ে ভাবছিল।

খালধারের ওই ফাইট গেম ইল্লিগ্যাল? তা হলে সুপারগেমস্ কর্পোরেশনের গেমগুলো? সেগুলো সব লিগ্যাল।

'স্নেকস অ্যান্ড জেমস', 'মাই লাইফ উইথ দ্য টাইগার', 'অ্যানিমাল রেস', কিংবা 'হাংরি ডলফিন' গেম-এ কেউ যদি মারা যায় তা হলে সেটা উইলফুল মার্ডার নয়?

আর 'কিল গেম'? সেই খেলায় তো আজ পর্যন্ত সব মানুষই মারা গেছে—গুন্ড সিটির সব মানুষ। তার বেলা?

মানিকের কথা মনে পড়ল জিশানের। কুচকুচে কালো, ঝকঝকে দাঁত, দিলখোলা হাসি, মিষ্টি মুখ।

ওর মৃত্যুটা তা হলে কী? ওটা উইলফুল মার্ডার নয়?

মিনির কান্নায় ঘোর কাটল জিশানের। মিনি হাতের পিঠ কামড়ে গুঙিয়ে কাঁদছে।

এখন তা হলে কী হবে? দিশেহারা পাগল হয়ে গেল জিশান। ওর ভেতরে একটা জংলি চিতা খেপে উঠল।

তখন শ্রীধর পাট্টা ধীরে-ধীরে বলছেন, 'এবার তা হলে আমরা পানিশমেন্টের কথায় আসি, মিস্টার পালচৌধুরী—।'

জিশান পাগলের মতো একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রীধরের ওপরে এবং শ্রীধর কাত হয়ে টুল থেকে পড়ে যেতে-যেতে গুলি চালালেন।

প্রচণ্ড শব্দে ছোট্ট ঘর থরথর করে কেঁপে উঠল। গুলিটা গিয়ে লাগল দেওয়ালে ঝোলানো একটা বাঁধানো ছবিতে। ভাঙা কাচের টুকরো ফুলঝুরির মতো চারিদিকে ছিটকে গেল।

জিশান ভয় পেয়ে শ্রীধরকে ছেড়ে একপাশে লাফিয়ে পড়ল।

তিনজন গানম্যান পলকে পিস্তল উঁচিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা জিশানকে টিপ করে ফ্রিজ শট হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। শ্রীধর না বললে ওদের গুলি চালানোর হুকুম নেই।

শ্রীধর পাট্টা মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ডানহাতের পিস্তলটা জিশানের দিকে তাক করে হাসলেন : 'আপনি কি বাবু বুঝতে পেরেছেন যে, গুলিটা আমার মিস হয়নি—ইচ্ছে করে মিসফায়ার করেছি?' বাঁ-হাতে পোশাক ঝাড়তে লাগলেন শ্রীধর। তারপর ধীরে-ধীরে চুইংগাম চিবোনোর ঢঙে বললেন, 'তার কারণ, আপনাকে নিয়ে আমার অন্য প্ল্যান আছে, জিশান—[illegible] করেছি সেইজন্যে...।'

সঙ্গে-সঙ্গে মিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। তারপর জিশানকে জাপটে ধরে ভয় পেয়ে কেণ্ঠাসা আহত পশুর মতো হেঁচকি তুলে কাঁদছে।

'...তা নইলে খুলি আর মাটির ভাঁড় আমার কাছে একই—ওদের জন্মই হয়েছে চৌচির হওয়ার জন্যে।' হাসলেন শ্রীধর। পিস্তলটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে হাতুড়ি পেটার ঢঙে সবেগে বসিয়ে দিলেন জিশানের পাঁজরে।

জিশান ককিয়ে উঠল। যন্ত্রণায় ওর শরীরটা কুঁকড়ে গেল।

মিনি ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রীধরের পায়ে। উপুড় হয়ে পায়ে মাথা ঘষতে-ঘষতে বলল, 'প্লিজ, ওকে ছেড়ে দিন। ও ইচ্ছে করে কাউকে খুন করেনি। ইচ্ছে করে কাউকে খুন করেনি...।'

'জানি তো, মা-মণি। শুধু-শুধু এমনধারা করছ কেন বলো তো? মরছ কেন মাথা খুঁড়ে আমার পায়ের পাতায়?' গায়ে জ্বালা ধরানো ন্যাকা মেয়েলি ভঙ্গিতে বললেন শ্রীধর পাত্র। ঝুঁকে পড়ে মিনিকে ধরে তুললেন মেঝে থেকে। দস্তানা পরা আঙুলের ডগা দিয়ে বেশ সময় নিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

জিশান শুয়ে থাকা অবস্থাতেই দেখল দৃশ্যটা। ও ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'স্টপ ইট। স্টপ ইট য়ু...।'

'স্টপ ইট য়ু কী? বাস্টার্ড? নাকি বাংলায় তালব্য শ দিয়ে খুব কমন একটা যে গালাগাল আছে, সেটা দিতে যাচ্ছিলেন?' কোমরে হাত রেখে তেরছা চোখে তাকালেন শ্রীধর পাত্র : 'আমি তো আপনার বউকে ছুঁইনি, বাবু। আপনার বউয়ের চামড়া আর আমার চামড়ার মাঝে দস্তানার কাপড়ের লেয়ার রয়েছে না! ন্যালাবোকা! কিচ্ছু বোঝে না মাইরি।'

মিনিকে আলতো করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শ্রীধর বললেন, 'জিশান পালচৌধুরী, শোনো। তোমাকে নিয়ে আমার প্ল্যানটা এবারে বলি। তোমার এগেইনস্টে যা চার্জ তাতে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়া ছাড়া সিন্ডিকেটের কাছে আর কোনও পথ খোলা নেই। তবে তোমাকে বাঁচাব একটা সুযোগ দেওয়া যায়...।'

থামলেন শ্রীধর পাত্র।

আশায় মিনির চোখ চকচক করে উঠল। জিশানেরও।

'...তোমাকে "কিল গেম"-এ নাম দিতে হবে।'

শ্রীধরের শেষ কথাটা যেন বরফের ছুরি হয়ে কেটে বসল জিশানের মগজে।

আর মিনি পাথর হয়ে গেল।

শ্রীধর পাত্র চুপচাপ চোয়াল শক্ত করে বসে রইলেন। তারপর শব্দ করে থুতু ফেললেন ঘরের মেঝেতে। ভুরু উঁচিয়ে বললেন, 'ঘরটা যা নোংরা। এখানে ইচ্ছিমি থুতু ফেলা যায়, কী বলো?'

শেষ প্রশ্নটা জিশানকে লক্ষ করে। কিন্তু জিশান কোনও জবাব দিতে পারল না। কারণ, ও তখনও 'কিল গেম' নিয়ে ভাবছে।

'কিল গেম' খেলাটা গড়ে দু-মাসে একবার করে হয়। কারণ, সবসময় খেলোয়াড় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ওই খেলায় শুধু খেলোয়াড় পেলেই হল না, তার শারীরিক এবং মানসিক শক্তি পরীক্ষা করে দেখা হয়। নানারকম ডাক্তারি ও অন্যান্য পরীক্ষার পর যদি সে পরীক্ষায় পাশ করে, তবেই তাকে 'কিল গেম'-এ নামার সুযোগ দেওয়া হয়।

খেলায় নামার আগে খেলোয়াড়কে বন্ড সই করতে হয়—যেমন করতে হয় অপারেশনের আগে। সেই বন্ডে লেখা থাকে ঃ ' "কিল গেম" -এ মৃত্যু হলে কিংবা অঙ্গহানি হলে সুপারগেমস্‌ কর্পোরেশন দায়ী নয়।'

এ ছাড়া খেলোয়াড়কে এক কোটি টাকার ইনশিয়োরেন্স করিয়ে দেয় নিউলাইফ ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি। খেলায় ক্যান্ডিডেটের ভালো-মন্দ কিছু হলে তার ফ্যামিলি ওই এক কোটি টাকা পায়।

'কিল গেম' খেলাটা হয় নিউ সিটির একটা নকল শহর 'গেম সিটি'-তে। শহরটার মাপ কুড়ি কিলোমিটার বাই কুড়ি কিলোমিটার। সেই শহরে রাত বলে কিছু নেই—সবসময়েই পড়ন্ত বিকেলের আলো চারশো বর্গকিলোমিটারের গেম সিটি-তে ছড়িয়ে আছে। সেই অদ্ভুত গোধূলি আলোয় গেম সিটি জেগে ওঠে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য।

কী নেই সেই গেম সিটি তে। পাহাড় আছে, ঝরনা আছে, জঙ্গল আছে, নকল নদী আছে, আছে বাড়ি-ঘর, যানবাহন, দোকানপাট। একটা আধুনিক শহরে যা-যা থাকে তার সবই আছে। শুধু নেই কোনও মানুষ।

'কিল গেম'-এ কোনও খেলোয়াড় 'স্বেচ্ছায়' নাম দিলে তখন চব্বিশ ঘণ্টার জন্য শহরটা লোকজনে টগবগ করে। যেমন, জিশান এখন 'স্বেচ্ছায়' নাম দিতে বাধ্য হচ্ছে।

'কিল গেম' খেলাটার লম্বা প্রোমো টিভিতে বহুবার দেখেছে জিশান। প্রায় একঘণ্টা ধরে দেখানো হয় সেই প্রোমো।

যেদিন চব্বিশ ঘণ্টার খেলাটা শুরু হয় তার আগের দিন থেকেই গেম সিটি-কে সাজিয়ে ফেলা হয়। বাড়ি-ঘরগুলো 'বেড়াতে আসা' টুরিস্ট ফ্যামিলিতে ভরে যায়। দোকানপাট ভরে যায় লোভনীয় খাবারদাবারে। সেসব দোকানে তদারকি করে একদিনের নকল দোকানদাররা। আর রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় নানান গাড়ি। বহু গাড়ি এখানে-সেখানে দাঁড় করানো থাকে—যেন মনে হয়, গাড়িগুলো পার্ক করে মালিক বা ড্রাইভাররা এদিক-ওদিক কোথাও গেছে।

সব মিলিয়ে যে-ছবিটা তৈরি হয় সেটা আসল কোনও শহরের মতোই। তবে সমুদ্র নেই এই যা।

'কিল গেম' খেলার সময় গেম সিটি-তে যারা থাকে তারা সবাই 'টুরিস্ট' হলেও 'কিল গেম'-এর পার্টিসিপান্ট। খেলার আগের দিন তারা সবাই এসে খালি হাতে গেম সিটি-তে ঢুকে পড়লেই হল। বাকি সব ব্যবস্থার দায়িত্ব সুপারগেমস্‌ কর্পোরেশনের। ফলে পার্টিসিপান্টদের জন্য সব ফ্রি। যেমন খাবারের দোকানে খেতে গেলে পয়সা লাগবে না, তেমনই গাড়ি চড়ে ঘোরা যাবে বিনাপয়সায়। অর্থাৎ, থাকা-খাওয়া-বেড়ানোর কোনও খরচ নেই।

অথচ পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ আছে।

আর সবচেয়ে বড় পুরস্কার রয়েছে চারজনের জন্য।

তার মধ্যে আবার সেরা পুরস্কারের দাবিদার হবে জিশান। বাকি তিনজন পাবে সমান অঙ্কের দ্বিতীয় পুরস্কার।

কিন্তু খেলাটা কী?

খুব সহজ-সরল। খেলার দিন খেলার হিরোকে ভোর ছ'টায় ঢুকিয়ে দেওয়া হবে গেম সিটি-তে। আর তার দু-ঘণ্টা পর হিরোকে 'শিকার' করতে তিনজন কিলার বেরিয়ে পড়বে। তারপর চলবে শিকার-শিকারি খেলা। বাইশ ঘণ্টা ধরে হিংস্র লুকোচুরি। যদি নায়ক খেলার শেষে বেঁচে থাকে, তবেই পাবে একশো কোটি টাকা। আর যদি...।

নাঃ, আর ভাবতে চাইল না জিশান। ও ব্যথাতুর চোখে মিনির দিকে তাকাল। মিনির চোখে নজর পড়তেই জিশানের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। এত মায়া ওই রোগা মেয়েটার দু-চোখে। শেষ দেখার সময় লোকে বোধহয় এভাবেই তাকায়।

শ্রীধর পাত্রী ছোট্ট করে হাততালির শব্দ করলেন, গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'বলো, বাবু, কী করবে? ধারা তিনশো দুই—না কিল গেম? অবশ্য অল দ্য সেম—শুধু "কিল গেম"-এ বাঁচার সামথিং সম্ভাবনা আছে এই যা।'

জিশান উঠে বসল মেঝে থেকে। ওর মাথা ঝিমঝিম করছিল। সবকিছু কেমন ঝাপসা হয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

ও সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছে তো? শুনতে পাচ্ছে তো ঠিকঠাক?

ওই তো মিনি। ওর পাতলা ঠোঁট কাঁপছে। চোখের কোণে জলের ফোঁটা।

জিশান এবার উঠে দাঁড়াল। কালো পোশাক পরা তিন প্রহরীর দিকে একবার তাকাল। ওরা পিস্তল নাড়িয়ে জিশানকে সতর্ক করে দিল।

জিশান সেসব ভ্রূক্ষেপ না করে শ্রীধর পাত্রীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। শান্ত গলায় জিগ্যেস করল, 'এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই?'

'না গো, নেই। এই খেলাটায় কী আর মেলা পাবলিক পাওয়া যায়। কোটিতে গুটি গুটি। তাই তিনশো দুই, নয় তো "কিল গেম"।'

'কখন যেতে হবে আমাকে?'

'আমরা তোমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে এসেছি, জিশান। এখান থেকে গুটারে চড়ে আমরা সোজা চলে যাব সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টারে। সেখানে কতকগুলো ফরমালিটি সেরে তারপর সোজা সুপারগেম্স কর্পোরেশনের গেম্স বিল্ডিং। তারপর...।'

'তারপর?' প্রশ্নটা করে মনে-মনে নিজের ভবিষ্যতের ছবিটা আঁকতে চেষ্টা করল জিশান।

হাসলেন শ্রীধর। পিস্তলটা নাচাতে-নাচাতে বললেন, 'তারপর শুরু হবে প্রিলিমিনারি গেমস্। এই গেমগুলো বলতে গেলে "কিল গেম"-এর ট্রেনিং। এই ট্রেনিং চলবে দু-মাস। তারপর স্পেশাল ট্রেনিং। এই ট্রেনিং-এর পর তুমি রেডি হলে গেমের ডেট অ্যানাউন্স করা হবে। প্লেট টিভিতে খবর পৌঁছে যাবে সব জায়গায়—ওল্ড সিটিতে, নিউ সিটিতে...।'

মিনি আর থাকতে পারল না। হিংস্রভাবে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রীধরের ওপরে।

শ্রীধর পলকে বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে লোহার আঙুলে মিনির টুঁটি টিপে ধরলেন।

'আঁক' শব্দ করে মিনির চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল মাঝপথে। ওর চোখ দুটো কোটর ছেড়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। ও হাঁ করে এক আঁজলা বাতাস টানার জন্য আইঢাই করতে লাগল।

জিশান লাফিয়ে পড়ল শ্রীধরের বাঁ-হাতের ওপরে। হাতটা আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে ছাড়াতে চাইল। কিন্তু পারল না।

তার কারণ, জিশান হাতটা ধরে টানাটানি শুরু করতেই শ্রীধর ওঁর ডানহাতে ধরা পিস্তলটা প্রচণ্ড জোরে জিশানের কাঁধে বসিয়ে দিয়েছেন। আর জিশান সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধ চেপে ধরে বসে পড়েছে মেঝেতে।

এক ধাক্কায় মিনিকে ছিটকে ফেলে দিলেন শ্রীধর। মেয়েটা ঘরের কোণে রাখা একটা ঝুড়ির ওপরে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীধর সঙ্গীদের ইশারা করলেন। ওরা তিনজন জিশানকে ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে চেপে ধরল। তারপর টানতে-টানতে নিয়ে চলল ঘরের বাইরে।

চলে যাওয়ার আগে শ্রীধর মিনিকে লক্ষ করে বললেন, 'চলি, শ্রীমতী পালচৌধুরী। ভয় নেই...আপনার সঙ্গে আমাদের রেগুলার যোগাযোগ থাকবে। আমরা আপনাকে একটা ভিডিয়ো-মোবাইল সেট দিয়ে যাব। সেটা আমাদের স্পেশাল ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে কাজ করে। ওটা দিয়ে আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে কনস্ট্যান্ট কানেকশান রাখতে পারবেন।'

মিনি তখন ঘরের কোণে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ফ্যালফ্যালে চোখে তাকিয়ে আছে শ্রীধরের দিকে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে না, ওঁর কথার একটি বর্ণও মিনির মাথায় ঢুকেছে।

প্রহরী তিনজন চৌকাঠের বাইরে এসে শ্রীধর পাত্তার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কয়েক লহমা অপেক্ষা করছিল। তখন জিশান ঘুরে তাকাল ঘরের দিকে। দেওয়ালে টাঙানো বাবার ফটোর ওপরে চোখ পড়ল ওর।

বাবা তাকিয়ে আছে জিশানের দিকে। স্থির শান্ত চোখে এক অলৌকিক আত্মবিশ্বাস।

জিশান শ্বাস টানল। মিনির নাম ধরে ডাকল দুবার।

শ্রীধর পাট্টা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। মিনিও ওঁর পিছন পিছন ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে।

মিনির দিকে না তাকিয়েই শ্রীধর মসৃণ নরম গলায় তখনও ওকে বলে চলেছেন, 'টাকা-পয়সার জন্যে চিন্তা করবেন না, মা-মণি। অন্ন চিন্তাও করবেন না। ওসব ব্যবস্থা আমরা করব—যদি অবশ্য "কিল গেম"-এ নাম দেয় আপনার হাজব্যান্ড। আন্ডারস্ট্যান্ড? আর যদি শ্রীপালচৌধুরী খেলায় জিতে যান, তা হলে একশো কোটি টাকা আপনাদের। তখন এই নোংরা জঘন্য মস্তিহীন বস্তিতে আপনাদের আর থাকতে হবে না। সুতরাং আপনাদের জন্যে ব্রাইট ফিউচার ওয়েট করছে। যদিও তাতে স্লাইট রিস্ক আছে।'

ওঁরা বস্তির গলিপথ ধরে হেঁটে রওনা দিলেন।

মলিন আলো-আঁধারি গলিতে দুপাশে ছায়া-ছায়া মুখ দেখতে পাচ্ছিল জিশান। পাড়াপড়শিদের কৌতূহলী ভিড়।

ছ'জনের মিছিলটা ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এল গলির বাইরে। পিছনে উৎসাহী জনতার দল।

প্যাঁচার ডাক শুনতে পেল জিশান। শুনতে পেল মিনিও। ভয়ে ওর বুকটা দুরুদুরু করে উঠল।

কিন্তু জিশান প্যাঁচার ডাকটাকে পাত্তা দিল না। বরং ভাবল, যদি এই ডাকটা অশুভ হয়, তা হলে সেটা শ্রীধরের জন্যও হতে পারে।

গলি থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে অনেকটা ঘুরে আর-একটা রাস্তায় এল ওরা। রাস্তার একপাশে আবর্জনার স্তূপ। সেখানে নেড়ি কুকুরের ভিড়।

তারই আড়ালে দাঁড়িয়েছিল তিনটে গুটার। নীল-সাদা ডোরাকাটা লম্বাটে চেহারা। হুড খোলা। সামনে লাগানো টার্বো-প্রপ।

ওরা সবাই গুটারের দিকে এগোল। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে পাড়াপড়শির ঝাঁকও সঙ্গে-সঙ্গে এগোল।

মিনি জিশানের হাত আঁকড়ে ধরল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'আমি আর শানু সবসময় তোমার কথা ভাবব।'

'আমিও তোমাদের কথা ভাবব। এ ছাড়া এই জীবনে ভাবার মতো আর কী আছে। তুমি বাড়ি যাও...শানু একা রয়েছে...।' কথা শেষ করতে গিয়ে জিশানের গলা ভেঙেচুরে গেল। ওর ভেতরটাও।

মিনি ঠোঁট টিপে কান্না আটকাতে চাইল। মাথা নাড়তে লাগল বারবার। যেন বলতে চাইল : 'যেয়ো না! তুমি যেয়ো না...।'

জিশান ভেতরের কষ্ট আর সইতে পারছিল না। এভাবেই তা হলে 'কিল গেম'-এর খেলোয়াড় জোটায় সুপারগেমস কর্পোরেশন। দু-মাস কি আড়াইমাস

আগে 'কিল গেম'-এর যে-লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছিল তাতে ছেলেটা ষোলো ঘণ্টার পর মারা গিয়েছিল। ওর ফ্যামিলি বলতে কিছু ছিল কি না জিশান জানে না।

কিন্তু জিশানের?

জিশান শুধু ফ্যামিলি নয়, ওর প্রাণটাও রেখে যাচ্ছে এই বস্তিতে। আর ওর দেহটা যাচ্ছে 'কিল গেম'-এ লড়তে। যদি প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য ওর দেহটাকে ওই মরণখেলায় লড়তেই হয়, জিশান দেখিয়ে দেবে লড়াই কাকে বলে। চব্বিশ ঘণ্টা নয়, পুরোপুরি তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিটই ও লড়বে। দরকার হলে তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট ষাট সেকেন্ড। শিকার আর শিকারির খেলায় ও হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দেবে কে শিকার, আর কে শিকারি।

জিশানের নজর ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। চোখ মুছে নিয়ে ও তাকাল মিনির দিকে। ঠান্ডা গলায় বলল, 'তুমি বাড়ি যাও—শানু একা রয়েছে—ভয় পাবে।'

জিশানকে ধাক্কা মেরে শুটারে তুলল মার্শালের দলবল।

তারপর তীব্র সিটি দিয়ে তিনটে শুটার ছুটতে শুরু করল। কয়েকটা বাড়ির ময়লা জানলার কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। একটু পরেই শুটারগুলো ভেসে উঠল শূন্যে। মিনি আর জটলা করা মানুষজন ছোট হয়ে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। একইসঙ্গে ওল্ড সিটিও।

আকাশে চোখ রাখল জিশান। কোথাও-কোথাও ছন্নছাড়া মেঘ থাকলেও চাঁদ এবং রঙিন ধূমকেতু দুটো চোখে পড়ছে। আরও নীচে...দূরে...বহু দূরে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য রঙিন আলোর বিন্দু...নেকলেসের মতো চিকচিক করছে। রাতের নিউ সিটি—যেখানে জিশান এখন যাচ্ছে।

মালিকের কথা মনে পড়ল জিশানের : '...কার্তিক সালাকে না উড়িয়ে তুই জল খাবি না। গড প্রমিস।'

সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনকে কি কার্তিক বলে ভাবা যায়? যদি যায়, তা হলে ওর উরুসন্ধিটা কোথায়? জিশান জানে, 'কিল গেম' খেলার নিয়ম হচ্ছে, ওই খেলায় কোনও নিয়ম নেই। বাঁচার জন্য তুমি যা খুশি করতে পারো।

ও চোয়াল শক্ত করে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তেরো বছর পর ও আবার নিউ সিটিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। যদি খেলায় ও হেরে যায় তা হলে নিউ সিটিতে আর থাকতে পারবে না। ফিরতে পারবে না ওল্ড সিটিতেও।

ওকে চলে যেতে হবে ওপরে।

পাশে বসা শ্রীধর মুখ ফিরিয়ে তাকালেন জিশানের দিকে, হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কী বাবু, চুপচাপ কেন? ভয় করছে?'

জিশান সরাসরি তাকাল শ্রীধরের দিকে। ঠান্ডা পাথরের মতো গলায় বলল,

'হ্যাঁ, ভয় করছে—তোমার জন্যে।'

অন্ধকার আকাশ চিরে তিনটি ওটার শিস দিয়ে উড়ে চলল।

জিশানের তখনই মনে হল, ওরা শিস দিয়ে গান গাইছে। মৃত্যুর গান।

•

রাতটা জিশানের কাটল ওল্ড সিটিতেই—পিস ফোর্সের হেড-অফিসের গেস্টহাউসে।

শ্রীধর পাট্টা নিউ সিটিতে যেতে চাইলেও যাওয়া হয়নি।

ওটারের পাইলটকে সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টারে উড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীধর। কিন্তু পাইলট হঠাৎই সমস্যার কথা জানিয়েছে। একটি ওটারের ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ায় একটা টার্বোপ্রপ কাজ করছে না।

তখন শ্রীধর যে-ভাষায় পাইলটকে গালিগালাজ করলেন সেটা বোধহয় শুধু ওঁকেই মানায়। তারপর মোবাইল ফোন বের করলেন পকেট থেকে, চটপট হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করলেন।

সাংকেতিক ভাষায় কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ। জিশান তার একবর্ণও বুঝতে পারল না।

অবশেষে ফোন ছেড়ে দিয়ে শ্রীধর তাকালেন জিশানের দিকে, হাসলেন : 'জিশান, আজকের রাতটা আমাদের পিস ফোর্সের এখানকার গেস্টহাউসে থাকতে হচ্ছে। সেখানেই হবে তোমার রেস্ট। সেটাই বোধহয় বেস্ট। আর কাল থেকে শুরু হবে তোমার টেস্ট।'

টেস্ট। কীসের টেস্ট?

জিশান শুনেছে কিল গেম এ নামার আগে বড় মাপের ট্রেনিং আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু সেগুলো ঠিক কী ধরনের পরীক্ষা জিশান জানে না।

শ্রীধরের অন্ত্যমিল মন্তব্যগুলোর কোনও জবাব দিল না ও।

ততক্ষণে ওটারের নাক ঘুরিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেছে ওল্ড সিটির পিস ফোর্সের হেডকোয়ার্টারের দিকে।

হেডকোয়ার্টারে নেমে সোজা গেস্টহাউসের ঘর।

এরকম আরাম জিশান শেষ কবে পেয়েছে মনে পড়ে না।

শোওয়ার জন্য গোটা একটা ঘর—তাও আবার মাপে বিশাল। চারপাশে ধপধপে সাদা দেওয়াল। রাজহাঁসের পালকের মতো বিছানা। শীতাতপের আরাম চারপাশে ভাসছে। খুব নিচু সুরে মনভোলানো বাঁশি বেজে চলেছে। বাতাসে একটা পাগল করা সুবাস।

সব মিলিয়ে মোলায়েম আরামে চোখ বুজে আসছিল জিশানের।

ওর চোখে-মুখে হতবাক ভাব দেখে শ্রীধর বলে উঠলেন, 'সিন্ডিকেটের গেম পার্টিসিপ্যান্টস ক্যাম্পাসের গেস্টহাউসে তোমার জন্যে থাকার ব্যবস্থা অনেকটা এইরকম। তবে এর চেয়েও ভালো।'

এর চেয়েও ভালো হওয়া সম্ভব! অবাক হয়ে ভাবল জিশান।

রাতে বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে স্বপ্নের দেশে তলিয়ে গেল ও। বুঝতে পারল, এইসব বিছানায় স্বপ্ন অনেক সহজে আসে।

স্বপ্নে মিনি আর শানুকে দেখতে পেল। সেই স্বপ্ন ভাঙল ভোরবেলায়—ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে।

জিশান দেখল, শ্রীধর পাট্টা ওঁর টিপটপ পোশাক পরে জিশানের বিছানার সামনে হাজির। সঙ্গে কাঠখোদাই তিন প্রহরী।

ওকে নিয়ে ভোরের আকাশে ভেসে পড়ল তিনটে গুটার।

জিশান অবাক চোখে দূরের নিউ সিটির দিকে তাকিয়ে রইল। কতদিন পরে শহরটাকে ও দেখতে পাবে!

নিউ সিটিকে কখনও পাখির চোখে দেখেনি জিশান। গুটার থেকে এই প্রথম দেখল।

উঁচু-উঁচু আকাশছোঁয়া মিনার, আর তার ফাঁকে-ফাঁকে আয়তাকার সবুজ কিংবা নীল।

সবুজগুলো পার্ক, কিংবা চাষের খেত। অথবা পরিকল্পনা করে তৈরি করা বনাঞ্চল। নিউ সিটিতে অবহেলায় পড়ে থাকা কোনও সবুজ মাঠ নেই। সব সবুজকেই এখানে কাজে লাগানো হয়েছে।

আর নীলগুলো জল। কোনওটা সুইমিং পুল, কোনওটা আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের দিঘি।

মাঝে-মাঝে হালকা নীল যে-চৌকোনা রং দেখা যাচ্ছিল সেগুলো খেলার মাঠ। মাঠে সিনথেটিক টার্ফ লাগানো। এইসব মাঠে ছেলেবেলায় খেলেছে জিশান।

এ-কথা মনে পড়তেই ও ছেলেবেলায় ঢুকে পড়ল পলকে।

ফিটফাট হয়ে জিশান স্কুলে যাচ্ছে। এয়ারকন্ডিশনড স্কুল বাস। বাস চলার কোনও শব্দ নেই। ধোঁয়ার দূষণ নেই—কারণ, বাসগুলো সব ব্যাটারি পাওয়ারড ভেহিক্‌ল। ছবির মতো পথ ধরে জিশানদের বাস স্কুলের দিকে ছুটে চলেছে।

অ্যাস্ট্রো টার্ফের ওপরে খেলছে জিশান। বন্ধুদের নাম ধরে চিৎকার করছে। রবিন, টুকাই, সোনা, বুকি। ওরা সব এখন কোথায় কে জানে! জিশানের মতো ওল্ড সিটিতে নিশ্চয়ই চলে যায়নি—কিংবা যেতে বাধ্য হয়নি।

নাঃ, ছেলেবেলাটা খারাপ ছিল না। এই ছেলেবেলার গল্প মিনিকে কতবার শুনিয়েছে জিশান। আক্ষেপ করে বলেছে, শানুর ছেলেবেলাটা এরকম সুন্দর করতে

পারলে কত ভালো হত।'

হঠাৎই আঙুল তুলে নীচের দিকে দেখালেন শ্রীধর পাত্র। বললেন, 'ওই যে, জিশানবাবু। ওটাই গেম সিটি। ওখানেই তুমি খেলবে কিটি-কিটি। বেড়াল আর নেংটি ইঁদুর। হাইড অ্যান্ড সিক...হাইড অ্যান্ড সিক। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। তোমার লুকোচুরি খেলার লাইভ টেলিকাস্ট হবে...পাবলিক দেখবে। কী থ্রিলিং হবে মাইরি!'

শ্রীধর পাত্রের ন্যাকা সুরের কথা শুনতে-শুনতে জিশানের গা-রিরি করছিল। পাশে বসে থাকা লোকটার উত্তাপ টের পাচ্ছিল ও। লোকটা যে একইসঙ্গে হিংস্র এবং জঘন্য সেটা জিশান ক্রমশ বুঝতে পারছিল।

গেম সিটির দিকে তাকাল জিশান।

কুড়ি কিলোমিটার বাই কুড়ি কিলোমিটার মানুষ মারার কল। যেন এক বিশাল খাঁচায় বেড়ালের ইঁদুর ধরার খেলা। জিশান ইঁদুর। আর অজানা তিনজন শিকারি—তারা হুলো বেড়াল।

মিনি আর শানুর কথা মনে পড়ল জিশানের। ওরা এখন বাড়িতে একা। জিশান নেই। মিনির নিশ্চয়ই ভীষণ ফাঁকা লাগছে।

জিশান তাকাল শ্রীধরের দিকে।

নির্বিকার মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। চোয়ালের রেখা শক্ত। লাল টুকটুকে ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নিলেন।

'আমার ওয়াইফের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছে—।' ধরা গলায় আমতা-আমতা করে বলল জিশান।

শ্রীধর ওর দিকে তাকালেন। ঠোঁট ফাঁক না করে হাসলেন : 'এর মধ্যেই উতলা? হায়, মা শীতলা! ধৈর্য---ধৈর্য। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যাবে। স্পেশাল ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের মাইক্রোভিডিয়োফোন পৌঁছে যাবে তোমার ওয়াইফ মিনির—তাই তো নামটা?—কাছে। তোমার কাছে থাকবে আইডেন্টিক্যাল আর একটা হ্যান্ডসেট। তখন দশমিনিট ধরে যত প্রাণ চায় কথা বোলো—ফ্রি টকটাইম---কিল গেম পর্যন্ত। তারপর তো...' মুখে 'ফুস্-স্' শব্দ করে আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখালেন শ্রীধর।

এই ইশারার অর্থ বুঝতে জিশানের অসুবিধে হল না। ও চুপ করে গেল। মাইক্রোভিডিয়োফোনটা হাতে পাওয়ার জন্য এখন থেকেই অপেক্ষা করতে শুরু করল।

মাথার ওপরে নীল আকাশ আর সোনালি রোদ। সূর্যের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ধূমকেতু দুটোর রং এখন বোঝা যাচ্ছে না। সূর্যের আলোয় হারিয়ে গেছে। ঝকঝকে রোদে নীচের নিউ সিটিকে গ্রাফিক আর্ট বলে মনে হচ্ছে। তারই মাঝে ঝিকিয়ে উঠছে বেতার সংযোগের বড় অ্যান্টেনাগুলো।

শুটার তিনটে স্ক্রুর প্যাঁচের মতো অদ্ভুতভাবে পাক খেয়ে নেমে এল অনেকটা নীচে। সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টারটা দেখতে পেল জিশান।

বিশাল মাপের আকাশে-চুমু-খাওয়া বিল্ডিং। বিল্ডিংটার চারদিকেই রুপোর মতো ঝকঝকে পাত লাগানো। জানলা বলে কিছু চোখে পড়ছে না। বিল্ডিং-এর মাথার কাছটায় ধাতুর হরফে বড়-বড় করে লেখা :

The Syndicate HQ

আর লেখাটার নীচে সিন্ডিকেটের লোগো। লোগোটা গ্রাফিক ঢঙে আঁকা একটা 'S'।

মিনিটখানেক যেতে-না-যেতেই শুটারগুলো শিস দিয়ে নেমে পড়ল সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর মসৃণ ছাদে।

শ্রীধর মোবাইল ফোন বের করে কার সঙ্গে যেন চাপা গলায় কথা বললেন। তারপর জিশানকে বললেন, 'কাম অন, বয়। আমরা এসে গেছি—।

'বয়' সম্বোধনটা জিশানের ভালো লাগল না। ও বিরক্তভাবে শ্রীধরের দিকে তাকাল শুধু।

শ্রীধর ঠোঁট বেঁকিয়ে তেরছা হাসলেন। জিশানের থুতনিতে কড়ে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, 'হরিদাসের দেখছি রাগ হয়েছে! এখনই এত রাগ করে না, সোনা। রাগ করার মতো এখনও প্রচুর ব্যাপার বাকি। রাগ করতে-করতে তুমি টায়ার্ড হয়ে যাবে। তখন তোমার সব রাগ ওয়াটার হয়ে যাবে—ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া।'

কথাটা শেষ করেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন শ্রীধর। শুটারের একটা অংশে বাঁ হাতের ভর দিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় শূন্যে লাফ দিয়ে শুটারের বাইরে নেমে পড়লেন।

দাঁতে দাঁত চেপে রইল জিশান। ধীরে-ধীরে নেমে এল শুটার থেকে।

বাকি তিনজন প্রহরীও নেমে পড়েছিল অন্য দুটো শুটার থেকে।

সবাই নেমে পড়তেই শ্রীধর পাইলটদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনটে শুটার শিস দিয়ে আবার ভেসে পড়ল আকাশে।

জিশান আগেই লক্ষ করেছিল, ছাদের মসৃণ মেঝেতে বড়-বড় মাপের খোপ কাটা—অনেকটা দাবার ছকের মতো। গোটা ছাদটা ছাই রঙের হলেও তার মধ্যে একটা খোপের রং কুচকুচে কালো।

সবাইকে ডেকে নিয়ে সেই খোপটার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন শ্রীধর। পা দিয়ে মেঝেতে তিন-চারবার শব্দ করলেন। অমনি সেই কালো অংশটা নামতে শুরু করল নীচের দিকে।

জিশান এক পলকের জন্য চমকে উঠেছিল।

সেটা লক্ষ করে শ্রীধর মুচকি হেসে বললেন, 'অটোমেটিক প্লেট

এলিভেটর—অডিয়ো অ্যাক্টিভেটেড।'

জিশান অবাক হয়ে ভাবছিল, ষোলো বছরে নিউ সিটিতে প্রযুক্তি অনেকটাই এগিয়ে গেছে। আর ওল্ড সিটিতে সেটা দ্বিগুণ গতিতে পিছিয়ে গেছে।

এলিভেটার মসৃণভাবে নীচে নামছিল। এলিভেটর শ্যাফ্টের চার দেওয়াল থেকে ঠান্ডা নরম আলো ছড়িয়ে পড়ছিল জিশানদের ওপরে। একটা দেওয়ালে বসানো অনেকগুলো আলোর বোতাম। এলিভেটরের সঙ্গে-সঙ্গে বোতামগুলোও সমান গতিতে নেমে চলেছে—অনেকটা উৎসবের আলোকসজ্জার চলমান টুনি বাতির মতো।

বোতামগুলোর ওপরে সংখ্যা লেখা রয়েছে।

শ্রীধর '23' লেখা বোতামটি টিপলেন। তারপর যেন আপনমনেই বললেন, 'টোয়েন্টি থার্ড ফ্লোরে রেজিস্ট্রেশান ডেস্ক। আমরা সেখান থেকে শুরু করব।'

●

সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর সবকিছুই জিশানকে অবাক করছিল। মনে হচ্ছিল, ও বিশাল কোনও মহাকাশযানের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চারপাশে ঠান্ডা নরম আলো। ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে ইউনিফর্ম পরা কর্মীরা যাতায়াত করছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই—শুধু মসৃণ মেঝেতে জুতোর খটখট শব্দ। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

গোটা বাড়িটাই যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেটা জিশান শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিল। এখন করিডর দিয়ে হাঁটার সময় ওর বেশ শীত-শীত করতে লাগল।

করিডরের দেওয়ালগুলো ধপধপে সাদা, আর মেঝেতে চকচকে বাদামি গ্র্যানাইট পাথর। কোথাও এককণা ময়লা নেই, একবিন্দু অনিয়ম নেই।

চারপাশটা এত ঝকঝকে পরিষ্কার যে, জিশানের নোংরা জামা-প্যান্ট আরও নোংরা দেখাচ্ছিল। সঙ্কোচে জিশান একটু কুঁকড়ে গেল।

করিডরে ওরা এতবার বাঁক নিল যে, জিশানের দিক গুলিয়ে গেল।

একটু পরেই ওরা এসে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে। দরজার মাথায় একটা লুমিনাস হেডিং জ্বলছে : রেজিস্ট্রেশান।

পকেট থেকে একটা ম্যাগনেটিক স্মার্ট কার্ড বের করলেন শ্রীধর পাট্টা। সেটা দরজার পাশের একটা স্লটে ঢুকিয়ে টানলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে যেন একটা রেকর্ডেড ভয়েস বলে উঠল : 'থ্যাংক য়ু।' এবং দরজার পাল্লাটা স্লাইড করে সরে গেল একপাশে।

প্রহরীদের হাত নেড়ে চলে যেতে ইশারা করলেন শ্রীধর। ওরা অ্যাবাউট টার্ন করে করিডর ধরে হেঁটে রওনা হল।

জিশানকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীধর রেজিস্ট্রেশান রুমে ঢুকে পড়লেন।

বিশাল ঘর। ঘরের শেষ প্রান্তে গোটা দশ-বারো কাউন্টার। কাউন্টারের মাথায় জ্বলন্তুনে লাল আলোর হরফে নম্বর লেখা। প্রতিটি কাউন্টারে একটি করে ছিপছিপে মেয়ে বসে আছে। ওদের সামনে একটা করে কালো রঙের ল্যাপটপ কম্পিউটার।

কালো পোশাক পরা পাঁচজন সিকিওরিটি গার্ড ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের দুজনের চোখে অদ্ভুত ধরনের কালো চশমা। কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্ট। বেল্টের একপাশ থেকে ঝুলছে গাঢ় নীল রঙের একটা রড, তবে তার হাতলের দিকটা কালো চামড়ায় মোড়া।

শ্রীধরকে দেখেই গার্ডগুলো টান-টান হয়ে দাঁড়াল। চোখ নামাল মেঝের দিকে।

শ্রীধর একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তীক্ষ্ণ চোখে তার পোশাকটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। ওপরওয়ালার জরিপ-নজরের সামনে গার্ডটা একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গার্ডদের কালো পোশাকে সোনালি বিডের লাইনিং লাগানো। বুকে সোনালি ব্যাজ। ব্যাজের মনোগ্রামে সুন্দর ছাঁদে লেখা পি. এফ.।

গার্ডটির বুকের ব্যাজের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শ্রীধর পাট্টা। যেন চোখের তীব্র নজরে ব্যাজটাকে ভস্ম করে ফেলবেন। তারপর হাত বাড়িয়ে গার্ডের কোমর থেকে নীল রঙের রডটা তুলে নিলেন।

জিশান লক্ষ করল, রডটার কালো হাতলের কাছে একটা ছোট সুইচ রয়েছে।

সুইচটা অন করে চোখের পলকে রডের ডগাটা গার্ডটির পেটে চেপে ধরলেন শ্রীধর।

লোকটার শরীর স্প্রিং-এর মতো হেঁচকি তুলে ছিটকে লাফিয়ে উঠল। ওর মুখ দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণার চিৎকার বেরিয়ে এল। চোখে লাগানো কালো চশমাটা ঠিকরে পড়ল দূরে।

শ্রীধর রডের ডগাটা ক্ষিপ্রভাবে আবার চেপে ধরলেন গার্ডের পাঁজরে।

থরথর করে কেঁপে উঠল লোকটা। তিনহাত পিছনে ছিটকে পড়ল। মেঝেতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

জিশানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন শ্রীধর। বললেন, 'খেয়াল করেছ, ওর বুকের ব্যাজটা একটু বেঁকাভাবে লাগানো রয়েছে? নিউ সিটিতে প্রতিটি মিসটেকের জন্যে হাই স্টেক। এমনিতে স্বস্তি, কিন্তু ভুল করলেই শাস্তি...।'

একটি গার্ডকে শাস্তি দেওয়ার কাজ যখন চলছিল, অন্য চারজন গার্ড তখন স্ট্যাচুর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। যেন ওদের চোখ কিছুই দেখতে পাচ্ছে

না. ওদের কান কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

নীল রঙের যন্ত্রে জিনিসটা তখনও শ্রীধরের হাতে শক্ত করে ধরা ছিল। তিনি সেটার সুইচ অফ করে দিলেন।

রডটার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমতা-আমতা করে জিশান প্রশ্ন করল, 'এটা কী?'

'এটার নাম শকার।' হেসে বললেন শ্রীধর পাত্রা, 'শাসনের জন্যে দরকার। আর ওই কালো চশমাটা—ওই যে মেঝেতে পড়ে আছে...' আঙুল তুলে চশমাটা দেখালেন শ্রীধর : 'ওটা স্পেশাল এক্স-রে ভিশান স্পেক্‌স।'

জিশান তখনও রডটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। মাঝে-মাঝেই ওর দৃষ্টি ছিটকে যাচ্ছিল মেঝেতে পড়ে থাকা হতভাগা লোকটার দিকে। লোকটা এখনও অল্প-অল্প নড়ছে। কাতরাচ্ছে।

'সুইচ অন করলে এটার মধ্যে ফোর হান্ড্রেড ভোল্ট্‌স এসি তৈরি হয়।' শ্রীধর তখনও বলছিলেন, 'তারপর কারও গায়ে চেপে ধরলে...ওই যে, নেংটি ইঁদুরটা মেঝেতে পড়ে চিঁ-চিঁ করছে...।'

রডটা সামনে ধরে পড়ে থাকা লোকটার দিকে দেখালেন শ্রীধর পাত্রা।

জিশান যেন একটা ধাক্কা খেল।

ইউনিফর্মের বুকে লাগানো ব্যাজটা সামান্য বেঁকে আছে বলে চারশো ভোল্টের শক। শ্রীধর কি মানুষ?

শকারটা বগলে চেপে ধরে শ্রীধর পকেট থেকে ছোট্ট শিশিটা বের করে নিলেন। শিশির মুখটা খুলে ওপরদিকে তাকিয়ে হাঁ করলেন। শিশি থেকে তিন ফোঁটা তরল মুখে ঢাললেন। জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে চটপটি বাজির মতো 'চটাস! চটাস!' শব্দ করলেন কয়েকবার । জোরে-জোরে এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকালেন। ওঁর দু-গালে লাল আভা দেখা গেল। ওঁকে এখন অনেক চাঙ্গা মনে হল জিশানের।

এইবার জিশানকে ইশারায় কাছে ডেকে নিলেন শ্রীধর। সোজা এগিয়ে গেলেন সাতনম্বর কাউন্টারের কাছে।

কাউন্টারের মেয়েগুলো এতক্ষণ ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে শ্রীধরের কীর্তিকলাপ দেখছিল। এখন শ্রীধর আর জিশানকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে সাতনম্বর কাউন্টারের মেয়েটির মধ্যে প্রাণ এল।

'কিল গেম পার্টিসিপ্যান্ট—' ঠোঁট প্রায় ফাঁক না করেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন শ্রীধর।

'কিল গেম' কথাটা শোনামাত্রই কম্পিউটারের কিবোর্ডে খটখাট শুরু করল মেয়েটি। তারপর জিশানের দিকে না তাকিয়েই যান্ত্রিক সুরে প্রশ্নমালা শুরু করল।

'নাম?'

'জিশান—জিশান পালচৌধুরী।'

'বয়েস?'

'ছাব্বিশ।'

'হাইট? ওয়েট?'

'পাঁচ-এগারো। আর ওয়েট চুয়াত্তর কেজি বোধহয়—লাস্ট যখন ওয়েট নিয়েছিলাম।'

'নো প্রবলেম। এসব ডেটা আমরা আবার ক্রসচেক করে নেব—আমাদের রুটিন মেডিক্যাল চেক-আপ-এর সময়...।'

জিশান প্রশ্নের উত্তর দেওয়ামাত্রই মেয়েটির আঙুল চলছিল কিবোর্ডে। জিশান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ও ঢুকিয়ে দিচ্ছিল কম্পিউটারের মগজে।

জিশান মেয়েটিকে লক্ষ করছিল।

ছিপছিপে ফরসা চেহারা। মুখের মাপের তুলনায় চোখগুলো বড়-বড়। মুখের দুপাশে চুলের ঢল নেমেছে—ফলে মুখটাকে আরও ছোট দেখাচ্ছে।

মেয়েটির প্রসাধন খুবই সাধারণ। অন্তত জিশানের তাই মনে হল।

ওর চোখে কাজলরেখা, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। আর পারফিউমের গন্ধ একটা নাকে আসছিল বটে, কিন্তু ওটা এমনই পালিয়ে বেড়ানো ঢঙের যে, কে মেখেছে জিশান বুঝে উঠতে পারছিল না।

মেয়েটির গায়ে হালকা নীল টপ আর গাঢ় নীল স্কার্ট। অনেকটা ইউনিফর্ম পরা স্কুলের মেয়ের মতো লাগছে।

একঘেয়ে ভঙ্গিতে জিশানকে আরও অনেক প্রশ্ন করল মেয়েটি। যেমন, বাড়ির ঠিকানা, বাবার নাম, মায়ের নাম, বিয়ে করেছে কি না, এরকম আরও অনেক কিছু।

ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে-দিতে জিশানের ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।

'কোনওরকম নেশা করেন—বা করতেন?'

'একসময় স্মোক করতাম—চারবছর হল ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'ওল্ড সিটির এয়ার পলিউশান কমানোর জন্যে।'

এই প্রথম জিশানের দিকে চোখ তুলে তাকাল মেয়েটি। চোখে একফালি হাসল।

তারপর মেয়েটি বলল, 'মিস্টার পালচৌধুরী, আপনাকে এবার একটা স্ট্যাটুইটারি ওয়ার্নিং শোনাচ্ছি : কিল গেম-এর সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর মাত্র 0.07। অর্থাৎ, পার্টিসিপ্যান্টদের শতকরা তিরানব্বই জনই মারা যায়। আপনি ইচ্ছে করলে এখনও নাম উইথড্র করতে পারেন।'

জিশান ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শ্রীধরের দিকে। শ্রীধরের মুখে সাপের মতো ঠান্ডা অভিব্যক্তি।

জিশানের মনে পড়ল : '...তিনশো দুই, নয়তো কিল গেম।'

তা ছাড়া মিলি আর শানুর ওপরে পিস ফোর্সের নজরদারি রয়েছে। ওদের ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে জিশানকে দিয়ে শ্রীধররা অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারেন। জিশানের কিছু করার নেই। অন্তত এখন।

জিশান মেয়েটিকে বলল, 'থ্যাংক য়ু ফর দ্য অ্যাডভাইস। আমি স্বেচ্ছায় নাম দিচ্ছি।'

'ও. কে.। তা হলে আমি আপনাকে রেজিস্ট্রেশান কিট দিচ্ছি। তার মধ্যে আপনি কিল গেম-এর রুল্‌স অ্যান্ড রেগুলেশান্‌স পাবেন। ফ্যাক এবং তার উত্তর পাবেন। মানে, ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক্‌ড কোয়েশ্চেন্‌স এবং তার আনসার। আপনার আগামী একমাসের ট্রেনিং শিডিউল পাবেন। গেম পার্টিসিপ্যান্ট্‌স ক্যাম্পাস— আমরা শর্টে বলি জিপিসি—সেখানে গেস্টহাউসে আপনার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে কিল গেম ছাড়াও অন্যান্য খেলার অনেক পার্টিসিপ্যান্ট রয়েছে। রেজিস্ট্রেশান কিটে সব ডিটেইল্‌স দেওয়া আছে।'

মেয়েটি একটা মোটা পলিথিনের প্যাকেট জিশানের দিকে বাড়িয়ে দিল। জিশান হাতে নিয়ে বুঝল প্যাকেটটা বেশ ভারী।

মেয়েটি এবারে একটা ফর্ম এগিয়ে দিল কাউন্টারের ওপরে। সঙ্গে একটা পেন।

জিশান ফর্মটা দেখল। ওর এইমাত্র দেওয়া তথ্যগুলো ফর্মে ছাপানো রয়েছে।

'এটায় আপনি সাইন করে দিন—দু-জায়গায়—এই যে, টিক দেওয়া আছে।'

জিশান পেনটা তুলে নিয়ে খসখস করে সই করে দিল।

ফর্মটা ফেরত নিয়ে মেয়েটি বলল, 'আপনার রেজিস্ট্রেশান কমপ্লিট, মিস্টার পালচৌধুরী। ফর ইয়োর ইনফরমেশান, জিপিসি গেস্টহাউস থেকে অন-লাইন নেটওয়ার্কে আপনি আমাদের টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স হেল্‌পলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার যে-কোনও প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে আমাদের হেল্‌পলাইন সবসময় অ্যাকটিভ থাকে।'

একটু থামল মেয়েটি। ওর কথাগুলো ঠিক মুখস্থ করা পরীক্ষার পড়ার মতো শোনাচ্ছিল। জিশানের ভয় হচ্ছিল, হঠাৎ করে মাঝপথে ওর মুখস্থ করা লাইনগুলো না গুলিয়ে যায়।

এইবার শ্রীধর পাট্টার দিকে কয়েকপলক তাকিয়ে মেয়েটি জিশানকে বলল, 'এরপর আপনার একটা বন্ড দেওয়ার ব্যাপার আছে—ইনডেমনিটি বন্ড। আর একটা রিস্‌ক ইনশিয়োরেন্স ফর্ম সাইন করতে হবে। নিউলাইফ ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির অথরাইজ্‌ড এজেন্ট সময়মতো আপনাকে দিয়ে ফর্ম ফিল-আপ করিয়ে নেবে। সমস্ত ইনফরমেশান আপনি ঘরে বসে অন-লাইনে পেয়ে যাবেন।'

জিশান ভাবল মেয়েটির কথা শেষ হয়ে গেছে। তাই ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াতে যাচ্ছিল। মেয়েটির ডাক শুনে ও থামল।

'মিস্টার পালচৌধুরী—।'

জিশান আবার ঘুরে দাঁড়াল কাউন্টারের দিকে।

মেয়েটি একটা বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল ইলেকট্রনিক ম্যাজিকের পাশে রাখা একটা লাল-সাদা বাক্স থেকে একটা ছোট কার্ড লাফিয়ে বেরিয়ে এল—অনেকটা পপ-আপ টোস্টারের মতো।

কার্ডটা জিশানের দিকে এগিয়ে দিল মেয়েটি। বলল, 'এটা রাখুন—এটা আপনার পার্সোনাল স্মার্ট কার্ড। জিপিসিতে থাকার সময় প্রতিটি স্টেপে এই কার্ডটা আপনার কাজে লাগবে। কার্ডটা হারাবেন না যেন...।'

জিশান কার্ডটা দেখল। ওর ফটো লাগানো ল্যামিনেট করা একটা সুদৃশ্য কার্ড। হঠাৎ দেখলে ক্রেডিট কার্ড বলে ভুল হতে পারে। কার্ডটায় একটা নম্বর লেখা আছে—জিশানের আই-ডি নম্বর। পি-2713444।

কিন্তু ওর ফটোটা ওরা পেল কোথায়?

তখনই জিশানের খেয়াল হল, এখন যে-জামাটা ও পরে রয়েছে, ফটোতে সেই জামারই ছবি। তার মানে, এই কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কোনও লুকোনো ক্যামেরা ওর ফটো তুলে নিয়েছে।

জিশান মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, 'আমি কি এবার যেতে পারি?'

'অফ কোর্স। অল দ্য বেস্ট, মিস্টার পালচৌধুরী...।'

অল দ্য বেস্ট।

তার মানে কী?

যে-মেয়েটি জানাচ্ছে, কিল গেম-এ সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর 0.07, সে-ই আবার বলছে, 'অল দ্য বেস্ট।' মেয়েটি কি জানে না, এই মরণখেলায় 'অল দ্য বেস্ট' হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা মাত্র সাত ভাগ।

নাকি এটাও স্ট্যাটুইটারি উইশ—ওই স্ট্যাটুইটারি ওয়ার্নিং-এর মতো?

জিশানের জিভ বিস্বাদ হয়ে গেল। একটা তেতো ভাব টের পেল ও। ওর রেজিস্ট্রেশান শেষ, স্মার্ট কার্ড পকেটে...অতএব এখন আর ফেরার কোনও পথ নেই।

শ্রীধর ইশারায় ওকে ডাকলেন।

চারজন গার্ড একইরকমভাবে দাঁড়িয়ে। আর মাটিতে যে পড়ে ছিল সে পড়েই আছে।

জিশানকে নিয়ে বেরোনোর সময় শ্রীধর শকারটা ছুড়ে দিলেন পড়ে থাকা লোকটার গায়ে। এবং একইসঙ্গে ডানপায়ে সপাটে এক লাথি কষিয়ে দিলেন লোকটাকে। চাপা গলায় বললেন, 'আরাম হারাম হ্যায়—।'

তারপর জিশানকে বললেন, 'চলো, বাবু, তোমাকে জিপিসিতে পৌঁছে দিই। তারপর আমার ছুটি। তুমি প্যাকেটের বইপত্তরগুলো ভালো করে স্টাডি করে নিয়ো। কাল থেকে শুরু হবে অ্যাকশান। তুমি তৈরি থেকো, বাবু...।'

শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে গলায় থুতুর দলা উঠে এল জিশানের। মনে হল, জঘন্য কাজ করার জন্য কিছু-কিছু জঘন্য লোকের জন্ম হয়।

●

জিমের নাম 'ডিজিটাল'।

কেন যে এরকম নাম জিশান প্রথমে বুঝতে পারেনি। সেটা ওকে বুঝিয়ে দিল মনোহর।

মনোহর সিং জিপিসিতে জিশানের সাতদিন আগে এসেছে। তাই ও এখানকার খোঁজখবর জিশানের চেয়ে বেশি জানে।

'ডিজিটাল' নাম লেখা জিমন্যাশিয়াম বিল্ডিংটা প্রায় তিনতলা উঁচু। গোটা জিমটা ঠান্ডা—এয়ারকন্ডিশনড। এই জিমে ব্যায়াম-ট্যায়াম কিছু হয় না। শুধু হয় কম্পিটিশান।

পার্টিসিপ্যান্টদের নিয়ে নানান রকমের কম্পিটিশানের ব্যবস্থা আছে এখানে। কম্পিটিশান না বলে সহজ কথায় লড়াই বলাই ভালো। আর সে-লড়াইয়ের উত্তর সবসময়েই ডিজিটাল—অর্থাৎ, বাইনারি ওয়ান আর জিরোর মতো—হয় জেতো, নয় হারো—মাঝামাঝি কিছু নেই। তবে এখানকার কর্মীরা এই লড়াইগুলোকে কখনও 'ফাইট' বলে না। বলে 'কম্পিটিশান' বা 'গেম'। এইসব গেম-এ প্রায়ই পার্টিসিপ্যান্টরা আহত হয়, বিকলাঙ্গ হয়, এমনকী মারাও যায়—কিন্তু তবুও এর নাম 'গেম'।

জিমে ঢুকে চারদিকে তাকালে একেবারে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই নানান যন্ত্রপাতি। তার সঙ্গে আধুনিক কন্ট্রোল প্যানেল। প্যানেলে কম্পিউটার মনিটর, রঙিন পুশবাটন আর ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প।

জিশান আর মনোহরকে নিয়ে মোট দশজন ঢুকেছে ডিজিটাল জিমে। ঢোকার সময় যে-যার পার্সোনাল স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করেছে। গেম শেষ হলে পর এখান থেকে নিজের পায়ে হেঁটে বেরোবে তিনজন। বাকি সাতজন বাতিল। কিল গেম-এর জন্য ওদের বলা হবে 'আনফিট'।

মনোহরের কাছে ব্যাপারটা শোনার পর জিশানের মনে আশা জেগেছিল। মানে, প্রাথমিক পরীক্ষায় হেরে গেলে পর আসল পরীক্ষায়—অর্থাৎ, কিল গেম-এ—আর বসতে হবে না।

এ-কথা মনোহরাকে বলতেই ওর কী হাসি! পেট চেপে ধরে হাসছে তো হাসছেই।

হাসি থামার পর মনোহর বলল, 'জিশান ভাইয়া, দুনিয়া এৎ সহজ নয়। তো হলে ডিজিসিটিতে গেস্টহাউসে কিল গেম-এর আমরা যারা রয়েছি তারা সবাই একে-একে হেরে যাওয়ার চেষ্টা করবে আর সাতদিনেই খাঁচা খালি হয়ে যাবে। যখন কম্পিটিশান চলে তখন সুপারগেমস্ কর্পোরেশনের কয়েকজন অবজার্ভার থাকে। ওরা গেমস্ কমিটিকে রিপোর্ট দেয়। যদি সেই রিপোর্টে কারও নামে এমন লেখা থাকে যে, সেই পাবলিক জেনুইন লড়েনি, তখন তাকে...।' কথা থামিয়ে মনোহর আচমকা জিশানকে প্রশ্ন করল, 'বলো দেখি, তাকে নিয়ে কী করে? বাতাও, কেয়া...?'

জিশান কিছু ভেবে উঠতে পারছিল না। ও ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি না। কী করে তাকে নিয়ে?'

হাসল মনোহর, বলল, 'তাকে ধরে হাংরি ডলফিন, ম্যানিম্যাল রেস—বা ওরকম কোনও ডেঞ্জারাস গেম-এ জোর করে নামিয়ে দেয়। ফারাক সিরফ দুটো ব্যাপারে : এই গেম-এ কোনও প্রাইজ মানি থাকে না, আর এই খেলার কোনও লাইভ টেলিকাস্ট হয় না। আভি সমঝে আপ?'

জিশান বুঝতে পারল—বেশ ভালো করেই বুঝতে পারল। ও মনোহরের ক্রোধহীন সরল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

গোলগাল মুখ। ভুরু দুটো খুব ঘন। মাথায় কদমছাঁট চুল। নাকটা অতিরিক্ত ছড়ানো। আর সামনের দাঁতে কালচে ছোপ।

হাসলে মনোহরাকে একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো দেখায়।

রেজিস্ট্রেশান কিটের ম্যানুয়াল আর বইপত্রগুলো এর মধ্যেই জিশান অনেকটা করে পড়ে ফেলেছে। সবরকমের পার্টিসিপ্যান্টের কথা মাথায় রেখে ম্যানুয়ালগুলো বাইলিঙ্গুয়াল—বাংলা আর ইংরেজিতে ছাপা। সেগুলো পড়ে অনেক নিয়মকানুনের কথা জেনেছে জিশান। তবে সেখানে মনোহরের কাছে শোনা এই বিচিত্র 'শাস্তি'-র কথা লেখা নেই। তার কারণ, ম্যানুয়ালগুলো আগাপাস্তলা অফিশিয়াল এবং আইনমাফিক লেখা।

ডিজিটাল জিমে ঢুকে জিশান আর মনোহররা একপাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিশাল মাপের জিমের নানান জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা সিকিওরিটি গার্ড, কোমরের বেল্টে ঝুলছে শকার।

জিশানদের সঙ্গে রয়েছেন একজন ইনস্ট্রাক্টর। তাঁর গায়ে লাল ইউনিফর্ম। কোমরে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা ল্যাপটপ কম্পিউটার, আর হাতে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের মতো একটা ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

খেলাটা জিশানদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ইনস্ট্রাক্টর বললেন, 'সবাই ওই স্ক্রিনটার দিকে তাকান। যে-গেমটা আমাদের খেলতে হবে তার সিমুলেশান ওই পরদায় আমি দেখাচ্ছি। আমার ল্যাপটপ থেকে পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে ওখানে প্রোজেক্ট করছি। আপনারা দয়া করে টোটাল অ্যাটেনশান দেবেন। রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি—স্টার্ট!'

জিমের একপাশে দাঁড় করানো একটা বড় সাদা পরদায় গেমটার সিমুলেশান শুরু হল।

রঙিন ছবিতে দেখা গেল একটা বিশাল জিম। জিমটার নাম 'ডিজিটাল'।

ক্যামেরা প্যান করে জিমের ভেতরে ঢুকল। সেখানে দশজন খেলোয়াড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের সকলের চেহারা একইরকম—ভিডিয়োগেমের ছবি যেমন হয়। আর তাদের প্রত্যেকের গায়ে একইরকম পোশাক—জিশানরা এখন যেমন পরে রয়েছে।

হলদে রঙের স্পোর্টস টি-শার্ট। বুকের ওপরে সুপারগেমস কর্পোরেশনের লোগো ছাপা। আর তার ঠিক নীচেই একটা বার কোড। এই কোড লেজার স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করলেই প্রতিযোগীর নানান প্রয়োজনীয় তথ্য ফুটে উঠবে স্ক্যানারে লাগানো কম্পিউটারে।

জিশানদের গায়ে হলদে টি-শার্টের সঙ্গে রয়েছে কালো রঙের বারমুডা প্যান্ট। প্যান্টের একপাশে সুপারগেমস কর্পোরেশনের লোগো। তার নীচে আবার সেই বার কোড।

এ ছাড়া প্রত্যেকেরই পায়ে স্পোর্টস শু। আর জুতোর সোলের একপাশে লাগানো রয়েছে বার কোডের স্টিকার।

ওরা দশজন পরদার সিমুলেশানটা হাঁ করে গিলছিল। সিনেমা শেষ হলেই ওদের সত্যি-সত্যি সেরকম করতে হবে।

জিশানের বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ছিল। ও মনে-প্রাণে চাইছিল, ওকে যেন মনোহরের মুখোমুখি না পড়তে হয়। জিপিসিতে এসে দু-দিন কাটিয়েই মনোহরকে ওর পছন্দ হয়ে গেছে।

মনোহর সংসারে একা। তিনকুলে ওর কেউ নেই। সেই যে কোন ছোটবেলায় ওর বাবা-মা ওকে রাস্তায় ফেলে পিঠটান দিয়েছে। তারপর থেকে ও রাস্তায়-রাস্তায় মানুষ। একটা সময়ে ঠেলাগাড়ি আর সাইকেল ভ্যান চালাত। তারপর ট্রেনের টিকিট ব্ল্যাক করত। এইভাবে বহুবার পেশা বদলে শেষ পর্যন্ত ফুটপাতে রেডিমেড জামাকাপড়ের ব্যাবসা করছিল। তখনই ও পিস ফোর্সের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে।

একদিন রাতে বৃষ্টির মধ্যে ও যখন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে হেঁটে আসছিল, তখন হঠাৎই দ্যাখে গিরিশ পার্কের কাছে রাস্তার ধার ঘেঁষে একটা

ওটার দাঁড় করানো। আর পিস ফোর্সের দুটো গার্ড একটা মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করছে।

খানাখন্দ ভরা বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় লোকজন যে একেবারেই ছিল না এমন নয়। কিন্তু যারা ছিল তারা কোনও ঝামেলায় নাক গলাতে চায়নি। ওল্ড সিটিতে এটাই শান্তির স্টাইল। নিজের ঠিকঠাক বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি।

কিন্তু মনোহর ছোটবেলা থেকেই বেপরোয়া। এমনভাবে ও জীবন কাটিয়েছে যে, ওর পক্ষে ওল্ড সিটির সিটিজেনদের নির্লিপ্ত ঢঙের সঙ্গে লাগসই হয়ে যাওয়াটা মুশকিল।

তাই মনোহর গিয়ে পিস ফোর্সের দুই মস্তানের মুখোমুখি হয়েছে। এবং কোনও কথা না বলেই এক ঘুষিতে একটাকে রাস্তায় পেড়ে ফেলেছে। সেই ফাঁকে দ্বিতীয় গার্ডটা অটোমেটিক পিস্তলের বাঁট বসিয়ে দিয়েছে মনোহর সিং-এর মাথায়।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার ঠিক আগে মনোহর ঝাপসাভাবে দেখতে পেয়েছিল মেয়েটা ছুটে পালাচ্ছে।

অদ্ভুত এক তৃপ্তিতে মনোহরের মন ভরে গিয়েছিল এবং ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

তারপরই ওকে নিয়ে আসা হয়েছে সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টারে।

মনোহর মাঝে-মাঝেই এক-দু-কলি গান গেয়ে ওঠে আর জিশানকে বলে নিজের লক্ষ্যহীন জীবনের কথা।

'জিশান ভাইয়া, না কোই আগে, না কোই পিছে / উপর আসমা, ধরতী নীচে। তাই লাইফে আমার কোনও পিছুটান নেই। ব্যস, গুজরনা হ্যায়। এখানে এসে আমার ভালোই লাগছে...আগে জো হোগা ও রাম জানে।'

দম বন্ধ করে খেলাটা দেখছিল জিশান।

জিমের ঠিক মাঝখানে অনেক উঁচুতে একটা লম্বা লোহার রড—জিমের একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে চলে গেছে। সেই রড থেকে সার বেঁধে ঝুলছে একজোড়া করে লোহার শিকল। একজোড়া শিকল থেকে পরের জোড়া শিকলের দূরত্ব পনেরো কি ষোলো ফুট।

শিকলগুলো নেমে এসেছে অনেক নীচে, তবে জিমের ফ্লোর থেকে ফুটদশেক ওপরে শেষ হয়ে গেছে। প্রতিটি শিকলে দশফুট দূরত্বে একটা করে লোহার চাকা লাগানো—অনেকটা গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের মতো। ফলে শিকল ধরে এই চাকায় দু-পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়ানো যায়।

খেলার শুরুতে একজোড়া শিকলের দুটো প্রান্তকে একটা অদ্ভুত যন্ত্র দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হল বিপরীত দিকে—একেবারে জিমের সিলিং-এর উচ্চতায়। তারপর একটা অটো-এলিভেটর দুই প্রতিযোগীকে তুলে দিল বিপরীত দিকের দুটো প্ল্যাটফর্মে—শিকলের প্রান্তের একেবারে কাছে। তারা শিকলের প্রান্ত ধরে

বসে রইল সেখানে।

এইরকমভাবে পাঁচজোড়া শিকল নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে তৈরি হল পাঁচজোড়া খিলাড়ি।

তারপর জিমের উত্তরদিকের দেওয়ালে লটকানো প্রকাণ্ড মাপের একটা এলইডি ডট ম্যাট্রিক্স স্ক্রিনে শুরু হল কাউন্ট ডাউন : টেন, নাইন, এইট,...থ্রি, টু, ওয়ান, জিরো।

কাউন্ট ডাউন শেষ হতে-না হতেই খেলা শুরু।

মুখোমুখি প্ল্যাটফর্মে বসা প্রতিযোগী দুজন ঝাঁপিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্ম থেকে। টারজানের মতো শূন্যে দোল খেয়ে তারা উল্কার মতো ধেয়ে এল পরস্পরের দিকে। জিমের মাঝামাঝি জায়গায় এসে ওদের মারাত্মক সংঘর্ষ হল।

তারপর চলতে লাগল দাঁত-নখ লড়াই।

আচমকা পরদায় প্রোজেকশান বন্ধ করে দিলেন ইনস্ট্রাক্টর। বললেন, 'সবাই নিশ্চয়ই খেলাটা বুঝতে পেরেছেন?'

জিশান লক্ষ করল, ইনস্ট্রাক্টরের জামায় বোতামের কাছে মউমাছির মতো ছোট্ট ক্লিপ-অন্ মাইক্রোফোন লাগানো। লুকোনো কোনও সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে জিশানরা ওঁর কথা স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিল।

'তাড়াতাড়ি বলুন, খেলাটা আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন কি না—!'

জিশানরা সকলেই হাতের ইশারায় জানাল, হ্যাঁ, ওরা বুঝতে পেরেছে।

'...খেলাটায় নিয়ম বলে কিছু নেই। শিকল ধরে প্ল্যাটফর্ম থেকে ঝাঁপ দেওয়ার পর আপনারা যে যেমনভাবে খুশি লড়াই করতে পারেন। যদি কেউ শিকল শক্ত করে ধরে রাখতে না পেরে নীচে পড়ে যান তা হলে ডিসকোয়ালিফায়েড হওয়ার কোনও ভয় নেই। অটো-এলিভেটরের হেল্প নিয়ে আপনারা আবার শিকল ধরে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসবেন—ঝাঁপ দেবেন।' ইনস্ট্রাক্টর ওদের দশজনকে একে-একে দেখলেন। তারপর হেসে বললেন, 'এই খেলাটায় সুবিধে হচ্ছে, এর কোনও টাইম লিমিট নেই। টেক ইয়োর ওন টাইম টু ফিক্স ইয়োর অপোনেন্ট।'

দুঃখে হাসি পেয়ে গেল জিশানের। কোনও টাইম লিমিট নেই। শিকলে ঝুলতে-ঝুলতে পশুর মতো লড়ে যাও প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। শিকলে [illegible] খাও, মাথা ফাটাও—নিজের অথবা অন্যের। শিকল থেকে পড়ে গেলেও কোনও অসুবিধে নেই। তখন আবার প্ল্যাটফর্মে চড়ে বসতে হবে। নতুন করে শুরু করতে হবে লড়াই। যদি অবশ্য জিমের মেঝেতে পড়ে গিয়ে শরীরটা আস্ত থাকে।

মোদ্দা কথা হল, ডিজিটাল রেজাল্ট : এক অথবা শূন্য, জয় অথবা পরাজয়। আর এত সত্ত্বেও এর নাম খেলা—গেম!

'ও.কে.। টেক ইয়োর পজিশন। যার-যার জায়গামতো দাঁড়িয়ে যান আপনারা। এদিকে পাঁচজন, আর ওদিকে পাঁচজন। কুইক—উঠে পড়ুন অটো-

এলিভেটরে।

জিমের যন্ত্রগুলো যন্ত্রের মতোই কাজ করতে লাগল। জিশান অনেক হিসেব করে এমনভাবে একদিকে গিয়ে দাঁড়াল যাতে ওকে মনোহর সিং-এর মুখোমুখি না পড়তে হয়।

ও খেয়াল করল, মনোহরও বোধহয় একই চিন্তা করে জিশানের সঙ্গে এলিভেটরের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জিশানের সঙ্গে মনোহরের চোখাচোখি হল। মনোহর হেসে চোখ মারল জিশানকে। তারপর 'দেখি, নসিবে কী আছে!' গোছের ভাব করে হাত আর ঠোঁট ওলটাল।

অটো-এলিভেটর জিশানদের তুলে দিল প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরের প্ল্যাটফর্মে। তারপর অদ্ভুত একটা যন্ত্র শিকলের প্রান্তগুলো ওপরে তুলে পৌঁছে দিল জিশানদের হাতের কাছে।

ইনস্ট্রাক্টরের সিগন্যালের সঙ্গে-সঙ্গে ডিজিটাল কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেল।

জিশান তাকাল বিপরীতদিকের মাচায় বসা ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে।

ছেলেটার নাম শিবপদ। শিকলের প্রান্তটা ধরে লাফ দেওয়ার জন্য ওত পেতে বসে আছে। দূরত্বটা অনেক বেশি হওয়ার জন্য স্পষ্ট করে ওকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আগে শিবপদকে লক্ষ করেছে জিশান। বেশ লম্বা, ফরসা, গাল তোলা, কবজি দুটো শিরা-ওঠা—চওড়া. ঘন-ঘন চোখের পাতা ফ্যালে। আর গলায় একটা রুপোর চেন

জিপিসিতে এসে থেকে জিশানরা রোজ নিয়মমাফিক ব্যায়াম করে। রোজকার সেই ওয়ার্কআউটের সময় জিশান লক্ষ করেছে, শিবপদ সবসময় চুপচাপ থাকে।

ওর সঙ্গে একবার আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল জিশান। ব্যায়াম করার ফাঁকে ওর কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'আমার নাম জিশান...।'

ছেলেটা তখন পাওয়ার সিস্টারে কাজ করছিল। যন্ত্রটায় হ্যাঁচকা মারা থামিয়ে ও চোখ পিটপিট করে তাকিয়েছিল জিশানের দিকে। তারপর থতিয়ে বলেছিল, 'আমি শিবপদ...আলাপ করে কী লাভ। বরং ঝামেলা বাড়বে।'

'ঝামেলা। কীসের ঝামেলা?' জিশান ওর কথাটা বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করেছিল।

তোয়ালে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে শিবপদ বলেছিল, 'আজ নয় কাল তো মুখোমুখি লড়াইয়ে নামতে হবে। বেশি আলাপ হয়ে গেলে তখন লড়তে প্রবলেম হবে।'

স্পষ্ট বিদায়ের ইঙ্গিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও হাল ছাড়েনি জিশান। শিবপদর চোখদুটোকে বড় করুণ বলে মনে হয়েছিল ওর। তাই আবার প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি এখানে কেমন করে এলে?'

'বলব না।' সরাসরি আপত্তি করেছিল শিবপদ, 'দয়া করে নিজের জায়গায় যাও...মন দিয়ে ওয়ার্কআউট করো...শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার চেষ্টা করো।'

কথা শেষ করে শিবপদ আবার ব্যায়ামে মন দিয়েছিল। পাওয়ার বিল্ডারের রড ধরে দ্রুত ছন্দে হাপর টানার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

জিশানের যে কী জেদ চেপে গিয়েছিল!

ও নাছোড়বান্দার মতো জানতে চেয়েছিল, 'বাড়িতে কে-কে আছে তোমার?'

'বলব না!'

তারপর জিশানের প্রশ্নবাণের হাত থেকে বাঁচার জন্য চেঁচিয়ে একজন ইনস্ট্রাক্টরকে ডেকেছিল, 'স্যার, আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন...।'

জিশান আর দাঁড়ায়নি। সরে এসেছিল শিবপদর কাছ থেকে।

এখন শিবপদকে দেখে জিশানের মনে হল, ও ঠিকই বলেছিল : বেশি আলাপ হয়ে গেলে লড়তে প্রবলেম হবে।

ডিজিটাল কাউন্ট ডাউন খুব তাড়াতাড়ি শূন্যের দিকে ছুটছিল।

জিমের টঙে বসে জিশান দেখল, মাথায় কালো টুপি আর সাদা ট্র্যাক-সুট পরা তিনজন লোক ঢুকে পড়েছে জিমে। ওদের ভুঁড়ির কাছে ঝোলানো ল্যাপটপ কম্পিউটার। আর ট্র্যাক সুটের বুকের কাছটায় লাল হরফে লেখা 'OBSERVER'।

কাউন্ট ডাউন শূন্যে পৌঁছল এবং জিশান শূন্যে ঝাঁপ দিল।

সত্যিই ব্যাপারটা গাছের শিকড় ধরে টারজানের লাফ দেওয়ার মতো।

শোঁ-শোঁ করে বাতাস কেটে দীর্ঘ ব্যাসার্ধের বৃত্তচাপ এঁকে ভেসে চলল জিশান। যতই ও নীচে নামছিল ততই ওর গতি বাড়ছিল।

এ যেন ঠিক রূপকথার গল্পের মতো। জাদুকার্পেট কিংবা রূপকথার ঢেঁকিতে চড়ে আকাশে ভেসে বেড়ানো। অথবা পরিদের মতো পিঠে ডানা গজিয়ে যাওয়া।

নিজেকে রূপকথার গল্পের নায়ক ভাবছিল জিশান। আরামে ওর চোখ বুজে আসতে চাইছিল।

হঠাৎই ও দেখল, আয়নার প্রতিবিম্বের মতো বিপরীত দিক থেকে আর-একটা জিশান সমান গতিতে, সমান তালে, ছুটে আসছে ওর দিকে।

প্রতিবিম্বটা খুব কাছে আসতেই জিশান বুঝতে পারল ছায়াটা শিবপদর মতো দেখতে।

এই উপলব্ধির প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সংঘর্ষটা হল।

জিমের ভেতরে পৃথিবীর অভিকর্ষের কোনও রকমফের নেই। তাই আরও চারজোড়া প্রতিযোগী একইরকম বেগে নেমে এসে একই মুহূর্তে সংঘর্ষ ঘটিয়েছে।

লোহার সঙ্গে লোহার টক্করে আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরোল। ঝনঝন শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল জিমের ভেতরে। সংঘর্ষের শব্দে জিশানের কানে তালা লেগে গেল।

সংঘর্ষ শুধু লোহার-লোহায় হয়নি, শরীরের সঙ্গে শরীরেরও হয়েছে। তবে সেই ভোঁতা শব্দগুলো লোহার সংঘর্ষের তীব্র শব্দে চাপা পড়ে গেছে।

শব্দের অনুভূতির পরই জিশান টের পেল ব্যথার অনুভূতি। ওর বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল অসংখ্য হলদে ফুল।

কারণ, শিবপদর কাঁধের সঙ্গে ওর মাথার সংঘর্ষ হয়েছে।

ধাক্কা লাগার পরই জিশান আর শিবপদর শরীরটা লাট্টুর মতো পাক খেতে শুরু করেছে। সেই অবস্থায় দুলতে-দুলতে ওরা ছিটকে সরে গেছে দূরে—কিন্তু আবার ছুটে আসছে কাছে। কারণ, অভিকর্ষের নিয়মের হাত থেকে কারও রেহাই নেই।

জিশানের মাথা ঘুরছিল। ঝিমঝিম করছিল। মনে হচ্ছিল, মাথাটা প্রকাণ্ড এক উলের বল। এক্ষুনি বোধহয় হাওয়ায় ভেসে উড়ে যাবে ওপরে।

সেই অবস্থাতেই জিশান চেন ধরে খানিকটা ওপরে উঠে যেতে চাইল, যাতে ওপর থেকে শিবপদকে লাথি মারার সুযোগটা পায়।

শিবপদর শরীরটা তখনও লাট খাচ্ছিল। ওই লাট খাওয়া অবস্থাতেই শিবপদ ভেসে আসছিল জিশানের দিকে।

পায়ের নাগালে ওর শরীরটা আসতেই জিশান জোড়া পা চালাল।

জিশানের স্পোর্টস শু-র ডানপাটিটা ধাক্কা খেল শিবপদর কোমরে। আর বাঁ-পা-টা গিয়ে লাগল শিকলের লোহায়।

বাঁ-পায়ের গোড়ালি থেকে মাথা পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠল। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী জিশান ছিটকে গেল দূরে। যন্ত্রণায় চোখ বুজে ফেলল।

তখনই মিনিকে দেখতে পেল জিশান। একরাশ হলদে ফুলের মধ্যে মিনির মুখটা টলটল করছে।

আরও ভালো করে দেখার চেষ্টায় ও চোখ ছোট করে সামনে ঝুঁকে পড়ল।

তখন দেখতে পেল মিনির কোলে ছোট্ট শানু হাত-পা ছুড়ছে।

জিশান একগাল হেসে শানুকে কোলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঘুষি এসে আছড়ে পড়ল জিশানের চোয়ালে।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল জিশান। মনে হল ওর চোয়ালটা বেঁকে গেছে।

অনেক চেষ্টা করে চোখ খুলতে পারল ও। দৃষ্টি ঝাপসা। শুধু কানে আসছে

লোহার ঠনঠন শব্দ আর টুকরো-টুকরো চিৎকার।

আশেপাশে ঝুলন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের তীব্র লড়াই চলছে।

জিশান হাঁপাতে লাগল। যে-করে-হোক মিনি আর শানুর কাছে ওকে ফিরতে হবে—ফিরতেই হবে।

জিশান টের পেল, ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

নাকের ফুটো থেকে বেরিয়ে গোঁফের ওপর, তারপর ঠোঁটে, তারপর থুতনির দিকে।

জিভ বের করে ঠোঁট চাটল। এতদিনের শোনা কথাটা সত্যি প্রমাণ হল : রক্তের স্বাদ নোনা।

চোখের পলকে কী একটা হয়ে গেল জিশানের ভেতরে। শিবপদ হঠাৎই যেন কার্তিক হয়ে গেল।

ডানহাত ওপরে তুলে শিকলটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছিল জিশান। তার ঠিক ওপরেই ছিল গাড়ির স্টিয়ারিং-এর মতো একটা লোহার চাকতি। শিবপদর মাথাটা যে চাকতি বরাবর সেটা জিশান খেয়াল করল। সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ-হাতে শিবপদর গেঞ্জি খামচে ধরল জিশান। আর প্রবল শক্তিতে ডানহাত চালিয়ে লোহার চাকাটা ভয়ংকরভাবে ঠুকে দিল শিবপদর মাথায়।

কিছু একটা ফেটে যাওয়ার শব্দ হল। শিবপদর মাথার একপাশটা হাঁ হয়ে গেল। ঠিক যেন স্টেজের কালো পরদা সরে গিয়ে ভেতরের কুশীলবদের দেখা গেল। ওরা সবাই লাল পোশাক পরে রয়েছে।

শিবপদর চোখ উলটে গেল। শিকল থেকে ওর হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল। ওর লম্বা দেহটা চিত হয়ে নীচে পড়তে লাগল।

জিশানের মনে হল, ও স্লো মোশানে কোনও সিনেমা দেখছে।

অবলম্বনহীন শিবপদ শূন্যে হাত-পা ছড়িয়ে নীচে পড়ছে-তো-পড়ছেই।

যেখানে ওদের লড়াই চলছিল সেখান থেকে মেঝেটা প্রায় বিশ ফুট নীচে। অভিকর্ষের টানে সেই দূরত্ব পেরোতে শিবপদর যেন একশো বছর লাগল। তারপর ওর ভারী দেহটা আছড়ে পড়ল জিমের মেঝেতে। পড়ে খানিকটা লাফিয়ে উঠল। আবার পড়ল। মাথাটা এপাশ-ওপাশ খানিকটা নড়ল। তারপর সব শেষ।

জিশানের মুখ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। ওর নিজের শুনে মনে হল, চিৎকারটা ওর মুখ থেকে বেরোয়নি—বেরিয়েছে কোনও জন্তুর মুখ থেকে।

জিশান ভেবে অবাক হল যে, আওয়াজটার কোনও সঠিক চরিত্র নেই। ওটা দুঃখের, হতাশার, নাকি জয়ের জিগির—জিশান কিছুই বুঝতে পারল না।

ও ঘামছিল, হাঁপাচ্ছিল। তাকিয়ে ছিল নীচে পড়ে থাকা শিবপদর শরীরটার দিকে।

ওর হলদে গেঞ্জিতে লালের ছোপগুলোকে বাটিকের প্রিন্ট বলে মনে হচ্ছে।

ছেলেটার দু-চোখ বন্ধ—মনে হচ্ছে যেন অদ্ভুতভাবে হাত-পা ছড়িয়ে হঠাৎই ঘুমিয়ে পড়েছে।

জিশান কেঁদে ফেলল। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল ওর। কিল গেম-এর দিকে ও ধাপে-ধাপে এগিয়ে গেছে। একইসঙ্গে মানুষ থেকে পশুর দিকেও।

এইভাবে ধাপে-ধাপে ও কিল গেম-এর জন্য তৈরি হবে, আর ধাপে-ধাপে হিংস্র পশু হয়ে উঠবে। হায় ভগবান।

জিশান কাঁদতে-কাঁদতেই শিকল বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল। আশেপাশে তখনও ঝনঝনাৎ শব্দ উঠছে, শোনা যাচ্ছে হিংস্র চিৎকার। লড়াই চলছে পুরোদমে।

শিকলের শেষ প্রান্তে এসে লাফ দিল জিশান। এসে পড়ল শিবপদর পাশে।

এমনসময় ভারী অথচ ভোঁতা একটা শব্দ জিশানের কানে এল। ও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

দূরের একটা শিকল থেকে খসে পড়েছে একজন প্রতিযোগী। তার প্রতিদ্বন্দ্বী তখন শিকল ধরে ঝুলছে। বিজয়ের উল্লাসে চিৎকার করে এক হাত ছুড়ে দিচ্ছে শূন্যে।

আরও একজনের ভাগ্যরেখা গন্তব্যে পৌঁছে গেল। বিষণ্ণভাবে ভাবল জিশান। তারপর শিবপদর দেহের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, 'শিবপদ! শিবপদ!'

কোনও সাড়া নেই।

'শিবপদ।' কান্না-ভাঙা গলায় আবার ডাকল জিশান।

তখনই শিবপদর গলা থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। ওর মাথাটা নড়ে উঠল।

জিশান আরও ঝুঁকে পড়ল শিবপদর ওপরে। দু-হাত দু-গালে চেপে ওর রক্তাক্ত মুখটাকে সোজা করে ধরল। শিবপদকে কি এখন মানিকের মতো দেখাচ্ছে?

নিয়তির এ কী অদ্ভুত মায়া! একই মানুষ—কখনও সে কার্তিক, কখনও মানিক।

জিশানের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ও মমতা ভরা গলায় ডাকল, 'শিবপদ! শুনছ?'

শিবপদর বোজা চোখ সামান্য ফাঁক হল। ধ্যানমগ্ন শিবের মতো দেখাচ্ছিল ওকে।

জিশান আবার ডাকল।

শিবপদ এবার বিড়বিড় করে কথা বলল।

'আমার বাড়ি বরানগরে...একচালা ঘরে...থাকতাম।' হাঁ করে কয়েকবার দম নিল শিবপদ। ওর বুকটা ওঠা-নামা করল। তারপর জিশানকে খামচে ধরল।

জিশান দেখল, ওর চোখ আরও খুলে গেছে, কিন্তু চোখের উজ্জ্বল ভাব কমে গিয়ে ঘোলাটে হয়ে গেছে। শিবপদ ঠিক যে কোনদিকে তাকিয়ে আছে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

'জি-জিশান...আমার ছোট বোন আছে...ভাই আছে...মা আছে... আর...আর হাঁ-করা অভাব আছে। দু-বেলা খাবার জুটত না আমাদের...।'

কথা বলতে-বলতে শিবপদ যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছিল। কে জানে, ওপর থেকে পড়ে গিয়ে ওর হাড়গোড় কতটা ভেঙেছে!

জিশান ওর কপালে হাত বোলাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কপালের একপাশটা রক্তে মাখামাখি—ভালো করে হাত বোলানো যাচ্ছে না। কান্নার দমক উথলে উঠল জিশানের বুকের ভেতর থেকে। এই রক্তাক্ত কপাল জিশানের দান। নিজের প্রতি ঘেন্নায় বমির ওয়াক উঠতে চাইল। দেখল, শিবপদকে ঘিরে কয়েকটা মাছি উড়ছে, রক্তের ওপরে বসছে—আবার উড়ে এসে বসছে জিশানের গায়ে।

শিবপদ ঘোলাটে চোখে জিশানকে ফোকাস করতে চাইল। বলল, 'কেঁদো না...এ তো হতই...হয় তুমি...নয় আমি...।' আবার দম নেওয়ার জন্য থামল শিবপদ। বড়-বড় শ্বাস টেনে বলল, 'একদিন...একদিন দেখি...স্টেশানে...আমার ভাই আর বোন ভিক্ষে করছে। আমাকে দেখেই...দে ছুট...।'

'আর কথা বোলো না। চুপ করো। আমি ওদের ডাক্তার ডাকতে বলছি—।'

'না! ডাক্তার ডাকতে হবে না। ডাক এসে গেছে—।' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল শিবপদ। খামচে ধরল জিশানের কোমর।

জিশানের ব্যথা করছিল। ও মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। দেখল, একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সিকিওরিটি গার্ড।

জিশান চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে, শুনছেন। একজন ডাক্তার ডাকুন—একে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন!'

পিস ফোর্সের গার্ডটি জিশানের দিকে একবার দেখল। তারপর আবার ঘাড় ঘুরিয়ে রোবটের ঢঙে দাঁড়িয়ে রইল।

শিবপদ আবার কথা বলল।

'সেইদিন...সেইদিন ঠিক করলাম...কিছু একটা আমাকে...আমাকে... করতে হবে। তাই...তাই...কিল গেম...একশো কোটি টাকা...!' এইবার কেঁদে ফেলল শিবপদ। কয়েকবার হেঁচকি তুলল। তারপর আস্তে নিচু পরদায় বলল, 'আমার... আমার গলার...চেনটা...মাকে দিয়ো। ওদের...ওদের আর কেউ রইল না...রইল না।'

জিশান বলতে পারল না, 'আমি তো আছি!' কারণ, ও জানে না শেষ পর্যন্ত ও থাকবে কি না। ও হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর চেষ্টা করল।

শিবপদ কথা বলতে-বলতে ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছিল। হঠাৎই ও মরণ খিঁচুনিতে জিশানকে আঁকড়ে ধরল।

জিশান আকুল হয়ে ওর নাম ধরে বারবার ডাকতে লাগল।

কিন্তু কোনও সাড়া নেই। ঘোলাটে চোখ তাকিয়ে আছে জিমের সিলিং-এর দিকে।

জিশান শিবপদকে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল। লক্ষ করল, শিবপদর চোখের পাতা পড়ছে না। আর ঠিক তখনই একটা মাছি গিয়ে বসল শিবপদর খোলা চোখের ওপরে।

এবারেও শিবপদর চোখের পাতা পড়ল না।

বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে ফেলল জিশান। শিবপদর ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওর গলার চেনটা খুলে নিল। জিশান ওর বাড়ি চেনে না। তা হলে কী করে ওর মাকে গিয়ে চেনটা দেবে? কিন্তু তবুও এটা থাক ওর কাছে। স্মৃতি হিসেবে।

শিবপদকে ছেড়ে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। ঝাপসা চোখে দেখল, শূন্য শিকলগুলো ঝুলছে। তার মধ্যে কয়েকটা তখনও পেন্ডুলামের মতো অলসভাবে দুলছে। তিনজন প্রতিযোগী জিমের মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আর বাকি পাঁচজন জিমের একপাশে ইনস্ট্রাক্টরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে মনোহরও রয়েছে। জিশানের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ও বোঝাতে চাইল, ও জিতেছে।

অবজার্ভার তিনজন এখন একজায়গায় জড়ো হয়ে নিজেদের ল্যাপটপের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করছিল। এ-ওর কম্পিউটারের পরদায় উঁকি মারছিল।

জিশান হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল, প্যান্টে হাত ঘষে হাতের রক্ত মুছল। তারপর চেনটা পকেটে গুঁজে শ্রান্ত পা ফেলে এগোল মনোহরদের দিকে।

যেতে-যেতে শিবপদর মৃতদেহের দিকে একবার ফিরে তাকাল জিশান। শিবপদর ছোট বোন আর ছোট ভাইটার কথা একঝলক মনে পড়ল। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। শিবপদ ঠিকই বলেছিল, জিপিসিতে এসে আলাপ করলেই ঝামেলা বাড়বে। কারও সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাই পাপ।

এমনসময় স্পিকারে ইনস্ট্রাক্টরের গলা শোনা গেল।

কারা-কারা এই ডিজিটাল কম্পিটিশানে কোয়ালিফাই করেছে তাদের নাম শোনা গেল।

প্রথমেই জিশান পালচৌধুরী, তারপর মনোহর সিং—আর সবশেষে রণজিৎ পাত্র।

নাম ঘোষণার পর ওদের তিনজনকে একপাশে লাইন করে দাঁড়াতে বলা হল। তখন জিশান রণজিৎকে ভালো করে দেখল।

কালো দশাসই চেহারা। মোটা গোঁফ। সবকিছুতেই গলা ফাটিয়ে হা-হা

করে হাসে। মাথায় চুল কম। মাঝখানটায় তো রীতিমতো টাক পড়ে গেছে।

ব্যায়াম করার সময় জিশানের সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছে। ওর মুখে সবসময় একটা ভাচ্ছিল্যের ভাব। তা ছাড়া ব্যায়ামের যন্ত্রের একটু-আধটু দখল নিয়ে এর তার সঙ্গে ঝগড়া আর খিচখিচ করছিল।

ছেলেটাকে দেখে জিশানের কেন জানি না ভালো লাগেনি। তাই আলাপ বেশি দূর গড়ায়নি ও।

ওরা তিনজন একপাশে লাইন করে দাঁড়াতেই বাকি তিনজন ঈর্ষার চোখে ওদের দেখতে লাগল।

স্পিকারে ইনস্ট্রাক্টরের নির্দেশ শোনা গেল।

'গার্ড্স, যারা উন্ডেড কিংবা ফিনিশ্ড তাদের বডি সরিয়ে ফ্যালো—কুইক।'

সঙ্গে-সঙ্গে রোবট গার্ডগুলো নড়েচড়ে উঠল। যান্ত্রিক দক্ষতায় কাজ শুরু করল।

জিমের শেষ প্রান্তের দেওয়ালে সার বেঁধে অনেকগুলো ফর্ক লিফ্ট দাঁড়িয়ে ছিল। একজন গার্ড পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ফোন করতেই চারটে ফর্ক লিফ্ট গড়গড় করে এগিয়ে এল। ওদের সামনের চাকার ঠিক ওপরে দুটো লম্বা স্টিলের পাত চামচের মতো সামনে বাড়ানো। চারজন ফর্ক লিফ্ট অপারেটর দারুণ দক্ষতার সঙ্গে মেঝেতে পড়ে থাকা দেহগুলো চটপট তুলে নিল স্টিলের পাতের ওপরে। তারপর চারটে যন্ত্র সার বেঁধে বেরিয়ে গেল জিম থেকে। দুজন গার্ড তার পিছন-পিছন দৌড়ল।

একমিনিটেরও কম সময়ে দেহ এবং মৃতদেহ—সবই সরিয়ে ফেলল ওরা।

তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ছোট গুড খোলা সাদা গাড়ি ঢুকে পড়ল জিমে। গাড়িটার গায়ে বড় হরফে একটা লাল রঙের যোগচিহ্ন আঁকা। তার নীচে ছোট করে লেখা 'মেডিকেল ইউনিট'।

সাদা গাড়ি থেকে নেমে এল দুজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ওদের হাতে ডাক্তারি বাক্স। ওরা চটপট জিশান, মনোহর আর রণজিতের প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করল।

পাঁচ কি সাতমিনিট—তার মধ্যেই ওদের কাজ শেষ। তারপর ওরা নির্বিকার ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল জিম থেকে।

জিশানের হঠাৎই খেয়াল হল, মেডিকেল ইউনিটের কেউই কারও সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

ইনস্ট্রাক্টর এবার একটা কম্পিউটার প্রিন্টআউট দেখে বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেশান্স, জিশান। কনগ্র্যাচুলেশান্স, মনোহর। কনগ্র্যাচুলেশান্স, রণজিৎ। আপনারা কিল গেম-এর কোয়ালিফাইং রাউন্ডের প্রথম খেলায় কোয়ালিফাই

করলেন। এই প্রিলি রাউন্ডের প্রথমটায় কোয়ালিফাই করার জন্যে আপনাদের প্রত্যেককে সুপারনোভাস কর্পোরেশন দেবে তিরিশ হাজার টাকা। আপনারা এখন গেস্টহাউসে ফিরে যাবেন। আপনাদের যা ডেইলি রুটিন সেটাই কনটিনিউ করবেন। সেকেন্ড রাউন্ডের গেম যখন শিডিউলড হবে তখন আপনাদের সব ডিটেইলস অন-লাইনে জানিয়ে দেওয়া হবে। এনি কোয়েশ্চেনস?'

কথা শেষ করে প্রশ্ন করলেন ইনস্ট্রাক্টর।

জিশানরা সবাই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল : না, ওদের কোনও প্রশ্ন নেই।

'ও.কে., থ্যাংক য়ু ফর ইয়োর পার্টিসিপেশান। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট!'

আবার উইশ! এটাকে উইশ না বলে ডেথউইশ বলাই ভালো। ভাবল জিশান।

●

জিশানের মাইক্রোভিডিয়োফোনের ছোট রঙিন পরদায় মিনির ছবি ভেসে উঠতেই বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসল ও।

মিনি 'হ্যালো' বলতেই জিশানের বুকের ভেতরে খুশির বাজনা বেজে উঠল। ও ফোনটা পরম আদরে গালে চেপে ধরল। তারপর ধরা গলায় জিগ্যেস করল, 'কেমন আছ?'

মিনি বলল, 'একটুও ভালো নেই। কিচ্ছু ভালো লাগছে না—।'

জিশান মোবাইল ফোনটা চোখের সামনে ধরল।

পরদায় মিনি কাঁদছে, ওর চোখ থেকে মুক্তো গড়িয়ে পড়ছে।

জিশান জিগ্যেস করল, 'শানু কেমন আছে?'

'ও ভালো আছে। ও এখন ছোট...কিছু বোঝে না...তাই ভালো আছে।' কান্না চেপে মিনি বলল। তারপর ওর ফোনের ক্যামেরাটা শানুর দিকে তাক করে ধরল।

ছবিতে ছেলেকে দেখতে পেল জিশান। ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা মুখে গুঁজে দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

জিশানের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কবে আবার ওকে কোলে নিতে পারবে কে জানে!

'ওরা কখন ফোন দিয়ে গেল তোমাকে?'

'এই তো, আজ সকালে—।'

শ্রীধর পাত্রী তা হলে কথা রেখেছেন! জিশান চলে আসার দু-দিন পরে হলেও ফোনটা দিয়েছেন।

সিন্ডিকেট হেডকোয়ার্টার থেকে জিপিসিতে আসার পর শ্রীধর জিশানকে

এই এমভিপি সেটটা দিয়েছেন। তখন থেকেই জিশান মিনিকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে—কিন্তু পাচ্ছে না। এখন বুঝতে পারল কানেকশান না পাওয়ার কারণ।

তারপর মিনিকে অনেক কথা বলল জিশান। ওর দিন-রাতের জীবনের খবর দিল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

মিনিও অনেক কথা বলল জিশানকে। তারপর কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'কিল গেম-এ তোমাকে জিততে হবে। আমি এখন টিভিতে সবসময় কমপিটিশানগুলো দেখছি। ওরা মাইক্রোভিডিয়োফোনের সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্লেট টিভিও দিয়ে গেছে বাড়িতে।'

জিশান রোজ কী করছে সে-কথা জানতে চাইল মিনি। জিশান সময় নিল। ধীরে-ধীরে সব বলল মিনিকে।

জিশানের মনে পড়ে গেল ডিজিটাল জিমের ইনস্ট্রাক্টরের কথা : গেস্টহাউসে ফিরে এসে ডেইলি রুটিন কনটিনিউ করতে বলেছেন তিনি।

এখানে আসার পর থেকে এদের ডেইলি রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে জিশান।

ভোর ঠিক ছ'টায় একটি সুরেলা মেয়েলি গলা জিশানকে নাম ধরে ডাকে—ওর ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত ডেকেই চলে।

বিছানায় উঠে বসামাত্রই চোখ পড়ে দেওয়ালে লাগানো প্লেট টিভির রঙিন পরদায়। সেই পরদায় একজন সুন্দরী মেয়ের মুখ—ঠোঁটে ওর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের হাসি। এই মেয়েটিই জিশানকে ডাকছিল।

জিশানের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলেছে, 'গুড মর্নিং, জিশান। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নাও। শার্প ছ'টা পনেরোয় ওয়ার্কআউট —প্রথম অ্যানালগ জিমে, তারপর আউটডোরে। আজ ঠিক সওয়া ন'টায় তোমার ওয়ার্কআউট শেষ হবে। তারপর...।'

জিশান অবাক হয়ে মেয়েটিকে দ্যাখে। এমনভাবে ও কথা বলছে যেন ওর ঘরেই সশরীরে হাজির রয়েছে। আসলে এই ঘরে কোথাও একটা লুকোনো ক্যামেরা রয়েছে। সেই ক্যামেরার চোখ প্রতিটি মুহূর্তে নজর রাখছে জিশানের ওপরে। এবং ওর ছবি নির্ঘাত পৌঁছে যাচ্ছে জিপি কন্ট্রোল রুমে। সেখানেই হয়তো বসে আছে এই সুন্দরী মেয়েটি। সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে।

এখানে গেস্টহাউসে যে-ক'জন প্রতিযোগী আছে তাদের সকলের জন্যই একইরকম নজরদারির ব্যবস্থা। সেটা জিশান অন্যদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে।

ঘরের প্লেট টিভিটার সঙ্গে লাগানো রয়েছে ব্ল্যাক কিবোর্ড। অর্থাৎ, দরকারে ওই টিভি পরদাই হয়ে যেতে পারে কম্পিউটারের মনিটর। এবং জিশান ওর যত রাজ্যের প্রশ্নের চটজলদি উত্তর পেয়ে যেতে পারে চব্বিশ ঘণ্টার হেল্পলাইনে।

যে-জিমে শুধু ব্যায়াম-টায়াম করা হয় তাকে বলা হয় অ্যানালগ জিম। অ্যানালগ জিমেই শিক্ষকদের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল জিশানের।

অ্যানালগ জিমে একঘণ্টা ব্যায়ামের পর আধঘণ্টা বিশ্রাম। তখন ওদের ফলের রস, কাজুবাদাম, গ্লুকোজ, ওট মিল এসব খেতে দেওয়া হয়। সেসময় চার-পাঁচজন ছেলে ওদের পরিচর্যা করে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে দেয়, হাত-পা টিপে দেয়। তাদের নাম 'জিম বয়'।

অ্যানালগ জিমে জিম বয় ছাড়াও আছে 'জিম গার্ল'। ওরা প্রতিযোগীদের খাওয়া-দাওয়ার দিকটা দ্যাখে আর টুকটাক ফাইফরমাশ খাটে।

বিশ্রাম শেষ হলে আউটডোর ওয়ার্কআউট।

কতরকম অভিনব ব্যবস্থা সেখানে! মাঠের ওপরে দৌড় প্র্যাকটিস, তারপর বালির ওপরে দৌড়, আর সবার শেষে জলের ওপরে দৌড়।

জলের ওপরে দৌড় বলতে একটা বিশাল মাপের চৌবাচ্চা। তার একপ্রান্তে দাঁড়ালে অন্য প্রান্তের মানুষকে এত ছোট দেখায় যে, ভালো করে চেনা যায় না। চৌবাচ্চায় দেড় ফুট মতন জল আছে। প্রতিযোগীদের সেই জল ভেঙে দৌড়তে হয়। কিছুক্ষণ দৌড়নোর পর বিশ্রাম—তারপর আবার দৌড়।

ব্যায়ামের পর্ব শেষ হলে গেস্টহাউসের ঘরে ফিরে আসে জিশান। শীতাতপ ঘরগুলোর ব্যবস্থা এমনই যে, ফাইভ স্টার হোটেলকেও হার মানায়। সেই ঘরের আরামে কাটে ঘণ্টাখানেক। তারপর টিভিতে পাওয়া নির্দেশ অনুসারে যেতে হয় লেকচার হলে। সেখানে রোজই একজন করে অভিজ্ঞ বক্তা আসেন—ভিডিয়ো ফিল্ম দেখিয়ে আর্মড কমব্যাট আর আনআর্মড কমব্যাট শেখান। তারই মধ্যে শেখানো হয় কতরকমের আর্মস আর অ্যামুনিশানস আছে—কীভাবে কোন-কোন পরিস্থিতিতে সেগুলো ব্যবহার করতে হয়। আরও শেখানো হয় গেরিলা যুদ্ধ।

সবচেয়ে জিশানের যেটা অবাক লাগে সেটা হল, কখনও কোথাও কিল গেম-এর নাম করতে চায় না কেউ। এমনকী ইনশিয়োরেন্সের ফর্ম ফিল-আপ করার সময়েও কিল গেম না লিখে নির্দেশমতো লিখতে হয়েছিল হাই রিস্ক গেম। শুধুমাত্র বন্ড সই করার সময় কিল গেম নামটা ফর্মে দেখতে পেয়েছিল জিশান।

লেকচার হলে ক্লাস শেষ হলে জিশানরা ফিরে আসে গেস্টহাউসে। খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নেয়। তারপর বিকেলে যায় মাঠে খেলতে। সেখানে ভলিবল কিংবা ফুটবল খেলা হয়—নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ারকি চলে। তবে না চাইলেও কারও-কারও সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ জমে যায়।

কথা বলে জিশান জেনেছে, পার্টিসিপ্যান্টদের সকলের রেজিস্ট্রেশান কিল গেম-এ নয়। অন্যান্য গেম-এও অনেকের রেজিস্ট্রেশান রয়েছে। তবে যেহেতু সব খেলাতেই বডি স্কিল দরকার সেহেতু অ্যানালগ জিম, আউটডোর ওয়ার্কআউট,

খেলাধুলো—এগুলো সকলের জন্য।

সন্ধেবেলা জিশানদের শিডিউল হল ফিল্ম শো। জিপিসির এ.সি. অডিটোরিয়ামে সন্ধেবেলা যত রাজ্যের অ্যাকশান ফিল্ম দেখানো হয়। পুরোনো আমলের অ্যাকশান ফিল্মও নিয়ে আসা হয় ফিল্ম আর্কাইভ থেকে।

এই ফিল্মগুলো দেখার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার জিশান লক্ষ করেছে। যে-কোনও অ্যাকশান সিকোয়েন্স দেখানো হয়ে যাওয়ার পরই সেটাকে আবার স্লো-মোশানে দেখানো হয়। যাতে অ্যাকশান দৃশ্যের খুঁটিনাটি সব দর্শক ভালো করে বুঝতে পারে।

সিনেমা দেখার পালা শেষ হলে কিল গেম পার্টিসিপান্টদের জন্য দিনের শেষ প্রোগ্রাম আর্মস এক্জিবিশান অ্যান্ড ট্রেনিং। আর্মস এক্জিবিশানে নানান আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেখানো হয়। সেগুলো কেমন করে কাজ করে সেটাও দেখিয়ে দেয় একজন ডেমনস্ট্রেটার। তার পাশেই থাকে একান্ন ইঞ্চি পরদার গ্রেট টিভি। ডেমনস্ট্রেটারের ডেমো শেষ হলে টিভির পরদায় অডিয়োভিশুয়াল ডেমো শুরু হয়। তাতে দরকার মতো ক্লোজ-আপ ছবি থাকে। কারও বুঝতে অসুবিধে হলে অসুবিধের জায়গাটা রিপ্লের ব্যবস্থা আছে।

লাইভ ডেমো আর টিভি ডেমো শেষ হলে শুরু হয় হ্যান্ডস-অন ট্রেনিং। জিশানদের নিয়ে যাওয়া হয় শুটিং রেঞ্জে। সেখানে একটি ঘণ্টা ঘাম-ঝরানো ট্রেনিং-এর পর ওদের ছুটি। তখন জিশানরা গেস্টহাউসের ঘরে বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। গ্রেট টিভিতে নানারকম হালকা এবং মজার প্রোগ্রাম দ্যাখে। তারপর রাতের খাওয়া এবং ঘুম।

জিশানদের একটা দিন শেষ।

সব শোনার পর মিনি বলল, 'জিশান, ভাবতে কী অবাক লাগে, না? মানুষকে কীভাবে মারতে হয় সেটা শেখানোর জন্যে এত চেষ্টা, এত খরচা!'

'মিনি, এখানে বাঁচা শিখতে হলে মারতে শিখতে হয়। ফিরে গিয়ে তোমাকে আমি শিবপদর কথা শোনাব।'

'কে শিবপদ?'

'একজন কিল গেম পার্টিসিপান্ট...ও মারা গেছে...আজ সকালে... আমার হাতে...।' জিশানের গলা ভেঙে গেল।

'কী বলছ তুমি! তোমার হাতে মারা গেছে! তুমি খুনি হয়ে গেছ!'

'হ্যাঁ, মিনি, হ্যাঁ। ওকে না মারলে ও আমাকে মেরে ফেলত। তুমি আমার সঙ্গে এমভিপিতে আর কথা বলতে পারতে না...।' জিশান শত চেষ্টা করেও কান্না চাপতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পর ও নরম গলায় জিগ্যেস করল, 'মিনি, তুমি চাও না আমি তোমার কাছে ফিরে যাই? তুমি চাও না, ছোট্ট শানু দু-হাত সামনে বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক আমার কোলে?'

'হ্যাঁ—চাই, চাই, চাই' উত্তেজিতভাবে কথা বলতে গিয়ে মিনির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

মাথা ঝাঁকিয়ে জিশান বলল, 'যদি তাই চাও, তা হলে আমাকে খুনি হতে হবে। অন্তত কয়েকজনকে খতম করতে হবে। তুমি জানো না, কিল গেম-এ সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর মাত্র 0.07। খুব উঁচুদরের খুনি না হলে এ-খেলা থেকে বেঁচে ফেরা ইম্‌পসিব্‌ল। তোমার আর শানুর জন্যে আমাকে হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করতে হবে...।'

'তাই করো...' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মিনি, '...পরের খেলাগুলোয় জেতার চেষ্টা করো। তোমার আজকের খেলাটা টিভি পাইনি বলে দেখতে পারিনি। পরেরগুলোর লাইভ টেলিকাস্ট দেখব। তুমি মনে রাখবে, আমি তোমার গেম শো দেখছি। মনে রাখবে তো? তোমাকে জিততেই হবে, জিশান...।' কেঁদে ফেলল মিনি। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। নিজেকে সামলে নিতে সময় নিল কিছুক্ষণ। তারপর গোটা-গোটা চোখ মেলে তাকাল জিশানের দিকে। ইতস্তত করে বলল, 'এই জঘন্য ব্যাপারটা একেবারে বন্ধ করা যায় না?'

'কে জানে! হয়তো যায়। কিন্তু অভাব আর লোভ বড় অদ্ভুত কম্বিনেশান। ওল্ড সিটির মানুষরা এত অভাবের মধ্যে আছে...তার ওপর দিন-রাত প্লেট টিভিতে ওদের লোভ দেখানো হচ্ছে। দিনকেদিন আমাদের অবস্থাটা খুব কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে...।'

'কিছু একটা করা যায় না?' ফিসফিস করে জিগ্যেস করল মিনি।

জিশানের মনে হল, প্রশ্নটা মিনি ওকে করেনি—বরং ছুড়ে দিয়েছে সকলের দিকে।

ও বলল, 'দশমিনিট হয়ে গেছে, মিনি। রাখছি। নইলে ওরা মাঝপথে কানেকশান অফ করে দেবে। ভালো থেকো...।'

মিনি কিছু বলার আগেই কানেকশানটা সত্যি-সত্যি অফ হয়ে গেল।

জিপিসিতে প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য এমভিপিতে কথা বলার রোজকার বরাদ্দ সময় মোট দশমিনিট। কেউ যদি একমিনিট করে কথা বলে, তা হলে দিনে সে দশবার বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। তবে জিশানের পছন্দ একসঙ্গে দশমিনিট খরচ করা। তাতে ও মিনির কাছাকাছি আসার তৃপ্তি পায়।

ফোনটা কেটে যেতেই সারা দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল জিশানের ওপরে। একইসঙ্গে ও যেন জিপিসির বাস্তবে ফিরে এল।

আরাম দিয়ে ঘেরা হারাম বাস্তব।

বিকেলে খেলাধুলোর সময় জিশান চুপচাপ মাঠের একপাশে বসে ছিল।

বিশাল মাঠকে ঘিরে বিমূর্ত জ্যামিতিক ধাঁচের অনেকগুলো লম্বা-লম্বা বাড়ি। তার মধ্যে একটা জিশানদের গেস্টহাউস।

কাচ বা আয়নায় ঢাকা সুন্দর ছাঁদের বাড়ি ছাড়াও রয়েছে সাজানো বাগান আর দিঘি। ওপরের নীল আকাশে কখনও-কখনও চোখে পড়ছে শিস দিয়ে উড়ে যাওয়া শুটার।

সবমিলিয়ে জায়গাটা এত সুন্দর যে, ওল্ড সিটির কোনও বাসিন্দার কাছে এসব নেহাতই স্বপ্ন। তবে সেই স্বপ্নের আড়ালে রয়েছে মৃত্যুর গন্ধ।

জিশান জানে, যতই সাজানো-গোছানো হোক, ব্যাপারটা আসলে আধুনিক জেলখানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গত দু-দিন ধরে জিশান কিল গেম-এর পার্টিসিপ্যান্টদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। বুঝতে চাইছিল, আর ক'জন প্রতিযোগী এখনও কিল গেম-এর কোয়ালিফাইং রাউন্ডে রয়েছে। আর্মস এক্জিবিশান অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রামে আরও জনাদশেক ছেলেকে ও দেখেছে—কিন্তু ওরাই কি সব? ওদের মধ্যে রণজিৎ পাত্র আর মনোহর সিং-কে ও চেনে। বাকিদের নাম-ধাম পরিচয় কিছুই জানে না।

মাঠের ধারে বসে খেলোয়াড়দের মুখগুলো লক্ষ করছিল ও। সকলের মুখেই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। যেন খেলাটাই ওদের জীবন।

মনোহর আর রণজিৎ ফুটবল খেলছিল। খেলতে-খেলতে মনোহর বারবার তাকাচ্ছিল জিশানের দিকে—হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকছিল। আর জিশান হাত নেড়ে ইশারা করে বোঝাচ্ছিল যে, না, ওর খেলতে ভালো লাগছে না।

জিশানের কাছাকাছি একজন গার্ড পাথরের মতো মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আবার একইসঙ্গে খুব নিচু গলায় গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজছিল।

ব্যাপারটা জিশানকে অবাক করেছিল, কারণ এ ক'দিনে পিস ফোর্সের গার্ডগুলোকে ও রোবট বলে ভাবতে শিখেছে। ওরা তা হলে মানুষ। শখ করে গান গায়!

জিশান গার্ডটাকে ভালো করে দেখল।

মেদহীন টান-টান শরীর। ফরসা। বয়েস তেইশ কি চব্বিশ। গাল দুটো সামান্য বসা। কালো আর সোনালি ইউনিফর্মে দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে। কোমরে ঝোলানো নীল রঙের শকার বিকেলের আলোয় ঝকমক করছে।

গার্ডটা সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ একটুও না ঘুরিয়ে ও আড়চোখে জিশানের দিকে তাকাল। গুনগুন থামিয়ে নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কী? শরীর খারাপ?'

জিশান বলল, 'না—।'

'তা হলে? খেলছ না?'

'খেলতে ভালো লাগছে না।'

'কী করে ভালো লাগবে? সামনে বিপদ...।'

জিশান অবাক চোখে গার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল। পিস ফোর্সের একজন গার্ড জিশানদের বিপদ নিয়ে ভাবে!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গার্ডটা বলল, 'তোমার আসল খেলার ডেট কবে?'

'এখনও জানি না।'

'কোন খেলায় নাম দিয়েছ?'

'কিল গেম।' একটু থেমে জিশান আবার যোগ করল, 'আমি নাম দিতে চাইনি। ওরা জোর করে নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে...।'

'জানি।' গার্ডটা একচিলতে বিষণ্ণ হাসল : 'ওরা এইরকমই করে—সবাইকেই। তোমার বাড়িতে কে-কে আছে?'

জিশান বলল।

শুনে গার্ডটা জিশানের দিকে একবার তাকাল, তারপরই মুখ ফিরিয়ে নিল সামনের দিকে।

ঠিক তখনই মনোহরদের ফুটবলটা লাফাতে-লাফাতে চলে এল জিশানের কাছাকাছি। জিশান উঠে গিয়ে বলটা ধরে ফেলল।

একটা ছেলে ছুটতে-ছুটতে এল জিশানের কাছে। বলটার জন্য হাত বাড়াল। জিশান বলটা ওকে ছুড়ে দিল।

হাঁপাতে-হাঁপাতে 'থ্যাঙ্কস' বলল ছেলেটা। তারপর বলটা হাতে নিয়ে ছুটে চলে গেল 'থ্রো-ইন' করতে।

গার্ডটা আড়চোখে একবার দেখল জিশানের দিকে। জিশান এখন ওর অনেক কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে আছে ওর দিকেই।

গার্ডটা বলল, 'কেয়ারফুল। এখানে নানান জায়গায় লুকোনো ক্যামেরা লাগানো আছে। ওদের নজরকে ফাঁকি দেওয়ার জো নেই।'

এ-কথায় জিশান অন্যদিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু গার্ডটার সঙ্গে দূরত্ব কমাল না। হয়তো কথায়-কথায় ওর কাছ থেকে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তাতে লাভ কতটুকু হবে জিশান জানে না—তবে কৌতূহল খানিকটা মিটবে।

গার্ডটা চাপা গলায় বলল, 'তুমি যদি শেষ পর্যন্ত ছেলের কাছে ফিরে যেতে পারো তা হলে সেটা ফ্যানট্যাসটিক ব্যাপার হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ—।' একটু থেমে তারপর : 'কেউ কি ফিরে যেতে পেরেছে আজ পর্যন্ত?'

'আমি তো কাউকে দেখিনি। আমার চাকরি প্রায় পাঁচবছর হয়ে গেল...।'

'ওরা যে বলছে, কিল গেম-এ সারভাইভাল ফ্যাক্টর 0.07—মানে, একশোজনের মধ্যে সাতজন বেঁচে যায়...।'

গার্ড হেসে ফেলল : 'ওদের সবকথা তুমি বিশ্বাস করো নাকি! আইনের মারপ্যাঁচ বুঝে-শুনে তারপর ওদের অফিশিয়াল গেম্‌স প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। শ্রীধর পাত্র—আমাদের পিস ফোর্সের মার্শাল—লোকটা একটা কসাই। তার ওপরে মহা ধুরন্ধর। ওই সারভাইভাল ফ্যাক্টরটা যদি আসলে 0.0 হয় তা হলেও আমি অবাক হব না।'

গার্ড বলে কী।

জিশানের খুব ইচ্ছে করল, গার্ডটার দিকে ঘুরে তাকায়, এ নিয়ে আরও প্রশ্ন করে। কিন্তু লুকোনো ক্যামেরার কথা ভেবে পারল না। রাগে ওর চোয়াল শক্ত হল শুধু।

গার্ড আবার বলল, 'তুমি মন খারাপ কোরো না। আমি ফস করে সত্যিটা বলে ফেললাম। কিল গেম-এ কেউই খুব একটা আশা নিয়ে আসে না। তবে সিন্ডিকেট চায় লড়াইটা খুব জমে উঠুক। তা হলে লড়াই চলবে অন্তত পনেরো কি কুড়ি ঘণ্টা। তাতে পাবলিকের যেমন বেশিক্ষণ ধরে এনটারটেইনমেন্ট হবে, তেমনই বিজ্ঞাপনের ইনকাম অনেক বেড়ে যাবে।' গার্ড নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা শব্দ করল : 'বুঝলে, এরা সবকিছু পয়সা দিয়ে মাপে। এমনকী দোকানে মিনারেল ওয়াটারের বোতল কিনতে গেলে বলে না "এক লিটার কি দু-লিটারের বোতল দাও।" বলে, "ষাট টাকার জল দাও।" নয়তো "একশো টাকার জল দাও।" স্কুল-কলেজেও সেইরকমই শেখায়। অসহ্য।'

'অসহ্য লাগছে, তাও এখানে চাকরি করছ?'

'হ্যাঁ, করছি। দু-বেলা খেতে হবে তো! নিউ সিটিতে সিন্ডিকেটই শেষ কথা। আমাকে ওরা চাকরি দিয়েছে। মাসে-মাসে মাইনে পাচ্ছি, খেতে-পরতে পাচ্ছি—ব্যস। চাকরিটা না করলে হয়তো আমাকে ওল্ড সিটিতে গিয়ে দু-বেলা অভাবের মধ্যে কাটাতে হত।'

জিশান বলল, 'ওল্ড সিটিতে অভাব আছে—কিন্তু স্বাধীনতাও আছে।'

'হুঃ!' ব্যঙ্গে ঠোঁট বেঁকাল গার্ড : 'স্বাধীনতা! সেটা আবার কী—গায়ে মাখে, না মাথায় দেয়? এখানে চাকরি করতে-করতে তোমার মতো অনেক স্বাধীন নাগরিককেই তো দেখলাম! একটার-পর-একটা চোখের সামনে খরচ হয়ে যাচ্ছে। যেগুলো বেঁচে ফিরছে, সেগুলো কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা জিতে নিউ সিটিতে থেকে যাচ্ছে—সিন্ডিকেটের পোষা কুকুর হয়ে যাচ্ছে।'

'এর কি কোনও শেষ নেই?' বিভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করল জিশান।

'কী করে শেষ হবে। সবাই তো ভগবানের ভরসায় বসে আছে। ভগবান ওখানে আছে কি না আমি জানি না—' ছোট্ট ইশারা করে আকাশের দিকে আঙুল

তুলল গার্ড, বলল, 'তবে জিজ্ঞাসাপর্বটা যা বুঝি, যা করার মানুষকেই করতে হবে...।'

গার্ডটাকে ভারী অদ্ভুত লাগছিল জিশানের। ঠিক এই কথাগুলোই ও একা-একা কতবার ভেবেছে। কিছু একটা করা দরকার। ওল্ড সিটির মুষড়ে পড়া গুঁড়িয়ে যাওয়া মানুষগুলোর কথা মনে পড়ল জিশানের। পচে যাওয়া মানুষের শরীরে যেসব জঘন্য পোকামাকড় বাসা বাঁধে তাদের মতো নোংরা ক্লেদাক্ত জীবন নিয়ে বেঁচে আছে জিশানরা। অসহ্য এই জীবন।

জিশান ঠিকই বলেছিল মিনিকে : লোভ আর অভাব বড় অদ্ভুত কম্বিনেশান। এই কম্বিনেশানের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ নয়। তা সত্ত্বেও মিনির কথাটা বারবার মনে পড়ছিল জিশানের : 'কিছু একটা করা যায় না?'

গার্ড ঠিকই বলেছে। যা করার মানুষকেই করতে হবে।

জিশান ওকে বলল, 'ঠিকই বলেছ। আমরা কিছু করছি না, তাই আমাদের কপাল ফিরছে না। কিন্তু তুমি কি এখানে খুব সুখে আছ?'

জিশানের দিকে আড়চোখে চাইল গার্ড, বলল, 'শোনো ভাই, এখানে এমনিতে সুখে থাকলেও মনে শান্তি নেই। আমি তো ঠিক করেছি, আর পাঁচবছর চাকরি করব এখানে। তারপর চাকরি ছেড়ে জমানো টাকা সঙ্গে নিয়ে সোজা কেটে পড়ব দেশের বাড়িতে।'

'কোথায় তোমার দেশ?'

'নাহাইতলা গ্রামে—মেদিনীপুর স্টেশানে নেমে আরও বাইশ কিলোমিটার উত্তরে যেতে হয়।'

'তোমার দেশ কেমন? ভালো?'

'ভালো মানে! একেবারে ছবির মতো গ্রাম। কী সুন্দর। শান্ত, নরম।'

কোনও গ্রাম যে 'নরম' হতে পারে সেটা জিশানের জানা ছিল না। কিন্তু তবুও ওর মনে হল, গার্ড কী বলতে চাইছে সেটা ও বুঝতে পেরেছে।

গার্ডের সঙ্গে কথা বলে জিশানের ভালো লাগছিল। মানসিক চাপটা কিছুটা কমে গেছে বলেও মনে হল। কিল গেম-এর চ্যালেঞ্জটাকে নতুনভাবে দেখতে চাইছিল জিশান। ভাবল, রাতে ও মিনির সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবে।

'তোমার কি সারা দিন ডিউটি?' গার্ডকে জিগ্যেস করল জিশান।

'না, শিফট ডিউটি। এখন দুটো-দশটার ডিউটিতে আছি। নেক্সট উইক থেকে ছ'টা-দুটো।'

'তোমার সঙ্গে কাল দেখা হবে?'

'কেন হবে না? এখানেই ডিউটিতে থাকব আমি। পরের সপ্তাহ থেকে অ্যানালগ জিমে ডিউটি। ওই দ্যাখো—খেলা শেষ।'

জিশান দেখল, খেলা শেষ করে মনোহর-এণ্ডজিৎরা ফিরে আসছে।

জিশান গার্ডকে বলল, 'আজ আসি—।'

গার্ড পাথরের মতো মুখ করে সামনের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'কাল দেখা হবে।'

জিশান নাহাইতলা গ্রামের ছেলেটার দিকে একপলক তাকিয়ে মনোহরের দিকে এগিয়ে গেল।

ও মনোহরের কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই হাত বাড়িয়ে দিল মনোহর। জিশানও হাত বাড়িয়ে দিল।

মনোহর জোরালো মুঠোয় জিশানের হাতটা আঁকড়ে ধরে বলল, 'জিতে গেছি, জিশান ভাইয়া।'

জিশান তখনও বোধহয় একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ও ভাবল, সিন্ডিকেটের সঙ্গে লড়াইয়ে মনোহর জিতে গেছে। তাই বিড়বিড় করে বলল, 'আর তা হলে আমাদের কোনও ভয় নেই। এবার থেকে আর অন্যের ফুর্তির জন্যে মানুষ মরবে না।'

জিশানের কথার মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারল না মনোহর সিং। ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল জিশানের দিকে।

কিছুক্ষণ পর মনোহর বলল, 'কী সব আনসান বকছ, জিশান ভাইয়া। আমরা ফুটবল খেলায় জিতে গেছি। তিন-দুই গোলে। অব সমঝে আপ?'

জিশান ঘোর কাটিয়ে মাটিতে নেমে এল। একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'সরি, মনোহর। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। কনগ্র্যাচুলেশানস।'

ওরা পাশাপাশি হেঁটে চলল গেস্টহাউসের দিকে। জিশান পিছন ফিরে গার্ড ছেলেটিকে একবার দেখল। তারপর মনোহরকে বলল, 'তোমাকে একটা খবর দেব...।'

'কী খবর?' বাচ্চা ছেলের কৌতূহল নিয়ে জিশানের মুখের দিকে তাকাল মনোহর।

'কিল গেম-এর সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টরটা 0.07 নয়। এটা হয়তো সিন্ডিকেটের বানানো। আসল সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর জিরোও হতে পারে—।'

মনোহর সিং-এর মুখটা পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ও চাপা গলায় জানতে চাইল, 'কী করে জানলে?'

জিশান বলল।

শুনে শব্দ করে মাটিতে থুতু ফেলল মনোহর, বলল, 'ইয়ে লোগ বহত কামিনা হ্যায়।'

জিশান কোনও কথা বলল না। ওরা পায়ে-পায়ে চলে এল গেস্টহাউস বিল্ডিং-এর ভেতরে।

ভেতরটা যথারীতি এয়ারকন্ডিশানড। একেবারে সুপারস্টার হোটেলের

মতো সাজানো। সব জায়গাতেই ঝকঝকে মার্বেল—সেখান থেকে প্রতিফলিত আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। জিপিসির এই বিশাল বিল্ডিং-এর আটাশ, উনতিরিশ আর তিরিশ—এই তিনটে ফ্লোর নিয়ে পার্টিসিপ্যান্টদের গেস্টহাউস। বাকি ফ্লোরগুলোয় নানান কন্ট্রোল রুম আর অফিশিয়াল গেস্টদের জন্য সুপারকমফোর্ট পেন্টহাউস। নিরাপত্তার কারণে সুপারগেম্স কর্পোরেশনের এমপ্লয়ি আর গেস্টদের ঢোকার-বেরোনোর পথ জিশানদের থেকে আলাদা। গেমস পার্টিসিপ্যান্টদের স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করলে যেসব দরজা খুলে যায় সেগুলো দিয়ে অবাধে তারা যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু নিষিদ্ধ এলাকার কোনও দরজাই তাদের স্মার্ট কার্ড টেনে খোলা যায় না।

এইরকম ঝিকিমিকি ফ্যাশানদুরস্ত লবিতে জিশানদের হলদে গেঞ্জি আর কালো বারমুডা প্যান্ট বেশ বেমানান লাগছিল। তার ওপর পোশাকের এখানে-সেখানে কাদা-মাখানো ফুটবলের রাবার স্ট্যাম্প। কিন্তু যেহেতু এই গেস্টহাউসে সব গেম্স পার্টিসিপ্যান্টরাই রয়েছে, সেহেতু জিশানদের অস্বস্তি হওয়ার কোনও কারণ নেই।

পিস ফোর্সের গার্ডরা তাদের জায়গামতো কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে।

জিশানরা কয়েকজন অটো-এলিভেটরে উঠল। আটাশ নম্বর বোতাম টিপল।

আগাপাশতলা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি বিশাল মাপের এলিভেটর। তবে এটা অডিয়ো অ্যাকটিভেটেড নয়। এর ভেতরে অন্তত বিশজন এঁটে যায় অনায়াসে। কিন্তু একটা মেটাল প্লেটে সবচেয়ে বেশি আঠেরোজন যাত্রীর কথা লেখা আছে।

জিশান দেখল, পিস ফোর্সের একজন গার্ড ভেতরে মোতায়েন হয়ে দাঁড়িয়ে। জিশানরা গার্ডের কাছ থেকে দূরত্ব রেখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অটো-এলিভেটরে করে ওপরে ওঠার সময় জিশান লক্ষ করল, রণজিৎ পাত্রও ওদের সঙ্গে উঠেছে। বারবার অন্যদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বোধহয় আঁচ করতে চাইছে, এরপর ওকে কার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

ওকে দেখতে পেয়েই জিশান মুখে কুলুপ আঁটল। রণজিতের সঙ্গে কথা বলতে ওর একটুও ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া রণজিতের স্বভাবই হচ্ছে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাধানো। ঝগড়া বেধে যাওয়ার পর ও হাত চালাতে ভালোবাসে।

মনোহর সিং রণজিৎকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তাই ওর সঙ্গে মনোহরের তেমন মাখামাখিও নেই, আবার ঝগড়াও নেই। রণজিৎ যে একইসঙ্গে এলিভেটরে উঠেছে সেটাও বোধহয় ভালো করে খেয়াল করেনি মনোহর।

ও জিশানকে লক্ষ করে বলল, 'ঘরের কী খবর? বিবি, বাচ্চা সব ঠিক

থাকে তো?'

জিশান হেসে ঘাড় নাড়ল—মুখে কিছু বলল না।

মনোহর বলল, 'আমি পিস ফোর্সের একজন ডেপুটিকে বলেছিলাম, আমার তো ধরে কথা বলার কেউ নেই—তো আমার কোটার দশমিনিট জিশান পালচৌধুরীর কোটায় লাগিয়ে দিন—ও ফ্যামিলি ম্যান আছে—টাইমটা ওর কাজে লাগবে। তো সালা বলল যে, নামুমকিন—নহি হো সকতা...।'

মনোহরের কথায় মজা পেলেও হাসতে পারল না জিশান। কারণ, অটো-এলিভেটরে ওদের সঙ্গে পিস ফোর্সের গার্ড রয়েছে। ও সতর্ক চোখে গার্ডটার দিকে তাকাল।

না, মনোহরের 'শালা' শব্দটা গার্ডটাকে বিশেষ বিচলিত করেনি।

কিন্তু রণজিৎ বোধহয় বিচলিত হয়েছিল। কারণ, ও হা-হা করে হাসিতে ফেটে পড়ল।

অটো-এলিভেটরের সবাই অবাক হয়ে রণজিতের দিকে তাকাল।

জিশান আগেই লক্ষ করেছিল, এলিভেটরে পিস ফোর্সের গার্ড ছাড়া আর ছ'জন পার্টিসিপ্যান্ট রয়েছে। জিশান, মনোহর আর রণজিৎকে বাদ দিলে বাকি যে-তিনজন, তার মধ্যে একজন, খোকন, মনের দিক থেকে মনোহরের কাছাকাছি, আর বাকি দুজন রণজিতের। জিপিসিতে যে একটা চাপা দলবাজির ব্যাপার আছে সেটা দ্বিতীয় দিন থেকেই টের পেয়েছে জিশান—অনেকটা জেলখানার দলবাজির মতো। এখন সেটা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল।

রণজিতের হাসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওর বাকি দুজন জিগরিও দাঁত বের করেছিল। সেটা দেখে জিশানের গা জ্বলে যাচ্ছিল। যদিও ওরা কেন হাসছে সেটা জিশান বা মনোহর কেউই বুঝতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত রণজিৎ অতিকষ্টে অট্টহাসি থামিয়ে বলল, 'ফ্যামিলি ম্যান আবার কিল গেম কী লড়বে! কী রে, হাসান। কী রে, পাপুয়া! বল...।'

হাসান আর পাপুয়া জিশানের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছিল। পাপুয়া হাসির ফাঁকে-ফাঁকে বলল, 'ওস্তাদ, এ মালটা আবার ফার্স্ট রাউন্ডে পাশ হয়ে গেছে।'

মনোহর মারমুখী হয়ে রণজিতের দিকে একটা পা বাড়িয়েছিল, জিশান ওর হাত ধরল—চাপ দিল—ওকে থামতে ইশারা করল।

রণজিৎ ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। ও এগিয়ে মনোহরের সামনে এসে জোড়হাত করে আচমকা হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। ভিক্ষে চাওয়ার সুরে ইনিয়েবিনিয়ে বলল, 'ক্ষমা, স্যার, ক্ষমা। প্লিজ, মারবেন না। আমার ভয় করছে। আর কোনওদিন এরকম করে হাসব না, স্যার—।'

ব্যাপারটা দেখে জিশান আর মনোহর হতভম্ব হয়ে গেল। কেমন যেন

বিব্রত হয়ে পড়ল।

রণজিৎ যে আসলে মনোহরকে ব্যঙ্গ করে ভয় পাওয়ার অভিনয় করছে এটা বুঝতে জিশান আর মনোহরের পাঁচ-দশ সেকেন্ড সময় লেগে গেল।

ব্যাপারটা যে আসলে কী সেটা ওরা বুঝতে পারল হাসান আর পাপুয়ার লবঙ্গলতিকা হাসি দেখে। ওরা দুই সখীর মতো হাসতে-হাসতে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। সেইসঙ্গে বলছে, 'আবে, আমাদের বস রেগে গেছে। চল, গিয়ে ক্ষমা চাই...।'

গার্ডটাকে পাত্তা না দিয়েই হাসান আর পাপুয়া প্রায় ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মনোহরের পায়ের কাছে রণজিতের দুপাশে।

কাঁদুনে সুরে হাসান বলল, 'আর করব না, স্যার। ভুল হয়ে গেছে। আমাদের মারবেন না—প্লিজ।'

জিশান আর মনোহর কিছুটা পিছিয়ে গেল। খোকন ওদের পাঁচজনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। আর পিস ফোর্সের গার্ড তার শকারটা কোমর থেকে খুলে হাতে নিল। তারপর সুইচটা অন করে অটো-এলিভেটরের একপ্রান্তে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। এবার সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তা হলে শকার ব্যবহার করবে। আর তাতেও যদি হালে পানি না পাওয়া যায় তা হলে এলিভেটরের ইমার্জেন্সি হেল্প বোতাম টিপবে।

হঠাৎই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল রণজিৎ।

ওঠার সময় ও ঝুঁকে পড়েছিল মনোহরের দিকে। হিসেবটা এমন ছিল যাতে ওর মাথাটা মনোহরের থুতনির ঠিক নীচে ধাক্কা খায়।

রণজিতের হিসেবে ভুল ছিল না। ওর মাথার সঙ্গে মনোহরের থুতনির সংঘর্ষ হল। আর একইসঙ্গে ও পিছিয়ে এসে প্রচণ্ড শক্তিতে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল মনোহরের গালে।

মনোহর এসবের বিন্দুবিসর্গ আঁচ করতে পারেনি। তাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মার খেল। ওর শরীরটা হেলে পড়ল এলিভেটরের দেওয়ালে। আর থাপ্পড়ের চোটে মাথাটা এক ঝটকায় ঘুরে গেল একপাশে। ওর ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্তের রেখা গড়িয়ে নামতে লাগল চোয়ালের দিকে।

এখানেই শেষ নয়।

রণজিতের দুই দোস্ত তখনও এলিভেটরের মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে ছিল। ওরা দুজন পশুর মতো চিৎকার করে মনোহরের দু-পায়ের গোড়ালি চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল সামনের দিকে।

মনোহরের খাড়া শরীরটা পলকে চিত হয়ে পড়ল মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা রণজিৎ স্পোর্টস শু দিয়ে জব্বর লাথি বসিয়ে দিল মনোহরের পেটে।

এতক্ষণ পরে যন্ত্রণায় একটা 'ওঁক' শব্দ বেরিয়ে এল মনোহরের মুখ থেকে। ওর চোখ দুটো কেমন যেন ঘষা কাচের মতো হয়ে গেছে। গাড়ি চাপা পড়া কুকুরের মতো দেহটা নেতিয়ে পড়ে আছে।

জিশান স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। যেন হলে বসে কোনও অ্যাকশান ফিল্ম দেখছে।

খোকনও তাই। নির্বাক দর্শক।

আর গার্ডের মুখে মুচকি হাসি। হাতের নীল শকার অল্প-অল্প দুলছে।

রণজিতের দুই শাগরেদ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। শব্দ করে তালি দিয়ে হাত ঝাড়ছে আর হাসছে।

জিশান ওদের পাশ কাটিয়ে গার্ডটার কাছে গেল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমার বন্ধুকে এরকমভাবে মারল...কিছু বললে না?'

জিশানের দিকে রূঢ়ভাবে তাকাল গার্ডটা, বলল, 'অর্ডার নেই।'

গার্ডটার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, চোখের পলকে ওর হাত থেকে শকারটা ছিনিয়ে নিল জিশান। এবং ওটা নিষ্ঠুরভাবে চেপে ধরল গার্ডের গায়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে এক প্রবল ঝটকা মেরে গার্ডটার দেহ খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

সেই মুহূর্তে নিজেকে শ্রীধর পাট্টা বলে মনে হল জিশানের। এখন ও হিংস্রভাবে যা খুশি করতে পারে।

ঠিক তাই করল জিশান।

হাসান বোধহয় মাথায় একটু মোটা। অথবা শকারের ক্ষমতা সম্পর্কে উদাসীন। কারণ, জিশানের হাতে শকার দেখেও ও এতটুকু ভয় পেল না। বরং জিশানের উরুসন্ধি লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে পা চালাল।

হাসানের চাপদাড়ি, কালো চোয়াড়ে মুখ, গালের কাটা দাগ, দড়ি পাকানো কঠিন চেহারা বলে দিচ্ছিল যে, হাসান এসব মারপিটের কাজে অভ্যস্ত। হয়তো ও টাকার লোভে পড়েই কিল গেম বা অন্য কোনও গেম-এ নাম দিয়েছে। এবং জিতবে বলে হয়তো আশাও রাখে।

কিন্তু এখানে এসে থেকে জিশান যা করছে তা আসলে জিশানের কাজ নয়—ভেতর থেকে অন্য কেউ ওকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। যেমন এখন।

চকিতে একপাশে সরে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় হাতের শকারটা হাসানের চাপদাড়িতে চেপে ধরল। লোম আর চামড়া পুড়ে যাওয়ার গন্ধ বেরোল। তারপর রডটাকে ও জোরে-জোরে ঘষে দিল কয়েকবার। ততক্ষণে হাসানের লাথিটা ওর কোমরের কাছে এসে লেগেছে।

ঘুষি মারতে একটা হাত শূন্যে তুলেছিল হাসান। কিন্তু শকারের হাই ভোল্টেজ শক খাওয়ার পর ওর হাত তোলা অবস্থাটা অনেকটা 'বাঁচাও! বাঁচাও!' ভঙ্গির মতো দেখাল। ওর শরীরের ভারকেন্দ্রটা সেই মুহূর্তে একটু পিছনদিকে

থেকে যাওয়ায় হাসান পিছনদিকেই উলটে পড়ল।

জিশান কোমরে বাধা পেয়েছিল, তবে তেমন জোরালো নয়।

রণজিৎ পড়ে-যাওয়া হাসানকে সামাল দেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি।

সেই সময়ে জিশান অনায়াসেই রণজিৎকে শকার দিয়ে কাবু করতে পারত, কিন্তু করল না। ও রণজিতের দিকে তাকিয়ে রইল। আড়চোখে লক্ষ করল, পাপুয়ার মুখে আতঙ্কের ভাঁজ পড়েছে। ওর মুখ থেকে লাফাঙ্গা-হাসি মিলিয়ে গেছে। শকার থেকে যতটা সম্ভব সরে গিয়ে ও লিফটের দেওয়ালে নিজেকে পোস্টারের মতো সাঁটিয়ে রেখেছে।

হাসানকে ধরতে গিয়ে রণজিৎ অনেকটা হেলে পড়েছিল। সেই অবস্থায় জিশানের দিকে চোখ পড়তেই ও স্ট্যাচু হয়ে গেল। তারপর জিশানের দিকে নজর স্থির রেখে খুব ধীরে-ধীরে শরীরটাকে সোজা করে দাঁড় করাল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু অটো-এলিভেটর ওপরে ওঠার মৃদু গুনগুন শব্দ।

জিশান পায়ে-পায়ে সরে এল এলিভেটরের বোতামের কাছে। রণজিতের দিকে সতর্ক চোখ রেখে বাঁ-হাতে বোতাম টিপে এলিভেটর থামাল। তারপর এক নম্বর বোতামটা টিপে দিল। এবং এলিভেটর নামতে শুরু করল।

এতে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে। ভাবল জিশান। এলিভেটর ওঠা-নামা করিয়ে সময় তৈরি করে এই মোকাবিলাটা খতম করতে হবে।

রণজিৎ ধূর্ত চোখে শকারটার দিকে তাকিয়ে ছিল। এককণা সুযোগ খুঁজছিল ও। সেটুকু সুযোগ পেলেই ও শুয়োরের বাচ্চাটাকে তুলোধোনা করতে পারবে।

জিশান রণজিতের মতিগতির কিছুটা বোধহয় আঁচ করতে পারছিল। ও শকারটা রণজিতের মুখের সামনে ধীরে-ধীরে দোলাল। যেন কোনও জাদুকর তার জাদু-দণ্ড দুলিয়ে কাউকে ঘুম পাড়াতে চাইছে।

জিশান জিগ্যেস করল, 'ভয় করছে? ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে?'

রণজিৎ চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে ছিল জিশানের দিকে। বুঝতে চাইছিল, ঠিক কী ধরনের উত্তর এই পাগল ছেলেটাকে খুশি করতে পারে।

'আমি মারব বলে ভয় করছে না তো?' ঠান্ডা গলায় আবার জানতে চাইল জিশান।

তারপর রণজিতকে অবাক করে দিয়ে শকারের সুইচটা অফ করে দিল।

জিশানের পায়ের কাছে মনোহর সিং তখন নড়তে শুরু করেছে। সঙ্গে যন্ত্রণার 'উঃ! আঃ!' কাতরানি। খোকন মারমুখী ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে পাপুয়ার দিকে। হাসান জলে-ডোবা মৃতদেহের মতো অসাড়, অসহায়। চোখদুটো বন্ধ—যেন ঘুমিয়ে আছে।

খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গিতে জিশান জিগ্যেস করল, 'আমি মারব বলে ভয় করছে না কি?'

রণজিৎ ওর গোদা-গোদা দাঁত বের করে হাসল। কারণ, জিশান যে শকারের সুইচটা অফ করে নিয়েছে সেটা ও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

তবে ওটা যে জিশানের টোপ সেটা বুঝতে পারেনি।

সুতরাং রণজিৎ হাত চালাল।

আর জিশানও চোস্ত খেলোয়াড়ের মতো শকারটাকে সামনে বাড়িয়ে জোরালো গুঁতো মারল রণজিতের পেটে।

সুইচ অফ করা অবস্থায় অস্ত্র হিসেবে শকারের গুণমান কাঠের রুলের চেয়ে একটু বেশি, লোহার রডের চেয়ে একটু কম। ফলে শকারের গুঁতোয় বেশ ভালোই কাজ হল।

রণজিতের দেহটা ভাঁজ হয়ে গেল সামনে। মাথাটা নিচু হয়ে যাওয়ায় চাঁদির তেলতেলে টাকটা এসে পড়ল জিশানের কাছাকাছি। জিশান নিজের মাথাটা ঝাঁকিয়ে মুগুরের মতো বাড়ি মারল রণজিতের টাকে। তারপর বাঁ-হাতের মুঠোয় সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরল রণজিতের ডানহাতের মধ্যমা।

যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল রণজিৎ। হেঁড়ে গলায় চাপা গর্জন করে চলল—সঙ্গে তীব্র ফোঁসফোঁসানি।

জিশান রণজিতের আঙুলে হিংস্র মোচড় দিল। রণজিতের গলা থেকে যন্ত্রণার সা রে-গা-মা বেরিয়ে এল। এবার শকারটা জিশান সপাটে বসিয়ে দিল রণজিতের পিঠে।

রণজিৎ পড়ে গেল বটে, কিন্তু কাবু হল না।

ও যে কিল গেম লড়তে এসেছে, সেকথা ভুললে চলবে না। ওর শরীরের রস-কসকে খাটো করে দেখলে চলবে না। মনে-মনে ভাবল জিশান।

রণজিৎ আবার উঠতে যাচ্ছিল, জিশান ব্যঙের ঝাঁঝালো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্ষমা, স্যার, ক্ষমা—।' এবং পলকে সুইচ অন করে শকারটা চেপে ধরল রণজিতের পাঁজরের কাছে।

গেঞ্জির কাপড় পুড়ে যাওয়ার গন্ধ বেরোল। আর সেই গন্ধ নাকে ভালো করে ঠাহর করার আগেই এলিভেটরের মেঝেতে পড়ে গেল রণজিৎ।

জিশান ঘুরে তাকাল পাপুয়ার দিকে। শকারটা হাতে খোলা তরোয়ালের মতো ধরা।

পাপুয়া সটান জিশানের পায়ে বডি ফেলে দিল : 'মাপ করো, বস, মাপ করো! আর এরকম হবে না। ক্ষমা, বস, ক্ষমা...।'

জিশান শকারটার সুইচ অফ করে পাপুয়ার পিঠে ঠেকাল। সঙ্গে-সঙ্গে পাপুয়া আতঙ্কে হাঁউমাউ করে উঠল।

জিশান হেসে বলল, 'শালা, ডরপোক—ইঁদুরের বাচ্চা।' জিশান ওর কোমরে একটা হালকা লাথি কষাল।

এলিভেটর তখন চারনম্বর ফ্লোর পার হচ্ছিল। এলিভেটরের প্যানেলের কাছে গিয়ে জিশান বোতাম টিপে যন্ত্রটাকে থামাল। তারপর আটাশ নম্বর বোতাম টিপে দিল।

জিশান, মনোহর, খোকনরা গেস্টহাউসের আটাশ নম্বর ফ্লোরে থাকে। আর রণজিৎরা থাকে উনতিরিশে।

ওপরে উঠতে এলিভেটরের বেশ সময় লাগবে। সেই ফাঁকে জিশান এলিভেটরের ভেতরটা গোছাতে লাগল। খোকন ওর সঙ্গে হাত লাগাল।

প্রথমেই শকারটা গার্ডের শিথিল শরীরের পাশে রেখে দিল জিশান। তারপর ও আর খোকন মিলে মনোহরকে দাঁড় করাল। ওর গালে আলতো চাপড় মেরে সাড় ফেরাতে চাইল।

পাপুয়া তখন ঝুঁকে পড়ে হাসান আর রণজিতের সেবা করছে।

এলিভেটর যখন আটাশ নম্বর ফ্লোরে এসে থামল তখন মনোহর জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। ও ফ্যালফ্যালে চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কেয়া হুয়া, জিশান ভাইয়া?'

জিশান ছোট্ট করে বলল, 'লাফড়া।'

তারপর খোকনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'এর মাথাটা গেছে। চলো, ভালো করে জল-টল না ছেটালে এর কিচ্ছু মনে পড়বে না...।'

খোকন বলল, 'ঠিক বলেছ।'

জিশান ভাবল, এই যে শকার নিয়ে ও লড়াই করল—এটা কি কিল গেম এর আর-একটা প্রিলিমিনারি রাউন্ড? ও কি তা হলে আর-একটা রাউন্ডে কোয়ালিফাই করল? আর সেইসঙ্গে মানুষ থেকে পশুর দিকে এগিয়ে গেল আর-একটা ধাপ?

হঠাৎই জিশানের মনে হল, এলিভেটরে ওদের এই দাঙ্গাহাঙ্গামা কেউ দেখে ফেলেনি তো? দেখলেই সর্বনাশ। তখন কী শাস্তি পেতে হবে কে জানে!

এলিভেটরের সিলিং-এর দিকে তাকাল জিশান।

দুটো ছোট্ট টিভি ক্যামেরা ওর নজরে পড়ল।

●

জিশান কতক্ষণ ঘুমোতে পেরেছিল ঠিক মনে নেই। হঠাৎই কেমন একটা অস্বস্তি টের পেল ও। মিনি আর শানুকে নিয়ে যে-স্বপ্নটা দেখছিল সেটা জলের নীচে ডুবে থাকা ছবির মতো ভাসতে-ভাসতে তলিয়ে গেল। একটা মেয়েলি গলা

ায় যে রোজ ভোরবেলা ছ'টা বাজলেই ওকে গ্রেট টিভির ভেতর থে
ক—মিষ্টি সুরেলা গলায় ডেকে-ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়।

চোখ কচলে বিছানায় উঠে বসল জিশান। অবাক হয়ে দেখল, ওর ঘ
লোগুলো জ্বলছে।

ও কি তা হলে আলো জ্বেলেই শুয়ে পড়েছিল?

না তো! স্পষ্ট মনে আছে, ও সবক'টা আলোর সুইচই অফ করে

তা হলে আলোগুলো অন করল কে?

হঠাৎই হাসি পেয়ে গেল জিশানের। এই জিপিসি-র গেস্টহাউসে
কিছুই অটোমেটিক। এবং তার সমস্ত মাস্টার কন্ট্রোল সিন্ডিকেটের হা
রাং, খুশিমতো ওরা জিশানের ঘরের আলো জ্বালতেই পারে।

ঘরের দেওয়ালে ইনসেট করা ডিজিটাল ঘড়ির দিকে চোখ গেল জিশানে
য় দুটো। পাশে বাঁকা চাঁদের ছবি মানে রাত। প্রতিদিন সূর্য যখন ওঠে
ন চাঁদের ছবিটা পালটে সূর্য হয়ে যায়। আর সূর্য ডুবলেই সূর্যের ছবি
র ফুটে ওঠে চাঁদের ছবি।

এখন যে রাত দুটো সেটা নিশ্চিতভাবে বোঝার জন্য পুবদিকের কা
নলাটার দিকে তাকল জিশান।

সেখানে এখন রাতের অন্ধকার। অন্ধকারে তারা চোখে পড়ছে। আর
র লাল-নীল জোড়া ধূমকেতুর লেজের কিছুটা করে অংশ।

এবার গ্রেট টিভির সেন্স সুন্দরীর দিকে তাকাল। মেয়েটি তখন বল
। ভাঙাতে হল বলে দুঃখিত, জিশান। কিন্তু তোমাকে এখুনি তৈরি হয়ে নি
।। একটা ইমার্জেন্সি কলে পিস ফোর্সের গার্ডরা তোমাকে নিতে আসা
মিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্টের মার্শাল শ্রীধর পাট্টা তোমার সঙ্গে দেখা কর
য়েছেন। তৈরি হওয়ার জন্যে তোমার হাতে মাত্র পাঁচমিনিট সময় আছে, জিশ
মার সময় শুরু হচ্ছে এখন...। ও. কে.। গুড বাই অ্যান্ড থ্যাংক য়ু—

গ্রেট টিভির পরদা থেকে মেয়েটি পলকে উধাও হয়ে গেল। টিভি
ধহয় রিমোট কন্ট্রোল টেকনিকে আবার অফ হয়ে গেল।

জিশানের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

শ্রীধর পাট্টা! দেখা করতে চেয়েছে, কিন্তু কেন?

ধড়মড় করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল জিশান। ওয়ার্ডরোবের ক
য় চটপট পোশাক বদলাতে শুরু করল। হাতে মাত্র পাঁচমিনিট—কিংবা
।—সময় আছে।

জিপিসি-র গেস্টহাউসে পার্টিসিপ্যান্টদের জামাকাপড়ের কোনও অ

নেই। জিশানকে দেওয়া ম্যানুয়ালে স্পষ্ট করে লেখা আছে ট্রেনিং, কম্পিটিশান বা গেমের সময় কী ধরনের পোশাক পরতে হবে। এ ছাড়া বাকি সময় ক্যাজুয়াল ড্রেস।

ওরকম ক্যাজুয়াল ড্রেসই পরবে ঠিক করল জিশান। কারণ, মাঝরাতে শ্রীধর পাত্রা হঠাৎ ডেকে পাঠালে কী পোশাক পরে যেতে হবে সে-কথা ম্যানুয়ালে লেখা নেই। তা ছাড়া ওর ভেতরে কেমন যেন একটা বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

জিশানের বারবার হাই উঠছিল। হাই তুলতে-তুলতেই একটা বাদামি রঙের কর্ডের প্যান্ট আর একটা নেভি ব্লু হাফশার্ট পরে নিল ও। শার্টটা প্যান্টের ভেতরে গুঁজে নিয়ে কোমরে বেল্ট পরে নিল। তারপর হাই তাড়াতে টয়লেটে গিয়ে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিল। এখানে জল নিছক জল নয়—তার সঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধ মেশানো।

ঠিক তখনই দরজায় পাখি-ডাকা সুরে বেল বেজে উঠল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলল জিশান। পিস ফোর্সের দুজন গার্ড দরজায় দাঁড়িয়ে।

জিশান ভালো করেই জানে, গার্ডরা যখন-তখন যে-কোনও গেম্‌স পার্টিসিপ্যান্টের ঘরে দরজা খুলে ঢুকে পড়তে পারে। সে-চাবিকাঠি ওদের কাছে আছে। তা সত্ত্বেও ওরা যে এখন বেল বাজাল সেটা নিছকই ভদ্রতা।

জিশান বাইরে বেরিয়ে এল। লক্ষ করল, দুজন গার্ডের শকারের সুইচ অন করা। মানে, শ্রীধর পাত্রা কোনওরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নন।

দরজা টেনে বন্ধ করল জিশান। তারপর দুই পাথরের মূর্তির সঙ্গে মসৃণ করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল। ওর মন বলছিল, এলিভেটরের টিভি ক্যামেরা দুটোর জন্যই যত সর্বনাশ।

খানিকটা হেঁটে গিয়ে ওরা তিনজন একটা অদ্ভুত এলিভেটরের সামনে এসে দাঁড়াল। এলিভেটরটা কালো কাচের তৈরি। তার মাথার কাছটায় সবুজ আলোর ফুটকি দিয়ে লেখা : H-Elevator। মানে, হরাইজন্টাল এলিভেটর।

এ ক'দিনের অভিজ্ঞতায় জিশান জেনেছে, এই স্পেশাল এলিভেটর শুধু অনুভূমিক তল বরাবর যাতায়াত করতে পারে। অর্থাৎ, এর ওপরে-নীচে ওঠা-নামার কোনও ক্ষমতা নেই...অথচ এর নাম 'এলিভেটর'।

এইচ-এলিভেটরে ঢুকেই হাসি পেয়ে গেল জিশানের। হরাইজন্টাল, তবু এলিভেটর। একেই বোধহয় বলে নাম মাহাত্ম্য! হঠাৎই ও খেয়াল করল, ওর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে গার্ড দুজন অবাক হয়ে ওকে দেখছে।

এলিভেটরের ভেতরে ঢুকেই একজন গার্ড কন্ট্রোল প্যানেলের টাচ স্ক্রিন বোতাম টিপে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কালো কাচ ঢাকা একটা ছোট্ট জানলায় এলিভেটরের স্থানাঙ্ক পালটাতে লাগল। অর্থাৎ, এলিভেটর চলছে। কিন্তু চলার

কোনও শব্দ নেই। শুধু খুব মনোযোগে কান পাতলে ভোমরার মিহি গুনগুন শোনা যাচ্ছে।

একটা স্থানাঙ্কে পৌঁছে এইচ-এলিভেটর থামল। তার দরজা নিজে থেকেই খুলে গেল। ঠান্ডা কাচের বাক্স ছেড়ে বেরিয়ে ওরা একটা করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল।

এখানেও করিডরে আয়নার মতো চকচকে বাদামি গ্র্যানাইট আর দেওয়াল খরগোশের মতো ধপধপে সাদা।

পনেরো-ষোলো পা এগিয়ে গার্ডরা ডানদিকে ঘুরল।

সামনে ঘষা কাচের একটা বিশাল দু-পাল্লার দরজা। তাতে লম্বা পাইপের মতো দুটো পিতলের হাতল—সোনার মতো ঝকঝক করছে।

একজন গার্ড একটা স্মার্ট কার্ড বের করল পকেট থেকে। দরজার পাশে লাগানো একটা স্লটে মসৃণভাবে সেটা টানল। তারপর দুজনে দুটো হাতল টেনে ধরে দরজা ফাঁক করল। ওদের অন্য হাত দুটো জিশানকে ঠেলে দিল ভেতরে। এবং হাতল দুটো ছেড়ে দিল। স্প্রিং দেওয়া দরজা সঙ্গে-সঙ্গে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

ভেতরে যে-ঘরটা জিশানকে প্রায় গিলে নিল সেটা ঘর না ইনডোর ফুটবল মাঠ জিশান বুঝতে পারল না। ওটার চেহারা অনেকটা জিশানের দেখা ডিজিটাল জিমের মতো। তবে ঘরের উচ্চতা তার তুলনায় অনেক কম।

ঘরের একপাশে অন্তত পঞ্চাশটা সোফা সাজানো। সোফাগুলোর উঁচু হাতল লাল রঙের গদি মোড়া। তার ওপরে সোনালি জরির কাজ। যেন মহারাজাদের বিশ্রামের জন্য তৈরি।

সোফাগুলোর বিপরীতদিকে একটা ফুটখানেক উঁচু প্ল্যাটফর্ম—অনেকটা ডান্স ফ্লোরের মতো। সেখানে একটা প্রকাণ্ড কাচের বল একটা ধাতব ফ্রেমে দাঁড় করানো।

জিশান অনুমানে বুঝল, বলটার ব্যাস প্রায় দশ-বারো ফুট হবে। কিন্তু জিনিসটা কী কাজে লাগে সেটা ওর মাথায় ঢুকল না।

হঠাৎই কে যেন বলে উঠল, 'এক্ষুনি বুঝতে পারবে জিশান, কী এই বলের টান ।'

অন্তরঙ্গ সংলাপ, মেয়েলি ঢঙের ন্যাকা রসব্যঙ্গের মিশেলে...জিশান সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারল, কথাগুলো বলছেন শ্রীধর পাট্টা—সিআরডি-র মার্শাল।

শব্দ লক্ষ করে চমকে মুখ ফেরাল জিশান।

মাঝের সারির একটা সোফায় শরীর ডুবিয়ে বসে আছেন শ্রীধর। সোফার হাতলের ওপর দিয়ে ওঁর মাথার খানিকটা, কপাল, আর ছোট-ছোট চোখ দেখা যাচ্ছে। সরু-সরু দুটো পা টান-টান করে সামনের সোফার পিঠের ওপরে রাখা।

পা নামিয়ে শরীরটাকে পলকে সামনে ঝুঁকিয়ে এক মসৃণ মোচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন শ্রীধর। ফ্লুওরেসেন্ট লিপস্টিকে রাঙানো টুকটুকে ঠোঁটে বাঁকা হাসি। মুখের ভাঁজগুলো সাইডলাইটে আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে।

'ওয়েলকাম, বয়। তোমার মতো ফাইটার কেউ নয়। য়ু ওয়্যার শিয়োরলি ব্রাইটার দ্যান ইনসাইড দ্য এলিভেটর।'

ও, জিশানের অনুমানই তা হলে ঠিক। এলিভেটর ফাইটের ভিডিয়ো রেকর্ডিং শ্রীধর দেখেছেন। কিন্তু তার জন্য কী মিলবে? পুরস্কার, না তিরস্কার?

মনে-মনে হঠাৎই হেসে ফেলল জিশান। অন্ত্যমিল রেখে সংলাপ বলাটা কি ছোঁয়াচে রোগ? পুরস্কার, তিরস্কার। ওর ওপরে কি শ্রীধর ভর করেছেন?

শ্রীধর পাত্রির পরনে সেই একইরকম সাদা পোশাক। তাতে সোনালি বোতাম আর নীল হলোগ্রাম।

জিশানের দিকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলেন শ্রীধর। পকেট থেকে ছোট্ট মাপের একটা যন্ত্র বের করে বোতাম টিপলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘটে গেল অলৌকিক কাণ্ড।

একটা দেওয়ালের খানিকটা অংশ নিঃশব্দে সরে গিয়ে আটজন মানুষ ঢুকে পড়ল ঘরে। তাদের মধ্যে যে ছ'জন গার্ড সেটা তাদের পোশাক দেখে বুঝতে পারল জিশান। বাকি দুজনের পরনে সাদা ফুলশার্ট, সাদা প্যান্ট—আর শার্টের ওপরে কমলা রঙের হাতকাটা জ্যাকেট। জ্যাকেটের ওপরে রুপোলি হরফে লেখা : MEDIC। মানে, ওরা ডাক্তার। ওদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ব্রিফকেস ঝুলছে।

ছ'জন গার্ড যান্ত্রিক পায়ে হেঁটে কাচের বলটার কাছে গেল। বলটাকে ঘিরে পজিশন নিল। জিশান লক্ষ করল, ওদের সকলের কোমরে ঝুলছে শকার।

মেডিক দুজনকে ইশারা করলেন শ্রীধর। ব্যালে ডান্সারের ভঙ্গিতে বাঁ-হাতটা শূন্যে তুলে জিশানকে নির্দেশ করে বললেন : 'ব্লাড প্রেশার এবং ব্লাড শুগার, চেক করুন ইচ দুবার।'

শ্রীধরের ছন্দ-বাণীতে মেডিক দুজন মোটেই অবাক হল না। বোঝা গেল, ওরা শ্রীধরকে চেনে।

হতভম্ব জিশানের দুপাশে এসে দাঁড়াল দুজন ডাক্তার। ব্রিফকেস খুলে অচেনা চেহারার দুটো ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বের করল। গ্যাজেটগুলোর দুপাশে স্ট্র্যাপ বেরিয়ে আছে। দুটো যন্ত্রই ওরা স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিল জিশানের কবজিতে। তারপর একইসঙ্গে দুজনে দুটো বোতাম টিপে দিল।

ব্লাড শুগার পরীক্ষার জন্য শরীরে পিন ফুটতে পারে ভেবে জিশান ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে যন্ত্রণার মোকাবিলার জন্য তৈরি হল। তখন সেই যন্ত্রের দায়িত্বে থাকা মেডিক বলল, 'নরমাল হোন। এ-পিন ফুটলে টের পাবেন না।

ন্যানো প্রোব...ন্যানোটেকনোলজিতে তৈরি...রোমকূপের ভেতর দিয়ে সড়সড় করে ঢুকে যাবে...মাইনিউট ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে নেবে। স্মুদ অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট।'

তাই হল। দুটো যন্ত্রেরই ডিসপ্লে প্যানেলে জিশানের ব্লাড প্রেশার আর ব্লাড শুগার লাল আর সবুজ আলোয় ফুটে উঠল।

শ্রীধর কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। গলা বাড়িয়ে প্রেশার এবং শুগারের মান দেখলেন। নিচু গলায় বললেন, 'গুড...গুড...।'

মেডিকরা দ্বিতীয়বার বোতাম টিপল। আবার ফুটে উঠল ব্লাড প্রেশার আর ব্লাড শুগারের মান। সেগুলো দেখে দ্বিতীয়বার সন্তুষ্ট হলেন শ্রীধর। হাতে হাত ঘষে বললেন, 'চমৎকার। কোনও প্রবলেম নেই। এবার বাবু জিশানকে রোলারবলে ঢুকিয়ে দাও...প্লাস্টিকের আড়ালে লুকিয়ে দাও...।'

'রোলারবল' শব্দটা শোনামাত্রই অদ্ভুত বলটার দিকে চোখ গেল জিশানের।

ও, বলটা তা হলে প্লাস্টিকের?

মেডিক দুজন ওর হাত থেকে যন্ত্রের স্ট্র্যাপ খুলে নিল। যন্ত্রগুলো ব্রিফকেসে রেখে ব্রিফকেস দুটো মেঝেতে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর জিশানকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল বলটার দিকে।

জিশান এবার ভয় পেল। একমুহূর্তের জন্য ওর মনে হল বিদ্রোহ করবে। তাই শরীর শক্ত করল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই বুঝল ব্যাপারটা হঠকারিতা হয়ে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে ওর শরীর শিথিল হয়ে গেল।

পিছন থেকে শ্রীধর পাট্টার বক্তৃতা শোনা যাচ্ছিল : 'এলিভেটরের মধ্যে এনার্জি নষ্ট, এতে আমাদের বড় কষ্ট। তোমরা এমন লড়বে, সবাই হাঁ করে দেখবে। তোমাদের জয়-বিজয়, সবাই করবে এনজয়। অযথা এনার্জি ক্ষয়, তার কোনও মানে হয়? তাই নাও কোমল শাস্তি, এ ছাড়া উপায় নাস্তি....।'

বলের নীচে এসে পড়ল জিশান। একজন গার্ড একটা রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে হিহি শব্দ করে বলের নীচের দিকের খানিকটা অংশ খুলে গেল। দুজন মেডিক আর দুজন গার্ড জিশানকে তুলে ধরল ওপরে। একজন আদেশের সুরে বলল, 'বলের ভেতরে ঢুকে পড়ুন। কুইক!'

জিশান কথা শুনল। ও ভেতরে ঢোকার পরই আবার রিমোটের বোতামে চাপ। খোলা অংশটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। জিশান বন্দি হয়ে গেল প্লাস্টিকের বলের ভেতরে।

শ্রীধর পাট্টা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। পকেট থেকে নেশার ছোট্ট শিশিটা বের করে মুখ হাঁ করে ওপরদিকে তাকালেন। খুব সাবধানে তিন ফোঁটা তরল মুখে ঢাললেন। জিভে তৃপ্তির শব্দ করে জোরে-জোরে কয়েকবার শ্বাস টানলেন। তারপর ঠোঁট চওড়া করে হাসলেন।

হঠাৎই মিলিটারি আদেশের সুরে হাত শূন্যে ছুড়ে শ্রীধর তীব্র স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টার্ট অপারেশান। স্টেপ ওয়ান : ড্রপ দা স্টিল বল্‌স--।'

বলের ভেতরে ঢুকে পড়ার পর ক্ষিশান পরীক্ষা করে বুঝল, বলটা নতুন ধরনের কোনও শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি। ও গোলকের ভেতরের তলে হাত বুলিয়ে দেখছিল। তলটা মসৃণ নয়—সাবুদানার মতো ছোট-ছোট বুটি রয়েছে। অনেকটা পদ্মপাতার মতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোলকের ভেতর থেকে বাইরেটা দেখতে ওর কোনওরকম অসুবিধে হচ্ছিল না।

স্বচ্ছ গোলকের ভেতর থেকে শ্রীধর পাট্টাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ক্ষিশান—তবে ওঁর কোনও কথা শুনতে পাচ্ছিল না। ওর মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ওর শ্বাসকষ্ট শুরু হবে, এবং সেটাই বোধহয় শ্রীধরের 'কোমল' শাস্তি।

ঠিক তখনই শ্রীধর হাত ছুড়ে কী যেন বললেন আর সঙ্গে-সঙ্গে গোলকের ওপরদিকের একটা ছোট্ট জানলা খুলে দশটা স্টেইনলেস স্টিলের বল টপাটপ করে খসে পড়ল ভেতরে। কানে তালা লাগার মতো খটাখট শব্দ হল।

ঝকঝকে বলগুলোর মাপ টেনিসবলের মতো। গোলকের দেওয়ালে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল ক্ষিশান। একটা বল হাতে তুলে নিল। টেনিসবলের মাপের স্টিলের বল যতটা ভারী হওয়া উচিত ঠিক ততটাই ভারী।

কিন্তু এই বলগুলো দিয়ে কী করতে চান শ্রীধর?

উত্তর পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। কারণ, শ্রীধর পাট্টা চিৎকার করে দ্বিতীয় আদেশ দিলেন : 'স্টেপ টু : স্টার্ট রোলিং দা বল। আর. পি. এম. টুয়েন্টি—।'

রিমোট ইউনিটের বোতাম টিপল একজন গার্ড। সঙ্গে-সঙ্গে প্লাস্টিকের বিশাল বলটা ঘুরতে শুরু করল।

ক্রমশ বলটার গতি বাড়তে লাগল। এবং শ্রীধরের নির্দেশ মতো ওটার গতি মিনিটে কুড়ি পাকে পৌঁছে গেল।

শ্রীধর পাট্টা একটা সোফার কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। পায়ের ওপরে পা তুলে আধশোয়া ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে ঘুরন্ত বলটাকে দেখতে লাগলেন। সেইসঙ্গে স্বচ্ছ বলের ভেতরে ক্ষিশানের হেনস্থাও তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন।

বলটা ঘুরপাক শুরু করতেই ক্ষিশানের দুনিয়াটা বদলে গেল। ওর শরীরটা বলের সঙ্গে ঘুরতে শুরু করেছিল, কিন্তু বলের গতি বাড়তেই স্থিতিজাড্যের প্রভাবটা স্পষ্ট হল। বলের তুলনায় অনেক কম গতিতে ঘুরপাক খেতে লাগল ক্ষিশান। ফলে বলের প্লাস্টিকের তলে সাবুদানার মতো বুটিগুলো কেন রয়েছে তার কারণ স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। এ ছাড়া স্টিলের বলগুলোও তাদের কাজ করছিল। প্লাস্টিকের বলের ভেতরে ছুটোছুটি করছিল। এলোমেলো ঠোক্কর খাচ্ছিল

গোলকের প্লাস্টিকের তলে আর জিশানের গায়ে। চটপটি বাজির মতো ঠকাঠক শব্দ হচ্ছিল।

সাবুদানার ঘষায় জিশানের শার্ট ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেল। শরীর জ্বলতে লাগল। ও লাট খেয়ে পড়ে গেল বলের নীচের দিকে। ওর মাথা ঘুরতে লাগল।

শ্রীধর পাট্টা হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর মিলিটারি হুকুম ছুড়ে দিলেন বাতাসে : 'স্টেপ থ্রি : চেঞ্জ দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশান কন্টিনিউয়াসলি।'

সঙ্গে-সঙ্গে বলের ঘূর্ণনের অক্ষ বদলাতে শুরু করল। জিশানের শরীরটা যে বলের নীচের দিকে চলে গিয়ে অস্থির যন্ত্রণা থেকে খানিকটা রেহাই পেয়েছিল সেটা উলটে গেল পলকে। এবং ওর শরীরটা নিয়ে বলটা বলতে গেলে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।

আবার হাতঘড়ি দেখলেন শ্রীধর। চিৎকার করে বললেন, 'লাস্ট স্টেপ : ভ্যারি দ্য অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইর‍্যাটিক্যালি—ফ্রম হান্ড্রেড আর. পি. এম. টু টুয়েন্টি আর. পি. এম.—।'

এবার সর্বনাশের আর কিছু বাকি রইল না।

ঘুরপাক খাওয়া বলের গতিবেগ মিনিটে একশো পাক থেকে কুড়ি পাকের মধ্যে যাচ্ছেতাইভাবে পালটাতে লাগল। সেইসঙ্গে ঘূর্ণনের অক্ষও বদলে যাচ্ছিল বেহিসেবিভাবে। আর ইস্পাতের বলগুলো পাগলা বুলেটের মতো জিশানের শরীরে আঘাত করছিল। কোনওটা ঠোঁটে এসে লাগছে, কোনওটা চোখে। যন্ত্রণায় বারবার সিঁটিয়ে যাচ্ছিল ও। আর শরীর থেকে যে রক্ত বেরোচ্ছে সেটা ও বুঝতে পারছিল প্লাস্টিকের বলের গায়ে লেপটে যাওয়া তাজা রক্তের দাগ দেখে।

এরকম শাস্তির কথা জীবনে কখনও কল্পনা করেনি জিশান। ওর শরীর থেঁতো হচ্ছিল। মনটাও ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। যন্ত্রণা আর কষ্ট ভুলে থাকার জন্য ও প্রাণপণে মিনি আর শানুর কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওদের মুখগুলো বারবার ঝাপসা হয়ে যেতে চাইছিল।

শেষ পর্যন্ত অসাড় প্রাণহীন একদলা কাদার মতো পড়ে রইল জিশান। বলটা ঘুরছে-তো-ঘুরছেই। ও কখন যে অজ্ঞান হয়ে গেছে সেটা ওর আর খেয়াল নেই।

শ্রীধর পাট্টা হাতঘড়ি দেখে নির্দেশ দিলেন, 'স্টপ অপারেশান।'

সঙ্গে-সঙ্গে সবকিছু থেমে গেল। ঘরটা একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল।

শ্রীধর খিলখিল করে হেসে উঠলেন। উরুতে চাপড় মেরে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আ গ্রেট জব! আ গ্রেট জব! এতে জিশান পালচৌধুরীর শাস্তি হল, আবার খানিকটা ফিজিক্যাল ট্রেনিংও হল। ওর বডিটা নিয়ে যাও। ছাদে রেখে এসো। জ্ঞান ফিরলে ও নিজে থেকেই ঘরে ফিরে যেতে পারবে।

আর কাল গেম্‌স পার্টিসিপ্যান্টদের জিশানের শাস্তির ভিডিয়ো রেকর্ডিংটা দেখাবে। অ্যানালগ জিমে যখন সবাই ব্যাচ ধরে ট্রেনিং করবে তখন দেখিয়ো। নাও, বডিটা এবার বের করো—দেখা যাক, কতটা ছাতু হয়েছে।'

•

বিকেলের খেলাধুলো শেষ হলে মনোহর সিং আর খোকন জিশানের ঘরে এল। জিশান তখন ওর ফ্ল্যাটের লাগোয়া বারান্দায় বসে পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। সূর্যের আকাশ রাঙানোর লীলা দেখছে। আর হয়তো আধঘণ্টার মধ্যেই সন্ধে পরিপাটিভাবে নেমে আসবে।

মনোহরদের নিয়ে ঘরে ঢুকে এল জিশান। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে গায়ের ব্যথাগুলো আর-একবার চাগিয়ে উঠল।

ভোরবেলা ক্লান্তির ঘুম ভাঙার পর কোনওরকমে ও ঘরে ফিরে এসেছে। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। মাথাটা যেন লোহার তৈরি—বয়ে বেড়াতে কষ্ট হচ্ছে। গতকাল রাতের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না ও। শাস্তি দেওয়ার ওই যন্ত্র—মানে, রোলারবলের আইডিয়াটা যদি শ্রীধর পাট্টার মাথা থেকে বেরিয়ে থাকে তা হলে বলতেই হবে শয়তানটার এলেম আছে। সত্যি, মাত্র দশমিনিটের মধ্যে একটা সা-জোয়ানকে তুলোধোনা করে তুলতুলে করার ব্যাপারে রোলারবলের জুড়ি নেই।

রাতে জিশানের যখন জ্ঞান ফিরেছিল তখন ওর মনে হচ্ছিল ও কোনও আকাশযানে চড়ে শূন্যে ভেসে চলেছে। ওর মাথার ওপরে ঘোর কালো আকাশ, তারই মাঝে চাঁদ-তারার হলদে আলো, আর একজোড়া ধূমকেতুর লাল আর নীল লেজের ছটা।

জিশানের মনে হচ্ছিল, ও আর বেঁচে নেই। কোন এক অলৌকিক উপায়ে ওর মৃতদেহ চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ইহলোক ছেড়ে ভেসে চলেছে অন্য কোনও 'লোক'-এর দিকে।

মনোহর সিং আর খোকনকে দেখে খুশি হল জিশান। ওর শাস্তির খবর মনোহররা সকালবেলাতেই পেয়েছে। শ্রীধর পাট্টার শয়তানির কথা ভেবে রাগে ওদের গা চড়চড় করছিল, কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করেনি। কারণ, জিপিসি-তে সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে লুকোনো ক্যামেরার চোখ।

এখনও জিশানের ঘরে কথা বলতে এসে প্রথমেই ক্যামেরার কাচের চোখগুলো খুঁজে বের করতে চাইল মনোহর। সিলিং-এর আনাচেকানাচে তাকাল।

সেখানে দুটো ক্যামেরা খুঁজে পেল ও। জিশান ইশারায় বোঝাল, দুটো নয়, আরও অনেক ক্যামেরা লুকোনো আছে। পরে সুযোগ পেলে বলবে।

জিপিসি-র গেস্টহাউসে ফ্ল্যাটগুলো একই ছাঁদের হলেও কামরাগুলো একই নিয়মে বসানো নয়। এটা জিশান যেমন জানে, মনোহরও তেমনই জানে।

ঘরে ঢুকে জিশান বিছানায় বসল।

মনোহর আর খোকন দুটো সোফায় বসল।

জিশান বালিশের পাশে রাখা রিমোট ইউনিট নিয়ে বোতাম টিপল। দশ সেকেন্ডের মধ্যেই একজন অ্যাটেনড্যান্ট এসে হাজির হল। জিশান তাকে তিনকাপ কফির অর্ডার দিল। সঙ্গে কিছু চিপ্স। জিশান জানে, এই গেস্টহাউসের সার্ভিসের গতি অবাক করে দেওয়ার মতো।

মনোহর জিগ্যেস করল, 'কেমন আছ, জিশান ভাইয়া?'

জিশান হেসে বলল, 'যেমনই থাকি, দু-তিনদিনের মধ্যে ফিট হয়ে উঠতে হবে। তার জন্যে এরাও কম চেষ্টা করছে না....।'

'তার মানে?' ভুরু কপালে তুলল মনোহর।

'সকালে দু-দুবার মেডিকরা আমাকে দেখে গেছে। ইনজেক্‌শান দিয়ে গেছে। "গেট ওয়েল সুন" লেখা রঙিন কার্ড পাঠিয়েছে—সঙ্গে ফুলের তোড়া...।' ইশারায় বালিশের পাশে রাখা কার্ড আর ফুলের তোড়া দেখাল জিশান। একগুচ্ছ গোলাপ। এখনও সতেজ। ওদের রঙের রোশনাই দেখিয়ে জিশানকে যেন বলছে, 'ভালো হয়ে ওঠো।'

'এসবের মতলব?' মনোহরের ভুরু এখন কুঁচকে গেছে।

'মতলব আর কী! সিন্ডিকেট মনে করছে আমি কিল গেম-এর একজন পোটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট। আমি থাকলে ফাইট জমবে...।'

খোকন বলল, 'পোটেনশিয়াল মানে?'

জিশান খোকনের দিকে তাকাল। সত্যি, পোটেনশিয়াল শব্দটার মানে ওর জানার কথা নয়। ও এসেছে চিৎপুরের খালধারের বস্তি থেকে। হাংরি ডলফিন গেম-এ ও নাম দিয়েছে। মনে অনেক আশা যে, ও জিতে যাবে।

খোকনের চোখ টানা-টানা। কেমন যেন একটা কবি-কবি ভাব। নাক টিকালো। গাল একটু ভাঙা। হঠাৎ করে ওর দিকে তাকালে মনে হয় ওর চোখ দুটো দূরের কোনও স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছে।

খোকন যখন হাংরি ডলফিন গেম-এ নাম দিয়ে ও বস্তি ছেড়ে চলে আসে তখন ওর মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। ওরা খোকনকে পিছু ডাকছিল বারবার। কিন্তু খোকন একবারও চোখের জলে বা ডাকে ফিরে তাকায়নি।

দিন-দশেক আগে এক বৃষ্টির রাতে খোকনের বাবা রাস্তায় গুন্ডার দলের পাল্লায় পড়েছিল। মুশকো চেহারার মোটরবাইক গুন্ডার দল তাড়া করেছিল ওর বাবাকে। প্রাণভয়ে ছুটতে-ছুটতে সে শেষ পর্যন্ত টাল সামলাতে পারেনি। খানা

খন্দ আর বৃষ্টির কাদা-জলে ভরতি নোংরা রাস্তায় ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। তাড়া করে আসা প্রথম মোটরবাইকটা খোকনের বাবাকে চাকার তলায় চেপে ধরে। লোকটার বাইকের ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ করছিল আর চাকার নীচে চাপা পড়া উরুর ভেতরে থেকে থেকেই বিদ্যুৎঝলকের মতো শকওয়েভ ঠিকরে উঠছিল। খোকনের বাবার আর্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপছিল, কিন্তু তাকে সাহায্যের জন্য কেউ ছুটে আসেনি—না ঘুষ খাওয়া, নেশা করা, ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা পুলিশের কেউ, না আমজনতার কেউ।

মাতাল গুণ্ডার দল গলা ফাটিয়ে হাসছিল। বাতাসে ভেসে উঠছিল মদের গন্ধ। ওদের উল্লাস দেখে মনে হচ্ছিল মোটরবাইকের নীচে কোনও মানুষ চাপা পড়েনি—চাপা পড়েছে একটা দুর্গন্ধওয়ালা ছুঁচো।

খোকনের বাবার পকেটে একশো দশ টাকা মতো ছিল—আর কিছু খুচরো পয়সা। গুণ্ডার দল খুচরো পয়সা সমেত সব টাকা কেড়ে নিয়েছিল। এমনকী পরনের জামা-প্যান্টটাও খুলে নিয়েছিল মজা করার জন্য।

হেনস্থা আর অপমান সহ্য করে মাঝবয়েসি মানুষটা জল-কাদা মাখা অবস্থায় খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। পরনে শুধু জাঙিয়া আর গেঞ্জি। খোকনের বেশ মনে আছে, জানলার ভাঙা পাল্লার ফাঁক দিয়ে খুব চাপা গলায় মায়ের নাম ধরে ডেকেছিল বাবা। খোকন সে-ডাক শুনতে পেয়েছিল। মা ছুটে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে স্বামীর ওই দুর্দশা দেখে চাপা চিৎকার করে উঠেছিল। আলনা থেকে একটা শাড়ি টেনে নিয়ে চুপিচুপি চলে গিয়েছিল বাইরে।

সেই শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে বাবা বাড়িতে ঢুকেছিল। তখন খোকন, ওর ভাই, আর ছোটবোন বাবাকে ওই অদ্ভুত পোশাকে দেখেছিল। ওদের দিকে চোখ পড়তেই বাবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। মায়ের নাম ধরে ডেকে উঠে কান্না-ভাঙা গলায় বলেছিল, 'জানো, শান্তা, এ শহরে আর কোনও মানুষ নেই—সব জানোয়ার। তার সঙ্গে রয়েছে আমাদের মতো কিছু ইঁদুর, ছুঁচো, আর পোকামাকড়। আমি এত চিৎকার করলাম...একটা লোকও আমাকে বাঁচাতে ছুটে এল না! একটা লোকও না। শান্তা, এ-শহরের মানুষগুলো সব মরে গেছে। আমরা কেউই আর বেঁচে নেই, বুঝলে? অনেকদিন আগেই আমরা মরে গেছি।'

খোকনের মনে আছে, সেদিন সারারাত ও ঘুমোতে পারেনি। আরও মনে আছে, পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা বাবার ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না সারারাত ধরে ওর বুকের ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। বারবার ওর কানে বাজছিল বাবার কান্না মেশানো কথাগুলো : '...এ-শহরের মানুষগুলো সব মরে গেছে...।'

স্লেট টিভিতে দেখানো নানান ধরনের খেলা খোকনকে বরাবর নেশার মতো টানত। সেইসঙ্গে টাকার অভাবটা ওকে চব্বিশ ঘণ্টা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক

করে দিত। সেই রাতের পর ও মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে করে হোক, বাবার চোখের জল ও মুছবেই।

সাঁতারে খোকন ছোটবেলা থেকেই ওস্তাদ। ওয়াটার পোলো ও ভালোই খেলে। তাই ওর মনে হল, হাংরি ডলফিন খেলাটাই ওর পক্ষে সবচেয়ে ভালো।

হাংরি ডলফিন গেম-এ নাম দিয়ে যখন ও ওল্ড সিটি ছেড়ে চলে আসে তখন ওর খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ও মুখ ফুটে বাবাকে বা মা-কে বলতে পারেনি, 'তোমাদের চোখের জল মোছার জন্যেই আমি নিউ সিটিতে যাচ্ছি—।' ওর খুব সাধ, বিশলাখ টাকা প্রাইজ জিতে মা-বাবাকে ও প্রাইজ দেবে। দেখিয়ে দেবে, খোকন ফ্যামিলির জন্য কিছু করতে পারে।

ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছিল জিশান। খোকনই ওকে সব বলেছে। বলেছে, দুঃখের কথা, বলেছে স্বপ্নের কথাও।

কাল বিকেলের পর থেকে জিশান খোকনের কাছে 'জিশানদা' হয়ে গেছে। এলিভেটর ফাইটটা জিশানকে খোকনের কাছে হিরো করে দিয়েছে।

খোকন আবার জিগ্যেস করল, 'জিশানদা, পোটেনশিয়াল মানে?'

জিশান হেসে বলল, 'পোটেনশিয়াল মানে যে হেভি লড়বে—সহজে হারবে না।'

খোকন মনোহরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সিন্ডিকেট তা হলে ঠিকই ভেবেছে। কী বলো, মনোহরদা?'

মনোহর বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল : 'হুঁ—।'

এমন সময় ঘরের দরজা খুলে অ্যাটেনড্যান্ট ঢুকল। হাতের ক্রিস্ট্যাল ট্রে-তে সাজানো তিনকাপ কফি আর ফিঙ্গার চিপ্‌স।

সোফার সামনে রাখা টেবিলে কফি আর ফিঙ্গার চিপ্‌স সাজিয়ে দিয়ে অ্যাটেনড্যান্ট চলে গেল।

ফিঙ্গার চিপ্‌স তুলে নিয়ে তাতে কামড় বসাল মনোহর। চোখ বুজে চিবোতে-চিবোতে বলল, 'এরা রান্নাগুলো দারুণ করে, জিশান ভাইয়া।'

জিশান ছোট্ট করে 'হুঁ' বলল। কিন্তু মনে-মনে বাবার কাছে শোনা একটা ঘটনার কথা ভাবছিল। বহু যুগ আগে দেবতাদের সামনে পশুবলি দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। তখন বলির ঠিক আগে পশুটিকে প্রাণভরে তার প্রিয় খাদ্য খাওয়ানো হত।

সে-কথা ভাবতে ভাবতে মনোহরের দিকে তাকিয়েছিল জিশান। বাচ্চা ছেলের মতো তৃপ্তিতে ফিঙ্গার চিপ্‌স খাচ্ছে আর ফেনিয়ে ওঠা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে।

জিশানেরও একই দশা, কিন্তু ও মনোহরের মতো নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে কই?

জিশান আবারও মনে-প্রাণে চাইল, ওকে যেন মনোহরের সঙ্গে মরণপণ

মোকাবিলায় না নামতে হয়।

খোকন চুপচাপ কফি খাচ্ছিল। হঠাৎই বলল, 'মনোহরদা, জিশানদাকে পুনিয়ার কথা বলো।'

জিশানের ভুরু কুঁচকে গেল। পুনিয়া? কে পুনিয়া?

ও সে-কথাই জিজ্ঞেস করল মনোহরকে।

মনোহর বলল, 'পুনিয়া আমাদের গ্রুপের না অন্য গ্রুপের। ওর পুরো নাম পুনিয়া সরকার—খিদিরপুরে থাকত...।'

'থাকত মানে?'

'কাল রাতে লাস্ট রাউন্ডে মারা গেছে।'

জিশান বুঝতে পারল। পুনিয়া কিল গেম-এর কোয়ালিফাইং রাউন্ডগুলোর লাস্ট রাউন্ডে মারা গেছে।

কিল গেম পার্টিসিপ্যান্টদের নিয়ে নানান কোয়ালিফাইং রাউন্ড যে এতরকম বিপজ্জনক 'খেলা' আছে সেটা জিশান জানত না। কারণ, সুপারগেমস্ কর্পোরেশন কোনওদিনই টিভিতে এসব নিয়ে প্রচার করেনি। এগুলো হয়তো সিন্ডিকেটের ট্রেড সিক্রেট।

কফি খেতে-খেতে মনোহরের মুখে পুনিয়ার কথা শুনল জিশান।

পুনিয়া জিশান-মনোহর-খোকনদের গ্রুপে নয়—অন্য গ্রুপে। ও জিশানদের অনেক আগেই জিপিসি-তে এসেছিল। পেটানো স্বাস্থ্য, লড়াকু ছেলে। ছোটবেলা থেকে খতরনাক পাড়ায় মানুষ। মারপিট করতে-করতেই বড় হয়েছে।

কিল গেম-এর অন্য সব রাউন্ডগুলোয় পুনিয়া অনায়াসেই জিতেছে। কিন্তু কাল রাতে ছিল ওর 'পিট ফাইট'। একটা বিশাল গর্তের মধ্যে দুজন ফাইটারের লড়াই। অনেকেই সেই লড়াই দেখতে যায়। মনোহর আর খোকনও গিয়েছিল।

জিশান পিট ফাইট নিয়ে আগে কিছু শোনেনি। তাই ওই ফাইট দেখার কোনও উৎসাহ ওর ছিল না। তবে এখন খোকনের কাছে শুনল, পিট ফাইট শুধু গায়ের জোরের লড়াই নয়—মনের জোরেরও লড়াই।

গতকাল রাতে পুনিয়া অন্য আর একটা গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান 'জাব্বা' নামে এক ফাইটারের হাতে মারা গেছে। এ নিয়ে জাব্বার হাতে মোট দুজন পার্টিসিপ্যান্ট খতম হল। মনোহর আর জিশান যদি পরের দুটো রাউন্ডে কোয়ালিফাই করে তা হলে ওরা লাস্ট রাউন্ডে যাবে। তখন ওর পিট ফাইটে কার মুখোমুখি হবে কে জানে।

এখানে কোনও পার্টিসিপ্যান্ট শুধু নানান রাউন্ডে জিতলেই কিল গেম-এ তাকে নেওয়া হবে না। ওদের ট্রেনিং শিডিউল-এর নানান ধাপে নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেমন, ফিজিক্যাল ট্রেনিং স্কিল, আর্মস স্কিল, রিঅ্যাকশন টাইম —এসব খাতে নম্বর দেওয়া হয়। সেইসব নম্বর যোগ করে তারপরই বেছে

দেওয়া হবে একজনকে—কিল গেম-এর জন্য।

জাব্বাকে দেখে মনোহর আর খোকন বেশ ভয় পেয়ে গেছে।

মনোহর ভয় পেয়েছে নিজের আর জিশানের জন্য, আর খোকন ভয় পেয়েছে মনোহরের জন্য—আর কিছুটা জিশানের জন্যও।

মনোহর বলল, 'জিশান ভাইয়া, জাব্বার চোখ দুটো খুনির মতো। সবাই বলাবলি করছে, লোকটা নাকি তিন-চারবার জেল খেটেছে। আর জাব্বা বলছে, কিল গেম-এ ও চান্স পাবেই—আর তারপর ওই তিনটে খতরনাক কিলারকে ধরে ও মটমট করে ঘাড় মটকে দেবে—পাটকাঠির মতো। তারপর লুটে নেবে একশো কোটি টাকা।'

জিশান কোনও কথা বলল না। জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। আকাশের আলো কমে গিয়ে অন্ধকার নামছে। হঠাৎই ওর মনে হল ওর জীবনটা আকাশেরই মতো।

খোকন অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ও ভেতরে-ভেতরে কী একটা হিসেব মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

হঠাৎই ও বলে উঠল, 'আচ্ছা জিশানদা, পরের দুটো রাউন্ডে তুমি আর মনোহরদা হেরে গেলে কেমন হয়? তা হলে তোমাদের আর জাব্বার মুখোমুখি পড়তে হয় না...।'

খোকন এই কথা বলামাত্রই জিশান কাশতে শুরু করল। কাশতে-কাশতে মাথা নিচু করে মুখে হাত চাপা দিল ও।

মনোহর আর খোকন একটু অবাক হয়েই জিশানকে দেখতে লাগল।

জিশান অনেক কষ্টে কাশি থামিয়ে খোকনের দিকে তাকিয়ে শক্ত গলায় বলল, 'হারার কথা বোলো না, খোকন। আমি আর মনোহর হারবো না। জাব্বাকে হাতে পেলে আমরা গুঁড়ো করে দেব।'

খোকন তা সত্ত্বেও বিড়বিড় করে বলল, 'জাব্বাকে তুমি তো দ্যাখোনি, তাই এ-কথা বলছ। মনোহরদা দেখেছে—।'

জিশান নেমে পড়ল বিছানা থেকে। আবার কাশতে শুরু হলো। বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়ে কোনওরকমে খোকনকে বলল, 'খোকন, শিগগির বাথরুমে চলো। আমার—আমার মাথা চাপড়ে একটু জল থাবড়ে দেবে। ওঃ, গলায় কী যেন একটা আটকে গেছে—।'

প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতে বাথরুমে ঢুকে পড়ল জিশান। ওর পিছন-পিছন ঢুকল খোকন। আর উদ্বেগ নিয়ে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল মনোহর।

বাথরুমে কোনও টিভি ক্যামেরা নেই। জিশান সেটা ভালো করেই জানে। তাই বাথরুমে ঢুকেই ওর কাশি আর হাঁপানি থেমে গেল। ব্যাপারটা যে অভিনয় ছিল সেটা খোকন এখন বুঝতে পারল।

জিশান চাপা গলায় বলল, 'তোমার মতো হদ্দ বোকা আর দেখিনি। তুমি জানো না, এখানে কোয়ালিফাইং রাউন্ডগুলোয় ইচ্ছে করে হেরে যাওয়ার চেষ্টা করলে কী হয়? সিন্ডিকেটের লোকরা প্রত্যেকটা গেমের ভিডিয়ো রেকর্ডিং দ্যাখে—স্লো মোশানে। তখন স্পষ্ট বোঝা যায়, কে ইচ্ছে করে কোন গেম হারছে। তখন কপালে জুটবে রোলারবল, শক ট্রিটমেন্ট, হাংরি ডলফিন বা ম্যানিম্যাল রেস—উইদাউট প্রাইজ মানি—অথবা সবচেয়ে খারাপ শাস্তি—ডগ স্কোয়াড। তোমার কথাগুলো টিভি ট্রান্সমিশানে চলে যাচ্ছে সিন্ডিকেটের কাছে। সেইজন্যেই আমি কাশির অ্যাকটিং করে তোমাকে থামাতে চেয়েছি...।'

'সরি, জিশানদা—আমার খেয়াল ছিল না...।'

খোকনের অপরাধী-অপরাধী মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল জিশান, আর শাস্তিগুলোর কথা ভাবছিল।

রোলারবল তো ও নিজেই চোখে দেখেছে। বাকি শাস্তিগুলোর কথা ও অন্য কম্পিটিটারদের মুখে শুনেছে। শুনেছে, এই সব শাস্তিতে নাকি বেশ কয়েকজন আগে মারা গেছে।

যেমন, শক ট্রিটমেন্টে বোলোটা ইলেকট্রোড শরীরে লাগিয়ে বিভিন্ন তীব্রতার ভোল্টেজ শক দেওয়া হয়। আর ডগ স্কোয়াড শাস্তির বেলা থাকে আটটা ক্ষুধার্ত অ্যালসেশিয়ান কুকুর। তারা অপরাধীকে মরজি মতন ছিন্নভিন্ন করে।

জিশান খোকনকে তাড়া মেরে বলল, 'এখন শিগগির আমার মাথায় জল ঢালো। মনে রেখো, তোমার হাতও ভিজে থাকতে হবে—কারণ, আমাদের দুজনের অ্যাকটিংই ঠিকঠাক হওয়া জরুরি। সিন্ডিকেটের গোপন চোখ সবকিছু খুঁটিয়ে নজর করে...।'

ভেজা মাথা নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল জিশান। আপাতত অ্যাকটিং করে ও সিন্ডিকেটের টিভি ক্যামেরাকে বোকা বানাল বটে, কিন্তু জাব্বার চিন্তাটা ওর মাথার ভেতরে বাসা বেঁধে রইল।

●

দেখতে-দেখতে পরের কোয়ালিফাইং রাউন্ডের দিন এসে গেল। সাতদিন বিশ্রাম পেয়ে জিশান এখন পুরোপুরি সুস্থ, শরীরে আগের মতন জোর ফিরে পেয়েছে। স্টেয়ার ক্রেয়ার ব্যায়ামটা ও অনায়াসেই ষাটবার করে ফেলতে পারছে। পায়ের কাফ মাস্‌ল বা লিগামেন্টে কোনও স্ট্রেইন টের পাচ্ছে না।

স্টেয়ার ক্রেয়ার ব্যায়ামটা একটু অদ্ভুত ধরনের। মেঝের ওপরে কংক্রিটের তৈরি ছ'ধাপ সিঁড়ি তৈরি করা আছে। ব্যায়াম যে করবে তাকে ছ'ধাপ সিঁড়ি উঠে আবার পিছনদিকে নেমে আসতে হবে। ব্যায়াম করতে-করতে তাকে

ক্রমশ এই ওঠা-নামার গতি বাড়াতে হবে।

ব্যায়ামের দ্বিতীয় ধাপটা বেশ কঠিন। ওপর থেকে ছ'ধাপ নীচে নেমে আবার পিছনদিকে ছ'ধাপ উঠতে হবে। এবং আগের মতোই ওঠা-নামার গতি ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে।

শেষ ধাপে এসে ব্যায়ামটা অদ্ভুত বাঁক নিয়েছে।

এবারে সিঁড়ি ওঠা-নামার কাজ করতে হবে পাশ থেকে। তবে একবার সিঁড়ির দিকে মুখ করে, আর-একবার পিছন ফিরে।

জিশান এই শেষ ধাপটাই অনায়াসে ঘটিবার করে ফেলতে পারছিল। তাতে ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই রাউন্ডটা ও সহজেই পার হয়ে যাবে।

দুপুর আড়াইটের সময় ওরা গেম পয়েন্টের দিকে রওনা হল। ওদের পরনে সেই একই পোশাক : হলদে টি-শার্ট আর কালো বারমুডা প্যান্ট।

জিশান গুনে দেখল : মাত্র এগারোজন পার্টিসিপ্যান্ট। নির্লিপ্ত মুখে সবাই হেঁটে চলেছে গেম পয়েন্টের দিকে। ওদের সামনে-পিছনে রয়েছে পিস ফোর্সের চারজন গার্ড। তাদের প্রত্যেকের কোমরে ঝুলছে শকার। এ ছাড়া সামনে হেঁটে চলেছে লাল ইউনিফর্ম পরা দুজন ইনস্ট্রাক্টর। কোমরে ল্যাপটপ, হাতে রিমোট ইউনিট।

গেম পয়েন্টটা বেশি দূরে নয়, তাই ওরা সবাই সার বেঁধে হেঁটে চলেছে। দূরে হলে ওরা গেম্‌স মোবাইলে চড়ে রওনা হত। গেম্‌স মোবাইল সাপের মতো লম্বা মোটরগাড়ি। একটা গাড়িতে পাইলট-কেবিনের সঙ্গে আরও ন'টা সিট একজনের পিছনে আর-একজন করে সাপের মতো জোড়া আছে। গাড়িটা এমন অদ্ভুতভাবে তৈরি যে, বাঁক নেওয়ার সময় গাড়ির পিছনের অংশটা অপকেন্দ্র বলে ছিটকে গিয়ে দুর্ঘটনা বাধায় না। জিশানকে একজন ইনস্ট্রাক্টর বলেছে, গাড়ির প্রত্যেকটা ক্যারেজে ভেলোসিটি আর কার্ভেচার সেন্সর লাগানো আছে। তা দিয়ে ভেলোসিটি আর রেডিয়াস অফ কার্ভেচার সেন্স করে ক্যারেজের নিজস্ব অটো ব্রেকিং মেকানিজম কাজ করে।

মসৃণ রাস্তা ধরে জিশানরা হেঁটে যাচ্ছিল। মনোহর সিং রয়েছে লাইনের সামনের দিকে, আর জিশান পিছনের দিকে। মনোহর মাঝে মাঝে জিশানের দিকে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে জিশান চারপাশটা দেখছিল। চারদিকে সব ছবি সাজানো। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই কোন অলৌকিক রূপকার বিমূর্ত জ্যামিতিক ছাঁদে ছবির মতো করে সবকিছু তৈরি করেছে।

এই চোখজুড়োনো পরিবেশে এত হিংস্রতা, এত নৃশংসতা!

মাথার ওপরে চোখ তুলে তাকাল জিশান। নীল আকাশে গনগনে সূর্য।

এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে। [illegible]রা ওদের ধাতুর শরীরে রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে।

জিশান চোখ নামাল। ওর মনে হল, 'আমরা যাচ্ছি এগারোজন—কিন্তু কম্পিটিশানের শেষে এই পথ ধরে ফিরে আসব ক'জন?'

জিশানের আরও মনে হল, যারা আর ফেরে না, তাদের নিয়ে কী করে সুপারগেমস কর্পোরেশন?

এমন সময় হঠাৎই ওর খেয়াল হল, সুরেলা মিষ্টি গলায় কে যেন বলছে, 'টা-টা...টা-টা...।'

এখানেও গ্রেট টিভির যন্ত্রণা। জিশান চোখ ফেরাল না—সামনের প্রতিযোগীর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই ওর মনে হল, ওদের চলার পথের দুপাশে মিহি ঘাসে ছাওয়া সবুজ লন। লন ছাড়িয়ে সুন্দর-সুন্দর বাড়ি। ওগুলো জিপিসি-র নানান কর্মীদের কোয়ার্টার। এখানে অলটপকা গ্রেট টিভি আসবে কোথা থেকে।

অতএব চোখ ফিরিয়ে তাকাল জিশান। এবং ওর চোখ আটকে গেল।

বাঁ-দিকের একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে। গায়ে লেসের কাজ করা উজ্জ্বল গোলাপি ফ্রক। মাথায় দুটো ছোট-ছোট বিনুনি, তার প্রান্তে গোলাপি ফিতের ফুল।

বছর ছয়েকের এই ফুটফুটে দেবশিশু জিশানদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, হাত নাড়ছে, আর 'টা-টা' বলছে।

সঙ্গে-সঙ্গে শানুর কথা মনে পড়ে গেল। চোখে জল এসে গেল জিশানের। এই বাচ্চা মেয়েটা কি গুনতে জানে? তা হলে ওদের ফেরার সময় দেখবে এগারোজন আর নেই। এমন তো হতেই পারে, সেই হারিয়ে যাওয়া কয়েকজনের মধ্যে জিশান পালচৌধুরী থাকবে! মেয়েটির সঙ্গে জিশানের আর কোনওদিনই দেখা হবে না! শানুর সঙ্গেও আর দেখা হবে না কোনওদিন!

জিশানের অন্তর ফুঁপিয়ে উঠল।

কিন্তু তারপরই ওর বুকের ভেতরে কীরকম একটা উথালপাথাল হয়ে গেল।

না, জিশান ফিরবেই। এই পথ দিয়েই ও ফিরবে। এই মেয়েটিকে আবার ও দেখতে পাবে। শানুকেও দেখবে আবার। মিনিকেও।

সামনে যতই কঠিন খেলা থাকুক, জিশান তার চেয়েও কঠিনভাবে লড়বে।

জিশান হাত তুলে বাচ্চাটির 'টা-টা' ফিরিয়ে দিল। দেখল, ওদের মধ্যে আরও কেউ-কেউ বাচ্চাটাকে 'টা-টা' করছে।

বাচ্চাটার মিষ্টি হাসির উত্তরে হাসল জিশান। ওর মনে হচ্ছিল, ও যেন শানুর সঙ্গে ইশারায় খেলা করছে।

ওরা এগিয়ে যেতে লাগল। একটু দূরে ছোটখাটো গাছপালার ভিড় চোখে

পড়ল। তার পাশে একটা একতলা বাড়ির মতন। সেখানে পৌঁছে সবাই থামল।

জিশান দেখল, গাছপালাগুলো যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে একটা বিশাল লোহার গেট। গেটের ওপরে সাইনবোর্ডে লেখা : 'KOMBAT PARK'।

জিশানের অল্পবিস্তর পড়াশোনা থাকলেও প্রথম শব্দটার মানে ও বুঝতে পারল না।

একজন ইনস্ট্রাকটর চেঁচিয়ে ওদের থামতে বললেন।

'সবাই থামুন। আমরা কমব্যাট পার্কে পৌঁছে গেছি। আমাদের এই রাউন্ডটা এখানেই হবে। এটা হচ্ছে সারপ্রাইজ রাউন্ড...।'

সারপ্রাইজ রাউন্ড! জিশানের অবাক লাগল : ও পার্কটাকে দেখছিল। নিউ সিটির অন্য সবুজের মতো অতটা সাজানো-গোছানো নয়। বরং ভেতরের গাছপালাগুলো বেশ এলোমেলো। তবে অনেক উঁচু লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। এর ভেতরে কী আছে কে জানে।

সেটা জানা গেল একটু পরেই।

ওদের নির্দেশ দিলেন ইনস্ট্রাকটর : 'পাশের হলঘরটায় সবাই ঢুকে পড়ুন—।'

ওরা একে-একে ঢুকে পড়ল সেই একতলা বাড়িটার হলঘরে।

হলঘরের দরজায় লেখা : 'Kombat Park Control Room'। ঘরের ভেতরটা ঠান্ডা, চুপচাপ। একদিকে সারি-সারি গোটা চল্লিশ সবুজ রঙের চেয়ার। আর তার বিপরীতে সাদা পরদা অনেকটা সিনেমাহলের মতন।

ইনস্ট্রাকটরের কথামতো ওরা সিটে বসে পড়ল। একটু পরেই ঘর অন্ধকার করে পরদায় সিনেমা শুরু হল। সঙ্গে বাংলা ধারাবিবরণী। তবে একজন ইনস্ট্রাকটর চেঁচিয়ে বললেন যে, প্রত্যেক সিটের সঙ্গে ট্রানস্লেটর হেডফোন আছে। সেটা ব্যবহার করলেই পছন্দসই ভাষায় ধারাবিবরণী শোনা যাবে।

সিনেমার প্রথমে কমব্যাট পার্কের নানান তথ্য জানানো হল। সঙ্গে হেলিকপ্টার কিংবা টাওয়ার থেকে তোলা পার্কের ছবি।

পার্কের বেশ কিছু জায়গায় ছোট ছোট ডোবা রয়েছে। তা ছাড়া আছে গাছপালা আর উঁচু-নিচু ঢিবি।

পার্কের বন্যপ্রাণী মাত্র চাররকম। আর, পাখি আছে সতেরোরকম।

বন্যপ্রাণীদের প্রথম তিনটি হল হরিণ, বুনো শুয়োর এবং ছাগল।

আর চতুর্থটি হল কোমোডো ড্রাগন।

এ কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ক্যামেরা জুম করে চলে এল নীচে একেবারে পার্কের মাটিতে। দেখা গেল, প্রায় দশফুট লম্বা একটা কোমোডো ড্রাগন ধারালো দাঁতে একটা চিতল হরিণের পেট খাবলে খাচ্ছে।

প্রাণীটার ভয়ঙ্কর চেহারা জিশানকে কাঁপিয়ে দিল। ছবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে

চলা ধারাবিবরণী ঠিকমতো ওর কানে ঢুকছিল না।

'...জায়ান্ট মনিটর অথবা কোমোডো ড্রাগন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাপের লিজার্ড স্পিসিজ। একসময়ে এই ড্রাগন প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল, কিন্তু পরিবেশবিদ আর প্রাণিবিজ্ঞানীদের চেষ্টায় আবার এরা সংখ্যায় বেড়ে উঠেছে। এদের দৈর্ঘ্য প্রায় দশ-বারো ফুট পর্যন্ত হয়, আর ওজন একশো কুড়ি থেকে একশো পঞ্চাশ কেজি হয়। এরা জোরে ছুটতে পারে—টিকটিকির মতো। আর ওদেরই মতো চটপট গাছ বেয়ে উঠতে পারে।

'একসময় এই ড্রাগন শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়ায় কোমোডো, রিনটুজা, পাডার আর ফ্লোরেস দ্বীপে পাওয়া যেত। কোমোডো দ্বীপ থেকেই এদের নাম কোমোডো ড্রাগন হয়েছে। আর ইংরেজি "Komodo" এবং "Combat" শব্দ জুড়ে আমরা Kombat শব্দ তৈরি করেছি। যার মানে হল, কোমোডোর সঙ্গে লড়াই...।'

এটাই তা হলে সারপ্রাইজ রাউন্ড।

জিশান ভয়ের চোখে প্রাণীটাকে দেখছিল।

গোসাপের মতো দেখতে কিন্তু গোসাপের চেয়ে মাপে অনেক বড়। খসখসে ধূসর চামড়া—তাতে পদ্মকাঁটার মতো বুটি। শক্ত চোয়াল, বড় মাপের ধারালো দাঁত। তেমনই ধারালো পায়ের নখ।

জিশান দেখছিল, জমিতে লাঙল দেওয়ার মতোই প্রাণীটার দাঁত কত সহজে ঢুকে যাচ্ছে হরিণের পেটে। তারপর মাথার এক ঝাঁকুনিতে টেনে বের করে নিচ্ছে মাংস আর নাড়িভুঁড়ি। ওটার দাঁতের ফাঁকে মাংসের টুকরো আটকে রয়েছে, ঝুলছে নাড়িভুঁড়ির অংশ।

জিশানের গা ঘিনঘিন করছিল।

সিনেমার ভাষ্যকার তখন বলছে, '...কোমোডো ড্রাগন কখনও তেড়ে গিয়ে মানুষকে আক্রমণ করেছে এমন শোনা না গেলেও কমব্যাট পার্কে বহুবার এই ঘটনা দেখা গেছে। কারণ, কোমোডোগুলো ক্ষুধার্ত। সবাই বলে হিংস্রতায় কোমোডো কুমিরের চেয়ে কম—কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, খুব একটা কম নয়...।'

এরপর ক্যামেরা পার্কের নানান অঞ্চল দেখাতে লাগল। গাছপালা, পাখি, হরিণ, ছাগল, দাঁতালো শুয়োর—আর অসংখ্য ছোট বড় কোমোডো। জলায়, ডাঙায়, গাছে।

দেখতে-দেখতে জিশান ভাবছিল, এই পার্কে ঢুকে ওদের ঠিক কী করতে হবে? কীভাবে লড়াই করতে হবে কোমোডো ড্রাগনের সঙ্গে? হলের সাউন্ড সিস্টেমে তখন শোনা যাচ্ছে : '...কোমোডোর চোখের নজর খুব সাংঘাতিক—প্রায় তিনশো মিটার দূর থেকেও ওরা দেখতে পায়। তবে ওদের রেটিনায় রড না থাকায় ওরা অল্প আলোয় ভালো করে দেখতে পায় না। এ ছাড়া ওদের

শোনার ক্ষমতা মানুষের তুলনায় বেশ কম। মানুষ যেখানে 20 থেকে 20,000 হার্ৎজ কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায় সেখানে কোমোডো ড্রাগনের শব্দ শোনার কম্পাঙ্ক-সীমা হল 400 থেকে মাত্র 2000 হার্ৎজ।

'ওদের হলদে রঙের চেরা জিভে একটি আশ্চর্য যন্ত্র...।'

ক্যামেরা একটি কোমোডোর ক্লোজ-আপ দেখাল। প্রাণীটা বারবার সাপের মতো চেরা জিভ বের করছে আর মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাচ্ছে।

'এই জিভ দিয়ে ওরা বাতাস থেকে ঘ্রাণ নেয়—ঠিক সাপের মতো। তারপর জিভ ভেতরে ঢুকিয়ে ওরা টাকরায় ঠেকায়। সেখানে আছে জ্যাকবসন্স অরগ্যান। এই অঙ্গটি বাতাস থেকে পাওয়া ঘ্রাণরেণুর রাসায়নিক চরিত্র বিচার করে কোমোডোর কাছে সংকেত পৌঁছে দেয় যে, কাছাকাছি কোনও শিকার আছে কিনা...।'

হঠাৎই জিশানের কানের কাছে ফিসফিস করে কে বলে উঠল, 'বেফায়দা এই বকবকানির কী মানে আছে, জিশান ভাইয়া? তার চেয়ে জলদি বলে ফ্যালো পার্কমে হামকো কেয়া করনা হ্যায়...।'

জিশান পিছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মনোহরকে চিনতে পারল। ও কখন যেন জিশানের ঠিক পিছনের সিটটাতে এসে বসেছে।

জিশান অন্ধকারেই হাসল, বলল, 'সিরফ জিন্দা রহেনা হ্যায়, মনোহর। স্রেফ বেঁচে থাকতে হবে। সে কোমোডো ড্রাগনই হোক কি ডাইনোসর—।'

পরদায় এবার কোমোডোর চোয়াল আর দাঁতের ক্লোজ-আপ দেখাল। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা মাংসের টুকরোও দেখা গেল। সেইসঙ্গে শোনা গেল ভাষ্যকারের গলা : '...কোমোডোর কামড় খেয়েও যদি কোনও হরিণ বা ছাগল পালিয়ে বেঁচে যায় তা হলে এটা নিশ্চিত যে, সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। কারণ, কোমোডোর দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা মাংসের টুকরো পচে গিয়ে সেখানে নানান ব্যাকটিরিয়া তৈরি হয়। সেইসব ব্যাকটিরিয়ার ইনফেকশানে কোমোডোর কামড় খেয়েও বেঁচে যাওয়া শিকার কিছুদিন পর মারা যায়। তবে কোমোডোর নিজের শরীরে প্রাকৃতিকভাবেই এইসব ব্যাকটিরিয়ার প্রতিষেধক আছে। কারণ, কোমোডোরা যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে কামড় খায়, আহত হয়, বা ক্ষতবিক্ষত হয়, তখন তাদের কোনওরকম ইনফেকশানই হয় না—দিব্যি বেঁচে থাকে।

'কোমোডো ড্রাগনরা...।'

আরও মিনিট-পনেরো কোমোডো-কাহিনি চলল। তারপর জিশানরা সিমুলেশান দেখতে পেল। অর্থাৎ, কোমোডোর সঙ্গে কিল গেম-এর পার্টিসিপ্যান্টরা কীভাবে লড়বে তার ভিডিয়ো গেম।

কমলাটি পার্কের লোহার গেট খুলে গেল। তার একপাশে দাঁড় করানো একটা বাক্সের গায়ে স্লটে গোঁজা পাস কার্ডগুলো।

মানুষ-পুতুল অনেকে কার্ড কাছে টানল। তারপর ঢুকে পড়ল পার্কে।

চারটে ক্যামেরা পার্কের আকাশে উড়তে লাগল। পুতুলগুলোর ওপরে নজর রাখতে শুরু করল।

ভিডিয়ো সিমুলেশানে প্রতিযোগীদের নানান অ্যাঙ্গল থেকে দেখানো হল। ওরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটছে—উঁচু নিচু টিবি পেরিয়ে, জলাভূমি পেরিয়ে, লতা-পাতার আড়াল সরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। আর ওদের তাড়া করে চলেছে অসংখ্য ক্ষুধার্ত কোমোডো।

একজন ইনস্ট্রাক্টর তখন বলছেন, 'আজকের এই কমপিটিশানের জন্যে পার্কের কোমোডোগুলোকে গত দশদিন ধরে ছাগল, হরিণ বা শুয়োর সাপ্লাই করা হয়নি। ওরা একটা শিকার ধরে তাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে। তাতে যে-ক'টা কোমোডো মারা গেছে সেগুলোকে বাকিরা ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। এখন খিদের জ্বালায় ওদের সাংঘাতিক অবস্থা। আপনারা সবাই প্রাণপণে ছুটবেন, দরকার হলে গাছ বেয়ে উঠবেন—কি জলে ঝাঁপ দেবেন। কারণ, আপনাদের সকলের উদ্দেশ্য একটাই : কমলাটি পার্ক থেকে বেঁচে বেরোতে হবে। যদিও বেরোনোর ব্যাপারটা একটু ঝামেলার।

সিমুলেশানের দিকে আপনারা লক্ষ রাখুন...।' জিশানরা লক্ষ রাখছিল।

মানুষ-পুতুলগুলো ছুটে পালাচ্ছিল, লাফাচ্ছিল, কখনও-বা গাছ বেয়ে উঠে পড়ছিল। আর ওদের পাগলের মতো ধাওয়া করছিল কোমোডোর দল। সিমুলেশানে দেখা গেল, পার্ক থেকে বেরোনোর গেট একটাই। তবে সেই গেটটা একটা টিবির ঢালের চূড়ায় বসানো—আর সেখানে পৌঁছনোর পথটা সরু এবং শ্যাওলায় ঢাকা।

প্রতিযোগীরা যখনই সেই পথ বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে, বাঁচার চেষ্টা করছে, তখনই হয় তারা শ্যাওলায় পা পিছলে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, অথবা অন্য প্রতিযোগীরা তাদের পা ধরে টেনে নীচে ফেলে দিয়ে নিজেরা গেটের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছে।

সিমুলেশান দেখতে-দেখতে জিশান ঠোঁট কামড়াচ্ছিল।

বাঁচার লড়াইটা এতই জঘন্য যে, হয়তো মনোহরকে পা টেনে ফেলে দিয়ে জিশানকেই গেটের কাছে পৌঁছতে হবে। অথবা এর উলটোটা। আর মিনি এই নিষ্ঠুরতার লাইভ টেলিকাস্ট বাড়িতে বসে বসে দেখবে। ছিঃ!

না, জিশান বরং মনোহরকে সঙ্গে টেনে নিয়ে বেরোতে চেষ্টা করবে। এটা ঠিকই, মনোহরের তিনকুলে কেউ নেই। কিন্তু একজন বন্ধু কি তিনকুলের মধ্যে পড়ে না? নিশ্চয়ই পড়ে। জিশান সিমুলেশান দেখতে-দেখতে মনকে

তৈরি করছিল।

ঠিক পাঁচমিনিট পুরেই জিশানরা সিমুলেশানটা সিমুলেট করতে লাগল। কমব্যাট পার্কের মধ্যে ওরা পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। আর ওদের তাড়া করে ছুটতে লাগল জায়ান্ট মনিটরের দল। মাথার ওপরে উড়তে লাগল আধডজন [illegible]।

ছুটতে-ছুটতে তেতো হাসি পেল জিশানের। সিমুলেশানের নকল ছবি দেখে এবার ওরা আসল কাজটা করছে। নকলের সিমুলেশান!

জিশান লাফিয়ে একটা গাছে উঠল। ওর পা থেকে ঠিক দু-ফুট দূরে চোয়ালে-চোয়ালে ঠোকার শব্দ হল। একটা কোমোডো অল্পের জন্য জিশানের পায়ের নাগাল পায়নি।

জিশান হাঁপাচ্ছিল। গাছের গোড়ায় এসে পৌঁছনো কোমোডোটার দিকে নজর রাখছিল। ওটা বারবার ওর চেরা জিভ বাইরে বের করছে আর ঢোকাচ্ছে। ওটা কি এখন গাছ বেয়ে উঠতে চেষ্টা করবে?

জিশানের সারা গায়ে মাথায় কাদা-মাখা। মিনি এই অবস্থায় ওকে দেখলে নিশ্চয়ই হেসে গড়িয়ে পড়ত। আর শানুও নির্ঘাত ভয়ে ওর কোলে আসতে চাইত না।

মাথার ওপরে গনগনে সূর্য। গোটা পার্কে কড়া রোদের আলো-ছায়া। একটু দূরেই একটা জলার ঘোলাটে জল চিকচিক করছে। জলার ধারে তিনটে কোমোডো মাথা ঝুঁকিয়ে জল খাচ্ছে।

হঠাৎই পাখির শিস শুনতে পেল জিশান। কিন্তু এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে পাখিটাকে কোথাও দেখতে পেল না। গাছের গোড়ায় ওত পেতে থাকা কোমোডোটার কথা খেয়াল হতেই আবার তাকাল নীচের দিকে। জন্তুটা সবে ওর সামনের দুটো পা গাছের গুঁড়িতে তুলেছে।

কী করা যায় এখন? জিশানের মাথার ভেতরে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। অনেক ভেবেও মাথা থেকে কিছু বের করতে পারছিল না। কেমন যেন পাগল-পাগল লাগছিল ওর।

কোমোডোটা ধীরে-ধীরে উঠে আসছে ওপরে।

জিশানের গায়ে কাঁটা দিল। এরপর কী হবে?

গাছের ওপরের দিকে তাকাল জিশান। দু-তিনফুট ওপর থেকেই শুরু হয়ে গেছে সরু ডাল। ওগুলো জিশানের ভার সামলাতে পারবে না। তা ছাড়া এই কমব্যাট পার্কে সব গাছই ছোট মাপের—কোনওটাকেই মহীরুহ বলা যায় না। এরকমটা যেন ইচ্ছে করেই করেছে সিন্ডিকেট। এটা কমপিটিশানের ডিজাইনের একটা অংশ। মানুষ মারার নকশা।

তা হলে এখন বাঁচার জন্য কী করবে জিশান?

নিরস্ত্র জিশান মরিয়া হয়ে একটাই পথ দেখতে পেল। ডালপালা ধরে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল ও। তারপর প্যান্টের জিপ খুলে কোমোডোটার মুখে পেচ্ছাপ করতে লাগল।

চকিতে অচেনা গন্ধের ঢেউ কোমোডোটাকে ভাসিয়ে দিল। হিংস্র প্রাণীটার নখের বাঁধন আলগা হয়ে গেল। ওটা খসে পড়ল মাটিতে। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রবলভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

জিশান আর দেরি করল না। প্যান্টের চেন লাগিয়ে নিয়ে কী ভেবে গাছের একটা মাঝারি মাপের ডাল সজোরে আঁকড়ে ধরল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে।

ও যা ভেবেছিল তাই হল। পাঁচ-ছ'ফুট লম্বা ডালটা সটান মটকে গিয়ে চলে এল জিশানের হাতে। ডালটাকে কয়েকটা জোরালো মোচড় দিল ও। ডালটা গাছের গা থেকে খুলে এল—হয়ে গেল হাতের লাঠি। আপাতত এটাই অস্ত্র হোক। ক্ষুধার্ত সরীসৃপগুলোর সঙ্গে লড়াই করার জন্য এই আঁকাবাঁকা লাঠিটা কম কী!

বিভ্রান্ত কোমোডোটাকে পিছনে ফেলে জিশান ছুটতে শুরু করল।

প্রতিযোগীদের সুবিধের জন্য কমব্যাট পার্কের নানান জায়গায় বেরোনোর পথের নিশানা দেওয়া আছে। সেইসব সাইনবোর্ড দেখে-দেখে জিশান উদভ্রান্তের মতো ছুটতে লাগল। শরীরের বহু জায়গায় ছড়ে গেছে, নুনছাল উঠে রক্ত বেরোচ্ছে, জ্বালা করছে—কিন্তু থামার কোনও উপায় নেই।

ছুটতে-ছুটতে ও শুনতে পেল অন্য কোনও খেলোয়াড়ের আর্তচিৎকার। শব্দ লক্ষ করে কয়েকটা গাছের আড়াল পেরিয়ে খানিকটা এগোতেই জিশান দৃশ্যটা দেখতে পেল।

একজন হাট্টাকাট্টা জোয়ান অসহায়ভাবে পড়ে আছে পার্কের মাটিতে। ছোট-বড় মাপের প্রায় সাত-আটটা কোমোডো লোকটাকে ছেঁকে ধরেছে। লোকটা চিৎকার করছে, হাত-পা ছুড়ছে। আর প্রাণীগুলো ধারালো দাঁত-নখে তাকে ছিন্নভিন্ন করছে। একইসঙ্গে নিজেদের মধ্যেও খেয়োখেয়ি করছে।

জিশান ছুটতে লাগল। একটা জলা জায়গা পেরোতেই দুটো কোমোডো দুপাশ থেকে ওর দিকে ছুটে এল। পাগলের মতো গাছের ডাল চালাল ও। একবার, দুবার, বারবার। ভোঁতা সংঘর্ষের শব্দ হতে লাগল। সংঘর্ষের তীব্রতায় ওর কবজি আর কনুই ঝনঝন করে উঠল।

ছুটতে-ছুটতে ও পৌঁছে গেল বেরোনোর গেটের কাছে। সেখানে একলহমা থমকে দাঁড়াল।

সিমুলেশানে যেমন দেখানো হয়েছিল বেরোনোর পথটা একটা ঢালের ওপরে। সেখানে বেয়ে ওঠার সরু শ্যাওলা-মাখা পথে দুজন খেলোয়াড় তখন

হাঁকপাঁক করে ওপরে উঠতে চাইছে। পা পিছলে গেলে পথের দুপাশের আগাছার খুঁটি ধরে সামলে নিচ্ছে।

ঢেয়ে ওঠার পথের নীচেই অপেক্ষা করছে ছোট্ট মাপের তিনটে কোমোডো। ওরা তাকিয়ে আছে ওপরদিকে কখন প্রতিযোগী দুজন পা পিছলে পড়ে।

জিশান চোখ মনোহরকে খুঁজছিল—কিন্তু খুঁজে পেল না। মনোহর কি আগে পালিয়ে গেল, নাকি পিছনে পড়ে আছে?

আর ভাবার সময় পেল না জিশান। একটা কোমোডো মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল। চেরা জিভ মুখের বাইরে বেরোচ্ছে আর ঢুকে পড়ছে।

জিশান আর দেরি করল না। পিছনদিকে ছুট লাগাল। অনেকটা গিয়ে তারপর থামল। এবং ঘুরে দাঁড়াল।

হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে এবার গেট লক্ষ করে ছুটতে শুরু করল। ওর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, ও পোলভল্ট প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে।

জিশান সত্যিই তাই করল। ছুটতে-ছুটতে ঢালের কাছাকাছি এসে পড়ল। তারপর গাছের ডালটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করে মাটিতে ভর দিয়ে শূন্যে লাফ দিল।

সময় মতো লাঠিটা ছেড়ে দিল জিশান। আকাশে একটা বৃত্তচাপ তৈরি করে ও একেবারে গেটের মুখে এসে আছড়ে পড়ল। মাটিতে কয়েকবার পাক খাওয়ার পর ওর শরীরটা থামল।

সামনেই খোলা গেট। মুক্তি। এবারের মতো চ্যালেঞ্জ রাউন্ড শেষ। লাইভ টেলিকাস্ট শেষ।

জিশান উঠে দাঁড়াল। প্রায় টলতে-টলতে এগিয়ে গেল খোলা গেটের দিকে। এতক্ষণ ও যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। এখন ঘোর কাটতেই দুনিয়ার ক্লান্তি ওকে জড়িয়ে ধরল। একইসঙ্গে ক্ষতবিক্ষত শরীরের জ্বালা-পোড়া তীব্রভাবে টের পেল।

ওঃ ভগবান। চরম পরীক্ষার আগে আর কত পরীক্ষা দিতে হবে ওকে।

গেটের বাইরে মেডিক্যাল ইউনিটের লোকজন অপেক্ষা করছিল। তারা জিশানকে দেখামাত্রই ছুটে এল। অ্যালুমিনিয়াম আর পলিমারের তৈরি স্ট্রেচারে ওকে চটপট শুইয়ে দিল। তারপর ওকে নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ছোট্ট দোতলা বাড়িতে।

বাড়িটার নাম 'পোস্টগেম কেয়ার'। জিশান বুঝল, ব্যাপারটা অনেকটা নার্সিংহোম টাইপের। চ্যালেঞ্জ রাউন্ড শেষ হওয়ার পর প্রতিযোগীদের শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছে এরা।

স্ট্রেচারে চিত হয়ে শুয়ে এগিয়ে চলার সময় জিশান নার্সিংহোমের সাদা ধপধপে সিলিং আর দেওয়াল দেখতে লাগল। একইসঙ্গে ও মনোহরের কথা

ভাবতে লাগল। মনোহর এখন কোথায়? কমব্যাট পার্কে, নাকি এই পোস্টগেম কেয়ার বিল্ডিং-এ?

জিশানকে একটা বড় এসি রুমে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ঘরটার সবক'টা দেওয়ালই কাচের। ধপধপে সাদা আলোয় ঝকঝক করছে। ঘরে প্রায় কুড়ি-বাইশটা বেড। তার কয়েকটায় পেশেন্ট শুয়ে আছে। মেডিকরা তাদের তদারকি করছে।

জিশানকে একটা বেডে শুইয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে-সঙ্গে দুজন ডাক্তার আর একজন সিস্টার ওকে ঘিরে ধরল। ওর যত্ন নিতে লাগল।

জিশানের তেমন মারাত্মক কোনও চোট ছিল না। তবে একজন ডাক্তার ওকে বলল যে, কোমোডোর কামড় খাওয়ার পর ইনফেকশানের হাত থেকে রেহাই পেতে একটা অ্যান্টিডোট সব কমপিটিটরকেই ইনজেক্ট করা হয়। ইনজেকশানটা নেওয়ার সময় একটু ব্যথা লাগবে। জিশান যেন কিছু মনে না করে।

হাসি পেয়ে গেল জিশানের।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ও একের-পর-এক মরণখেলা খেলে চলেছে। এইমাত্র ও ভয়ঙ্কর কোমোডো ড্রাগনের ধারালো দাঁতের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে। আর ইনজেকশানটা দেওয়ার সময় একটু ব্যথা লাগবে বলে আগেভাগেই ডাক্তার বিনীতভাবে ক্ষমা চাইছে! আশ্চর্য!

মিনিট-কুড়ি পরেই বেডে উঠে বসল জিশান। শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে, তবে একটু ঘুম-ঘুম ভাব লেগে রয়েছে। হয়তো ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধপত্রের জন্য, কিংবা ওই অ্যান্টিডোট ইনজেকশানের জন্য।

জিশান দেখল, ওকে নিয়ে ঘরে মোট পাঁচজন পেশেন্ট। তার মানে এই রাউন্ডটায় এই পাঁচজন কোয়ালিফাই করেছে। এরপর আর-একটা রাউন্ড। আর তারপরই পিট ফাইট।

হঠাৎই ঘরে ঢুকল দুজন ইনস্ট্রাক্টর। জিশান তটস্থ হয়ে তাদের দিকে তাকাল। একজন ইনস্ট্রাক্টর ল্যাপটপের বোতাম টিপে এলসিডি স্ক্রিনে ফুটে ওঠা লেখা দেখে বলতে লাগল, 'এই রাউন্ডে কোয়ালিফাই করেছে পাঁচজন পার্টিসিপ্যান্ট। তাদের প্রত্যেকের জন্যে পুরস্কার পঞ্চাশহাজার টাকা। কনগ্র্যাচুলেশনস...। আর ফর ইয়োর ইনফরমেশান, বাকি ছ' জনের কয়েকজন মারা গেছে—আর কয়েকজন ইনডিসপোজড...মানে, অকেজো' হয়ে গেছে।'

জিশান একটা ধাক্কা খেল। খবর পড়ার মতো নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে কী সহজেই না আহত-নিহতদের পরিসংখ্যানটা জানিয়ে দিল লোকটা! বাচ্চা মেয়েটার কথা মনে পড়ল। জিশানরা ফেরার সময় পাঁচের বেশি ওকে গুনতে হবে না।

ইনস্ট্রাক্টর তখন বিজয়ী পাঁচজনের নাম বলছিল। তারপর বলল, 'থ্যাংক য়ু ফর ইয়োর পার্টিসিপেশান। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট। ঠিক আধঘণ্টা পর আমরা

জিপিসি-র গেস্টহাউসের দিকে রওনা হব। সু প্লিজ গেট রেডি বাই দেন...।' ইনস্ট্রাক্টর দুজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

জিশান ইনস্ট্রাক্টরের শেষদিকের কথাগুলো আর শুনছিল না। ও বেডে শুয়ে থাকা অন্য চারজন পেশেন্টের দিকে দেখছিল। কোথায় মনোহর? কারণ, ইনস্ট্রাক্টরদের বলা পাঁচজনের নামের মধ্যে মনোহর সিং-এর নাম আছে।

হঠাৎই একটা বেডে একজন পেশেন্ট সোজা হয়ে বসল। জিশানকে লক্ষ করে ডেকে উঠল, 'এ জিশান ভাইয়া।'

জিশান চমকে সেদিকে ফিরে তাকাল।

মনোহর সিং। মুখে একগাল হাসি। কালচে ছোপধরা দাঁত দেখা যাচ্ছে। একপায়ে হাঁটুর নীচে ব্যান্ডেজ।

জিশান বেড থেকে নেমে ওর কাছে এগিয়ে গেল। পায়ের ব্যান্ডেজের দিকে আঙুল দেখাতেই মনোহর উঠে বসল। কোমরের নীচে ইনজেকশানের জায়গাটা হাত দিয়ে ঘষতে-ঘষতে বলল, 'একটা গিরগিটি আমার পায়ে কামড়ে দিয়েছে ।'

জিশান মনোহরকে দেখে খুব খুশি হয়েছিল। হেসে বলল, 'গিরগিটি নয়—কোমোডো।'

'ওই একই হল। সালা আমিও একটা গিরগিটিকে কামড়ে দিয়েছি...।'

জিশান আঁতকে উঠল। মনোহর বলে কী! একটা কোমোডো ড্রাগনকে ও কামড়ে দিয়েছে!

সে-কথা জিগ্যেস করতে মনোহর বলল, 'হাঁ, জিশান ভাইয়া। আমার পায়ে কামড় দিয়ে জানোয়ারটা ছাড়ছিল না। তখন আমি লড়তে-লড়তে ওটার লেজে কামড় দিয়েছি। ওঃ, কী বাজে টেস্ট!' নাক কুঁচকে ঘেন্নায় মাথা ঝাঁকাল মনোহর।

জিশান আবার হেসে ফেলল। তবে সেই হাসির মধ্যে কিছুটা দুঃখ মেশানো ছিল। সুপারগেমস কর্পোরেশন কী চমৎকারভাবেই না মানুষকে ধীরে-ধীরে পালটে দিচ্ছে পশুতে। একটা মানুষ পশুর গায়ে কামড় বসিয়ে লড়াই করছে—পশুর মতো।

অন্যান্য বেডের বাকি তিনজন তখন বিছানায় উঠে বসেছে। নিজেদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। পঞ্চাশহাজার টাকার প্রাইজ মানি কে কীভাবে খরচ করবে তা নিয়েও জল্পনা-কল্পনা চলছে।

সেদিকে একবার তাকিয়ে মনোহর সিং বলল, 'জিশান ভাইয়া, তোমার তো মোট প্রাইজ মানি হল আশিহাজার টাকা। তুমি এই টাকাটা নিয়ে কী করবে ঠিক করেছ?'

জিশান বলল, আজ রাতে অন-লাইন নেটওয়ার্কে বোতাম টিপে বলে দেব টাকাটা আমার ওয়াইফের কাছে পাঠিয়ে দিতে। মিনি ঠিক করবে এই টাকা দিয়ে

ও কী করবে। আমার তো এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোনও ঠিক নেই...বুঝতেই পারছ...।'

'ফিরতে তোমাকে হবেই, জিশান ভাইয়া। তোমার বিবি-বাচ্চার সঙ্গে মিলতে হবে। ওরা ওয়েট করছে...।'

জিশানের মনটা পলকে উড়ে গেল ওল্ড সিটিতে। মিনি আর শানুর কাছে। ওদের কাছে যদি ও আর কখনও ফিরতে পারে তখন কি আর ও মানুষ থাকবে? ফিরে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তটার কথা ভেবে ভয় পেল জিশান।

মনোহর তখন হাসিমুখে বলছে, 'আমার টাকাটা নিয়ে কী করব সেটা আমিও ভেবে ফেলেছি।'

'কী করবে?'

'তিরিশহাজার আমি রাখব, আর বাকিটা আমার ভাতিজাকে দেব—।'

'ভাতিজা?' অবাক হয়ে বলল জিশান, 'এই যে বললে, তোমার আগে-পিছে কেউ নেই!'

'আগে ছিল না—এখন আছে।' মুচকি হেসে বলল মনোহর, 'একজন দাদা আছে, একজন ভাবী আছে, আর একজন ভাতিজা আছে।'

'মানে?'

মনোহর ঝুঁকে পড়ে জিশানের হাত চেপে ধরল : 'জিশান ভাইয়া, তুমি আমার দাদা আছ। আর শানু মেরা ভাতিজা। আমার আগে তো রিশতেদার কেউ ছিল না—এখন আছে। ওই পঞ্চাশহাজার টাকা আমি ভাতিজা শানুর জন্যে রাখব। তোমার কোনও "না" শুনব না। তুমি আজ আমার ঘরের কম্পিউটার থেকে টাকাটা ট্রান্সফারের বেওস্থা করে দেবে। ওয়াদা?'

জিশানের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও চাপা গলায় বলল, 'পাক্কা ওয়াদা।'

ও মনে-মনে চাইছিল, পিট ফাইটে কিছুতেই যেন ওকে মনোহরের মুখোমুখি না পড়তে হয়। যদি পড়ে, তা হলে জিশান লড়বে না—কিছুতেই না। তার জন্য শ্রীধর পাট্টা যে-শাস্তিই দিক জিশান মেনে নেবে। হোক সে রেকারবল, কিংবা প্রাইজ মানি আর লাইভ টেলিকাস্ট ছাড়া হার্ডল, [illegible] কি অ্যানিম্যাল রেস—অথবা ডগ স্কোয়াড।

মনোহরের হাতে চাপ দিয়ে জিশান ধরা গলায় বলল, 'আশ্চর্য, মনোহর, আমরা এখনও ইনসান আছি—পুরোপুরি জানোয়ার হয়ে যাইনি।'

আর পাঁচ-দশমিনিটের মধ্যেই ইনস্ট্রাক্টর দুজন ঘরে ঢুকে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, 'ও. কে. গাইজ—লেটস গো।'

ওরা পাঁচজন চটপট লাইন দিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘর থেকে রওনা হল।

মনোহর জিশানের ঠিক সামনেই ছিল। সামান্য খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। ও জিশানের দিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা গলায় বলল, 'বহুত ভুখ লাগছে, জিশান ভাইয়া—।'

'আমারও—। তবে চিন্তা নেই, গেস্টহাউসে গিয়েই মহাভোজ পেয়ে যাবে।'

'এর পরের রাউন্ডের আগে আমাদের রেস্ট দেবে তো? আমার পায়ের যা অবস্থা...।'

'নিশ্চয়ই দেবে। কিন্তু পরের রাউন্ডে কী গেম রেখেছে কে জানে।'

'আমি শুনেছি, জিশান ভাইয়া। পরের রাউন্ডের গেমটার নাম "স্নেক লেক"। তার পরে লাস্ট রাউন্ডের "পিট ফাইট"...।'

'স্নেক লেক?'

'হ্যাঁ। জহরিলা সাপে কিলবিল করছে এমন একটা লেকের মধ্যে দিয়ে আমাদের ছুটতে হবে...।'

'লেকের মধ্যে দিয়ে ছুটতে হবে মানে?' জিশান অবাক হয়ে জানতে চাইল। লক্ষ করল, লাইনের বাকি তিনজন গলা বাড়িয়ে ওদের চাপা কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছে।

'লেকে বেশি জল নেই। আধহাঁটু জল। আমি ফকিরচাঁদের কাছে শুনেছি। ওর ভাই আমিরচাঁদ স্নেক লেকে ছুটতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেছে...।'

জিশান আর কোনও কথা বলল না। আজকের কমব্যাট পার্ক রাউন্ডেও হয়তো দু-চারজন মারা গেছে। এই মৃতদেহগুলো কোথায় যায়? সিন্ডিকেট কি এই ডেডবডিগুলো সৎকার করার চেষ্টা করে?

হঠাৎই জিশানের মনে হল, এটা খুবই মামুলি প্রশ্ন। যারা নিয়মিত মনুষ্যত্বের সৎকার করে চলেছে তাদের কাছে ডেডবডির নিয়মিত বন্দোবস্ত করাটা কোনও ব্যাপারই নয়।

আজ রাতে মিনির সঙ্গে কথা বলবে জিশান। প্রাণভরে দশমিনিট ধরে কথা বলবে। বলবে, কীভাবে ও আজ জিতেছে। কীভাবে মানুষ থেকে জানোয়ারের দিকে আরও একধাপ এগিয়েছে। বলবে মনোহর সিং-এর কথাও।

পড়ন্ত বেলায় জিশানরা যখন লাইন করে হেঁটে ফিরছে তখন দেখল পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

জিশানের বুক থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস বেরিয়ে এল। সূর্য ডুবে যাওয়ার ব্যাপারটা ওর ভালো লাগল না।

মাইক্রোভিডিয়োফোনে মিনির ছবি ভেসে উঠতেই জিশান কেমন যেন হয়ে গেল। ওর মনের ভেতর থেকে নিউ সিটির ছবি মিলিয়ে গেল পলকে। ও ভুলে গেল নিউ সিটির 'সিটিজেন'-দের অফুরন্ত ভোগ আর আহ্লাদের কথা, সুপারগেমস কর্পোরেশানের বিপজ্জনক এবং হিংস্র খেলাগুলোর কথা, শ্রীধর পাট্টার কথা, এমনকী কিল গেম-এর কথাও।

ওর মন সিনেমার জাম্প কাটের মতো একলাফে পৌঁছে গেল ওল্ড সিটিতে—ওর সস্তা, ভাঙাচোরা, নোংরা ঘরে। ও মিনির গায়ের গন্ধ পেল। একইসঙ্গে নাকে এল ছোট্ট শানুর হিসি করে ভিজিয়ে দেওয়া প্যান্টের গন্ধও।

'কেমন আছ, মিনি?' ধরা গলায় জানতে চাইল জিশান।

'যেমন থাকা যায়—তোমাকে ছেড়ে।' মিনির চোখে জল এসে গেল।

'শানু কেমন আছে? ওকে একবার দেখাও—।'

'ও তো বাচ্চা, তাই আমার চেয়ে ভালো আছে। একমিনিট ওয়েট করো—ওকে নিয়ে আসছি—।'

একটু পরেই এমভিপিতে শানুকে দেখতে পেল জিশান। ছোট-ছোট জীবন্ত চকচকে চোখ, মুখে হিজিবিজি শব্দের টুকরো, বারবার এমভিপির স্ক্রিনের দিকে থাবা বাড়াচ্ছে।

জিশানের মুখে খুশির ছোঁয়া লাগল। ও অর্থহীন ভাষায় ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল।

শানুকে রেখে এল মিনি। চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না...।'

জিশান বলল, 'মন খারাপ কোরো না। আমি তো এখানে লড়াই করছি.. তোমাকেও ওখানে লড়াই করতে হবে।' কথা বলতে বলতে চোখ মুছল জিশান : 'আজ আমাদের কমব্যাট পার্কে সারপ্রাইজ রাউন্ড ছিল। আমরা পাঁচজন জিতেছি—পঞ্চাশহাজার টাকা করে...।'

'হ্যাঁ—গ্রেট টিভিতে দেখেছি। জন্তুগুলো যা বীভৎস দেখতে—উফ্, ভাবা যায় না।' মিনি শিউরে উঠল।

'মনোহরভাইয়াও জিতেছে। ও ওর প্রাইজ মানি শানুকে গিফ্ট করবে। আমার কোনও বারণ শুনছে না।' বলে মনোহরের সঙ্গে আজ পোস্টগেম কেয়ার বিল্ডিং-এ যা-যা কথা হয়েছে সব জানাল।

জিশানের কাছে মনোহর সিং-এর কথা আগে শুনেছে মিনি। এখন এইসব কথা শোনার পর ওর ঠোঁটে একচিলতে হাসির রেখা ফুটল। ও নরম গলায় বলল, 'জিশান, সিন্ডিকেট দেখছি এখনও তোমাদের পুরোপুরি অমানুষ করতে পারেনি। যার তিনকুলে কেউ নেই—মনোহরদা—তার মধ্যেও দ্যাখো, এখনও কেমন স্নেহ মমতা ভালোবাসা রয়েছে।'

বরাদ্দ দশমিনিট সময় ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। জিশান আজকের সারাদিনের গল্প শোনাতে লাগল মিনিকে। শোনাল ছোট্ট মেয়েটার কথা—যে জিশানদের হাসিমুখে 'টা-টা' করেছিল। জিশান বলল, এর পরের রাউন্ডে স্নেক লেক। আর তারপর ফিট ফাইট। ও ইচ্ছে করেই জাকার কথা চেপে গেল। এখন ওসব শক্ত খবরের কথা মিনিকে বলে ওর দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। যখন মিনি ওসব গেম-এর লাইভ টেলিকাস্ট দেখবে তখন যা দেখার দেখবে।

বাড়ির খবর নেওয়া ছাড়াও পাড়াপড়শিদের খবর নিল জিশান। তারপর দশমিনিটের কোটা শেষ হয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে চাইল।

মিনির চোখে জলের ফোঁটা। সেই অবস্থাতেই পুরোনো কথাটা আবার বলল।

'জিততে তোমাকে হবেই। এখানে আমরা সবাই খুব আশা করে আছি। তবে শুধু জেতা নয়—তুমি জিতলে এই জঘন্য ব্যাপারটা একেবারে বন্ধ করার ব্যবস্থাও করতে হবে তোমাকে। তোমাকেই।'

'পারব কি না জানি না—তবে চেষ্টা তো একবার করবই।' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জিশান। ওর মানিকের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল শিবপদর কথা। কষ্ট করে ঢোঁক গিলল দুবার। তারপর নিচু গলায় মিনিকে বলল, 'এবার আসি। কাল কথা বলব আবার। লাভ য়ু...'

মিনির সঙ্গে কথা শেষ হলে চুপচাপ বিছানায় বসে রইল জিশান। ও চোখ বুজে ভাবতে চাইল যে, ও ওল্ড সিটিতে নিজের ঘরে মিনি আর শানুর কাছে বসে আছে। কিন্তু কয়েকসেকেন্ড পরেই কল্পনার ছবিটা নড়েচড়ে ঘেঁটে গেল। ওর মাথার মধ্যে পরের রাউন্ডের বিপজ্জনক গেমগুলোর কথা ঘুরতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখে একটা বিরক্তির শব্দ করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল জিশান। সামনের ছোট টেবিলে পড়ে থাকা গোল বলের মতো চেহারার রিমোট ইউনিটটা তুলে নিল। বোতাম টিপে ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিল। এখন ওর অন্ধকারে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করছে।

ডিজিটাল ঘড়ির দিকে চোখ গেল জিশানের। রাত বারোটা দশ। অন্ধকার ঘড়িতে শুধু ডিজিটাল অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করছে—পাশে উজ্জ্বল নকল চাঁদের ছবি।

জিশানের আসল চাঁদ দেখতে ইচ্ছে করল। ও উঠে চলে বারান্দায়। রেলিং-এ হাত রেখে আকাশের দিকে তাকাল। প্রাণপণে অস্থির মনটাকে শান্ত করতে চাইল।

কালো আকাশময় ছোট-ছোট তারার ছিটে। মিটমিট করে জ্বলছে। সেই পটভূমিতে তুলির টান দিয়েছে লাল এবং নীল ধূমকেতুর আলো।

হঠাৎই একটা গুটারের আলো চোখে পড়ল জিশানের। গুটার হেডলাইটের

তীব্র সাদা বর্শা সামনের অন্ধকারকে চিরে দিয়ে ছুটে চলেছে। আবছা শিসের শব্দ জিশানের কানে আসছে। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

একই আকাশ ছেয়ে আছে ওল্ড সিটিকে। অথচ আকাশের নীচের ছবিটা কী বিশ্রীভাবে দুরকম। ওল্ড সিটিতে অভাবের অভাব নেই, আর নিউ সিটিতে অভাব খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

কিন্তু অভাব নেই বলেই কি নিউ সিটির স্বভাব বিগড়ে গেছে? অবাক হয়ে ভাবল জিশান। ওর মনে হল, সব মানুষের জীবনেই কিছুটা অভাব জড়িয়ে থাকা ভালো। তা হলে স্বভাবটা বোধহয় আর ততটা খারাপ হবে না।

হঠাৎই একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে এল জিশানের।

বহুদূর থেকে ভেসে আসা শব্দটা শুনে মানুষের কান্না বলেই মনে হল। কিন্তু কে কাঁদছে এত রাতে?

বারান্দার রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাল জিশান। জিপিসি-র গেস্টহাউসের চারপাশটা আলোয় আলো। কিন্তু উনতিরিশ তলার উচ্চতা থেকে নীচের চাতালে কাউকে নজর করাটা সহজ নয়। তবুও কালো ফুটকির মতো একটা মানুষের মাথা দেখতে পেল। কান্নাটা বোধহয় সেদিক থেকেই আসছে।

জিশানের মনে হল, অস্থির মনটাকে শান্ত করতে কোনও একটা কাজ নিয়ে মেতে ওঠা দরকার। কারণ, এখন ওর মনের যা অবস্থা তাতে বিছানায় গিয়ে শুলেও ঘুম আসবে না। তাই কান্নার শব্দটা তলিয়ে দেখাটাকেই ও 'কাজ' হিসেবে বেছে নিল।

ঘরে এসে পোশাক পালটে নিল জিশান। একটা বাদামি রঙের টি-শার্ট আর নীল জিনসের প্যান্ট পরে নিল। মাথার চুলে দুবার চিরুনি চালাল। তারপর সোজা ঘরের বাইরে এসে পা বাড়াল অটো-এলিভেটরের দিকে।

শুনশান করিডর। সামনে-পিছনে তাকালে কাউকে চোখে পড়ে না। শুধু পিস ফোর্সের দুজন গার্ড করিডরের দুটো বাঁকের মুখে বসে আছে। হঠাৎ করে দেখলে ওদের পাথরের মূর্তি বলে ভুল হতে পারে।

জিশানকে দেখে ওরা একচুলও নড়ল না। তাতে জিশান অবাক হল না। কারণ, ওর রেজিস্ট্রেশান কিটের ভেতরে জিপিসি-র 'রুলস অ্যান্ড রেগুলেশানস' এর একটা বই ছিল। তাতে ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলায় গেম্‌স পার্টিসিপান্টস ক্যাম্পাসের সবরকম নিয়মকানুন লেখা ছিল। জিশান সেগুলো পড়ে দেখেছে। তাতে বলা আছে, ডেইলি রুটিনের মধ্যে যে-সময়টা প্রতিযোগীর নিজের—মানে, যখন তার অবসর সময়—তখন সে ক্যাম্পাসের মধ্যে যখন খুশি যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। তবে জিপিসি-র কোনও নিয়ম ভাঙা যাবে না।

হাসি পেয়ে গেল জিশানের। খাঁচার মধ্যে স্বাধীনতা!

সত্যি, সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের কাজকর্ম এত নিখুঁত যে, যেসব

প্রতিযোগী লেখাপড়া জানে না, তাদের জন্য ওরা মাইনে করা লোক রেখেছে। তারা নিয়মিত রুল্‌স অ্যান্ড রেগুলেশান্‌স-এর ক্লাস নেয়। জিপিসি-র নিয়মকানুনের প্রতিটি ধারা বুঝিয়ে দেয়। প্রতিযোগীরা ইচ্ছে করলে সেই ক্লাস করতে পারে। ফলে কোনও প্রতিযোগীই কোনও 'বেআইনি' কাজ করে বলতে পারবে না যে, সে নিয়ম জানত না। শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

অটো-এলিভেটরে ঢুকে পড়ল জিশান। সেখানেও পিস ফোর্সের একজন গার্ড বসে আছে—হাতে নীল রঙের শকার।

গার্ডটা ঝিমোচ্ছিল। জিশান ঢুকতেই নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়া লালা মুছে নিল। শকারের হাতলে হাত রেখে জিশানের দিকে সতর্ক নজরে তাকিয়ে রইল—কিন্তু কোনও কথা বলল না।

জিশান বোতাম টিপতেই এলিভেটর নীচে নামতে শুরু করল।

একটু পরেই গেস্টহাউসের সদর দরজায় পৌঁছে গেল ও। কাঠের ফ্রেমে লোহার গ্রিল আর বুলেটপ্রুফ কাচ দিয়ে তৈরি বিশাল শৌখিন দরজা। পকেট থেকে স্মার্ট কার্ড বের করে দরজার ফ্রেমের পাশে বসানো যন্ত্রে সোয়াইপ করল জিশান। 'বিপ' শব্দ হল। একটা সবুজ এল. ই. ডি. বাতি জ্বলে উঠল। তারপর হাতের চাপ দিতেই দরজার পাল্লা খুলে গেল। এবং ক্লানার শব্দটা জোরালোভাবে শোনা গেল।

শীতাতপের এলাকা ছেড়ে বাইরে বেরোতেই প্রকৃতির উষ্ণ বাতাস জিশানকে জড়িয়ে ধরল। বাতাসে একটা অদ্ভুত গন্ধ পেল জিশান। বোধহয় রাত-ফুলের গন্ধ।

বিল্ডিং-এর বাইরে সাদা মার্বেল বাঁধানো চাতাল। ভেপার ল্যাম্পের আলোয় ঝকঝক করছে। চাতালের দুপাশে সুন্দর বাগান আর ঘাসে ছাওয়া লন। আর মাঝখানে স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু এক বিমূর্ত ভাস্কর্য। তাকে ঘিরে লাল-নীল-হলদে-সবুজ রঙিন জলের ফোয়ারা।

ফোয়ারার রঙিন জলের ধারা এসে পড়ছে পাদদেশের জলাশয়ে। সেখানে সব রং মিলেমিশে তৈরি হয়েছে এক বিচিত্র গাঢ় রঙের জল।

জলাশয়ের চারদিকে প্রায় দু-ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে নানান কারুকাজ করা, আর তাকে ঘিরে ছোট-ছোট মার্বেল পাথরের টবে সুন্দর-সুন্দর গাছ।

কিন্তু জিশান এসব ভালো করে দেখছিল না। ও তাকিয়ে ছিল জলাশয়ের পাঁচিলের ওপরে ভিজে ন্যাকড়ার মতো শিথিলভাবে শুয়ে থাকা লোকটার দিকে।

লোকটা উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। গায়ে নীল হাফশার্ট আর ছাই রঙের প্যান্ট। পায়ের চটি খসে পড়ে আছে মার্বেল পাথরের মেঝেতে। ওর একটা হাত জলাশয়ের জলের ভেতরে ডোবানো, অন্য হাতটা পাঁচিলের এপাশে ঝুলছে। দেখে

হঠাৎ করে মনে হতে পারে ও আর বেঁচে নেই। কিন্তু কান্নার আওয়াজটা জানিয়ে দিচ্ছে ও বেঁচে আছে—অন্তত এখনও।

এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে পিস ফোর্সের দুজন গার্ডকে দেখতে পেল জিশান। ওরা টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোমরে শকার ঝুলছে। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল না যে, সামনে পড়ে থাকা মানুষটার অস্তিত্ব ওরা টের পাচ্ছে।

জিশান গার্ড দুটোর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ফোয়ারার কাছে এগিয়ে গেল। দুটো টবের মাঝে দাঁড়িয়ে লোকটার শরীরটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল।

জিশানের হাতের ছোঁয়া পেয়েই লোকটা কান্না থামিয়ে চট করে উঠে বসল। ঘুরে তাকাল জিশানের দিকে—চোখেমুখে লড়াকু ছাপ। কিন্তু জিশানকে দেখেই ওর ভাবভঙ্গি নরম হল। 'ও—' বলে জলাশয়ের পাড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে অবসন্নভাবে বসে রইল। ওর গলা দিয়ে কান্নার মিহি গোঙানি বেরিয়ে আসতে লাগল। শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

লোকটাকে ভালো করে দেখল জিশান।

লম্বাটে মুখ। পোড়খাওয়া তামাটে রং। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ছোটি কিন্তু চওড়া ভুরু। চোখ দুটো নরম—ভালোবাসার কবিতার মতো। সেই চোখে জল।

লোকটার মুখে আলোছায়ার খেলা। চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত।

'তুমি কাঁদছ কেন?' লোকটার পিঠে হাত রেখে জিশান জিগ্যেস করল।

লোকটা কোনও উত্তর দিল না। এমনকী জিশানের দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

জিশান আবার জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?'

লোকটা এবার কান্না থামাল। দু-হাতে চোখ মুছে জিশানের দিকে তাকাল। ওর চোখে পাগলাটে আভা, চোখের কোণ ভেজা। ভাঙা গলায় পালটা প্রশ্ন করল, 'তোমাকে বলে কী ফায়দা?'

জিশান ওর পাশে বসে পড়ল। বলল, 'তেমন লাভ কিছু হবে কি না জানি না, তবে তোমার দুঃখ একটু কমাতেও পারে...।'

'হুঃ' বলে তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ করল লোকটা : 'দুঃখ কমলেও আমার ভাই তো আর ফিরবে না...।'

'তোমার ভাইয়ের কী হয়েছে?'

'ও মারা গেছে। "স্নেক লেক" গেমটায় নাম দিয়েছিল। সাপের কামড়ে মারা গেছে- ।'

'কবে?'

'আটদিন আগে। দুটো সাপ পায়ে কামড়েছিল।' আবার ফুঁপিয়ে উঠল লোকটা। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নিল : '...আসলে ও রেসটা শেষ করেছিল। সেকেন্ড হয়েছিল। তখনও বুঝতে পারেনি ওকে সাপে কেটেছে।

কয়েকমিনিট পর ছটফট করতে-করতে পড়ে গেল। এদের ডাক্তার নার্স আসতে-আসতেই সব শেষ। ভাইয়া চলে গেল...আমাকে ছেড়ে চলে গেল....।'

জিশান একটু অবাক হল। আটদিন আগে যে-ভাই মারা গেছে তার জন্য লোকটা এখনও হাপুস নয়নে কাঁদছে! সবাই জানে, সুপারগেমস কর্পোরেশনের গেম শো-তে নাম দিলে সাধারণত প্রাণের ঝুঁকি থাকে। ফলে প্রিয়জন হারানোর শোকটা কখনও আচমকা আসে না—তার একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকে। তার ওপর দুঃখের ঘটনাটা ঘটেছে আটদিন আগে। তাই কোথায় যেন একটা খটকা লাগছিল জিশানের।

ও লোকটাকে বলল, 'চলো ভাই, আমরা মেন গেটের কাছে যাই। ওখানে ঘাসের ওপরে বসে একটু গল্প করি। আমিও এখানকার গেম-এ নাম দিয়েছি। টেনশনে ঘুম আসছিল না। তোমার কান্না শুনে নীচে নেমে এলাম। চলো...দুঃখ তো লাইফে থাকবেই...।' কথা বলতে-বলতে জিশান উঠে দাঁড়াল।

লোকটা জিশানের দিকে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে। দু-হাতে ঘষে-ঘষে চোখ মুছল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ওরা পাশাপাশি পা ফেলে মেন গেটের দিকে এগিয়ে চলল। জিশান লোকটাকে নিজের কথা বলতে লাগল। বলল, কীভাবে ও নিউ সিটিতে এসে পৌঁছেছে। কীভাবে ব্ল্যাকমেল করে ওকে কিল গেম-এ নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিজের কাহিনি শেষ করে জিশান জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

লোকটা কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'ফকিরচাঁদ।'

জিশানের মনে পড়ল মনোহরের কথা। আজ বিকেলে 'কমব্যাট পার্ক' থেকে ফেরার সময় মনোহর তা হলে এর কথাই বলছিল।

মেন গেটের দুপাশে সবুজ লন। একটু দূরে সুন্দর জ্যামিতিক কায়দায় সাজানো ঝাউগাছ আর পামগাছ।

এদিকটায় আলো কম। তাই অনেকটা যেন খোলামেলা পার্কের কোমল আবহাওয়া। সবুজ ঘাসের মোলায়েম আসনে বসে জিশানের মনেই হল না ও আর ফকিরচাঁদ আসলে নিউ সিটির 'বন্দি'।

ওরা দুজনে কথা বলতে লাগল।

জিশান লক্ষ করল, মেন গেটের বাইরে দুজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। ওরা জিশানদের দিকে একপলক তাকিয়েই নজর সরিয়ে নিল। মেন গেটের বাইরে না আসা পর্যন্ত ওদের কাছে জিশানদের কোনও গুরুত্ব নেই।

বুক ভরে বাতাসের গন্ধ নিচ্ছিল জিশান। রাতের প্রকৃতিকে দু চোখ ভরে দেখছিল।

ফকিরচাঁদ ওর ভাই আমিরচাঁদের কথা বলছিল।

অভাবের তাড়নায় খারাপ পথে চলে গিয়েছিল আমির। বুড়ো মা-বাপ

আর ছোটবোন জেবার কষ্ট সইতে না পেরে ও নিয়মিত চুরি-ছিনতাই করতে শুরু করেছিল। তারপর একদিন দু-চারজন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে 'স্নেক লেক'-এ নাম দেয়।

ছোটভাইকে দারুণ ভালোবাসত ফকির। তাই ভাইয়ের দেখাদেখি ও-ও নাম দেয় 'হাংরি ডলফিন' গেম-এ। ওরা দু-ভাই একসঙ্গে এই নিউ সিটিতে আসে। কম্পিটিশানের দুটো রাউন্ডে পরপর জিতেও যায় দুজনে। তারপর...তারপর আসে আমিরচাঁদের গেম-এর পালা : স্নেক লেক।

বাঁ-হাতে ঘাসের ওপরে হাত বোলাচ্ছিল ফকিরচাঁদ। কথা বলতে-বলতে কখন যেন ওর গলা ভারি হয়ে গিয়েছিল।

এতক্ষণ ধরে না-করা প্রশ্নটা এইবার উচ্চারণ করল জিশান : '...আটদিন আগে ভাই মারা গেছে...সেজন্যে আজও তুমি কাঁদছ?'

জিশানের দিকে মুখ ফেরাল ফকিরচাঁদ। কয়েকসেকেন্ড অপলকে তাকিয়ে রইল। তারপর ডানহাতে মাথার চুলে আঙুল চালাল। থেমে-থেমে বলল, 'আমি কাঁদছি আমিরের ডেডবডির জন্যে, জিশানভাইয়া...।'

'ডেডবডির জন্যে?' অবাক হয়ে গেল জিশান।

'হ্যাঁ, জিশানভাইয়া। অনেক চেষ্টা করে দুজন সিকিওরিটি গার্ডকে প্রাইজ মানির টাকা থেকে ঘুষ দিয়ে ভাইকে দেখার একটা বন্দোবস্ত করেছিলাম...।' ওরা চোখে পটি বেঁধে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে...ভাইয়ের কাছে...।'

'তার মানে? তোমার ভাই তো মারা গেছে—।'

'হ্যাঁ—মারা গেছে। কিন্তু মারা যাওয়ার পর তো ভাইকে আর আমি দেখিনি—।'

আঙুল দিয়ে চোখের কোণ মুছল ফকিরচাঁদ : 'ভাই মরা ভাইকে ফুল দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু...কিন্তু সেই...সেই কবরস্থানে গিয়ে...যা দেখলাম তাতে মনটা ভেঙে গেল। আমিরচাঁদ যে এত বদনসিব ছিল বুঝতে পারিনি। সে-কথা মনে পড়লেই আমার কান্না পায়।'

হঠাৎই কোথা থেকে দুজন গার্ড এসে হাজির হল জিশানদের সামনে। একজন লম্বা, একজন বেঁটে। লম্বা গার্ডটা ঠান্ডা গলায় বলল, 'অর্ডার এসেছে। তোমরা যার-যার রুমে চলে যাও। এখুনি।'

জিশান হকচকিয়ে গেল। তা হলে কি পার্টিসিপ্যান্টদের অসময়ে কথাবার্তা বলার সময় বাঁধা আছে? নাকি ওরা কোনও ক্যামেরাওয়ালার নজরে পড়ে যাওয়ায় এই দুজন গার্ডের কাছে 'অর্ডার' এসেছে?

জিশান আর ফকিরচাঁদ উঠে দাঁড়াল। জিশান দেখল গার্ড দুজনের দিকে। ভাবলেশহীন পাথরের মুখ। দেখে মনে হয় যন্ত্রেরও অধম। কিন্তু খেলার মাঠে আলাপ হওয়া নাইটিঙ্গলার সেই গার্ড বলেছিল, '...এরা সবকিছু পয়সা দিয়ে

মাপে।' ও হয়ত জিশান বাঁচবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে? ওর হাতে আছে প্রাইজ মানির আঠারো হাজার টাকা। এ ছাড়া মনোহরের কবুল করা পঁচিশ-পঞ্চাশহাজার টাকা।

টাকা খরচ হয় হোক, জিশান ওই কবরস্তানটা একবার দেখতে চায়। আজই না। জিশান ভাবছিল, কম্পিটিশানে 'খরচ' হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে নিয়ে সিন্ডিকেট কী করে? সেটা নিজের চোখে একবার দেখা যায় না?

লম্বা গার্ডটা ফকিরচাঁদকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। ভাঙাচোরা মানুষটা চাপা গলায় কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল।

জিশান আর দেরি করল না। বেঁটে মতন গার্ডটাকে বলল, 'ভাই, কবরস্তানটা আমাকে একবার দেখাতে পারো? আমার কাছে প্রাইজ মানির অনেক টাকা আছে। কাল তোমাকে তার থেকে দশ হাজার টাকা দেব...।'

গার্ডটা জিশানের কবজি ধরতে যাচ্ছিল—থমকে গেল। নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কী বললে? দশহাজার?'

জিশান ওর চোখে লোভের ঝিলিক দেখতে পেল। একইসঙ্গে ওর মুখ থেকে মদের গন্ধ পেল। তাই ঝুঁকি নিয়ে ওর দু-হাত চেপে ধরল। অনুনয় করে বলল, 'ভাই, একটিবারের জন্যে কবরস্তানটা আমাকে দেখাও। দশহাজার দেব। কাউকে বলব না। প্লিজ...।'

গার্ডটা এদিক-ওদিক তাকাল। ওর মুখ দেখে বোঝা গেল ওর ভেতরে লোভের সঙ্গে ভয়ের লড়াই চলছে। শ্রীধর পাট্টাকে সবাই যমের চেয়েও বেশি ভয় পায়।

কয়েকবার ঢোঁক গিলল গার্ডটা। তারপর বলল, 'না, না—উইদাউট পারমিশানে ওখানে যাওয়াটা খুব রিস্কি। তার চেয়ে আমি একটা সাজেশান দিই। তুমি যদি ওই দশহাজার টাকাটা দাও তা হলে পারমিশান করিয়ে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জান লড়িয়ে দেব।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে জিশানের দিকে চেয়ে রইল প্রহরী। জিশান এই প্রস্তাবে রাজি হলে তবেই ও পরের ধাপে এগোবে।

দু-চারসেকেন্ডের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জিশান। বলল, 'তাই হবে। আজ রাতে যদি কবরস্তানটা আমাকে দেখাও তা হলে কাল কালই দশহাজার টাকা তুলে তোমাকে দিয়ে দেব—।'

তখনই জিশান দেখল, ফকিরচাঁদকে পৌঁছে দিয়ে দ্বিতীয় গার্ডটা ফিরে আসছে।

প্রথম গার্ড সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল সঙ্গীর কাছে। দুজনে মিলে কিছুক্ষণ কীসব আলোচনা করল। তারপর প্রথমজন জিশানের কাছে এসে বলল, 'তোমার পার্টিসিপ্যান্ট আই-ডি নাম্বারটা বলো—।'

জিশান বলল।

পকেট থেকে ছোট ওয়্যারলেস সেট মতন কী একটা যন্ত্র বের করে নম্বরটা স্টোর করে নিল গার্ড। তারপর হাতের ইশারা করে বলল, 'তুমি এখানে ওয়েট করো। আমরা জিশানের ব্যাপারটা ট্রাই করতে যাচ্ছি। আমাদের ইন-চার্জকে এ-কথা বলব যে, তোমার এক বন্ধুর কবরে তুমি ফুল দিতে যাবে। যদি পারমিশান পেয়ে যাই তা হলে আমরা জেনারেল স্টোর থেকে সাদা ফুল নিয়ে আসব। চিন্তা কোরো না...আমরা কুড়িমিনিট কি বড়জোর আধঘণ্টার মধ্যে আসছি। তুমি ওয়েট করো। অন্য কোনও গার্ড কিছু জিগ্যেস করলে বলবে, তোমার এখানে ওয়েট করার অর্ডার আছে। ও.কে.?'

জিশান সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে গার্ডটা চলে গেল তার সঙ্গীর কাছে। তারপর নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে ঢুকে পড়ল গেস্টহাউস বিল্ডিং-এর ভেতরে।

জিশান চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ওর মনে হল, ফকিরচাঁদকেও সঙ্গে নিলে হত—যদি অবশ্য অনুমতি পাওয়া যায়।

মিনিটকুড়ি কি পঁচিশ পর গার্ড-দুজন ফিরে এল। ওদের ঠোঁটের হাসি দেখেই জিশান বুঝল, অনুমতি মিলেছে। সেই ধারণাটা নিশ্চিত হল একজনের হাতে একটা সাদা ফুলের তোড়া দেখে।

প্রথমজন নিচু গলায় জিশানকে বলল, 'পারমিশান পাওয়া গেছে। মেন গেট খোলার অথরাইজ্‌ড স্মার্ট কার্ড দিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া একটা কিউ-মোবাইল-এরও ব্যবস্থা করা গেছে। আমাদের সময় দিয়েছে একঘণ্টা।' হাতঘড়ি দেখল : 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেন গেটে একটা কিউ-মোবাইল এসে দাঁড়িয়ে যাবে—।'

দ্বিতীয় গার্ড ফুলের তোড়াটা জিশানের হাতে দিয়ে বলল, 'দশহাজার টাকাটা কাল মনে করে দিয়ো কিন্তু। চাইতে যেন না হয়।'

জিশান বলল, 'দেব। চাইতে হবে না। তবে একটা রিকোয়েস্ট আছে...।'

'আবার কী রিকোয়েস্ট?' রুক্ষভাবে জানতে চাইল দ্বিতীয়।

'ফকিরচাঁদকে নিয়ে এসো। ওকে আমার সঙ্গে নেব। ও ওর মরা ভাইকে যদি দেখতে চায়...।'

গার্ড দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর ওরা ফকিরচাঁদকে সঙ্গে নেওয়া অনেক ঝামেলার বলে জিশানের সঙ্গে রীতিমতো তর্ক জুড়ে দিল। কিন্তু জিশান গোঁ ধরে রইল। এ-কথাও শুনিয়ে দিল যে, দশহাজার টাকা নেহাত কম নয়।

প্রায় পাঁচমিনিট তর্ক-বিতর্কে খরচ হওয়ার পর ওরা নিমরাজি হল। একজন গার্ড জিশানের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, আর-একজন গেল ফকিরচাঁদকে নিয়ে আসতে।

ফকিরচাঁদ এলে ওরা চারজন মেন গেটের দিকে হাঁটা দিল। ফকিরচাঁদকে দেখে ক্লান্ত অবসন্ন মনে হল। ওর হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল ও নেশা করেছে। ও ক্লান্ত গলায় বিড়বিড় করে বলছিল, 'আমিরের ওই ডেডবডি আমি আর দেখতে চাই না...দেখতে চাই না...।'

কেন এই ডেডবডি দেখার আতঙ্ক জিশান বুঝতে পারল না। তা ছাড়া, এতদিন পরও ডেডবডি দেখবে কেমন করে?

মেন গেটে পৌঁছে একজন গার্ড স্লটে স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করল। যন্ত্রে 'বিপ' শব্দ হল। সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। হাতের চাপ দিতেই কম্পাউন্ডের গেট খুলে গেল। জিশানরা বেরিয়ে এল গেস্টহাউস বিল্ডিং-এর বাইরে।

গেটের বাইরে মোতায়েন থাকা দুজন গার্ড এতটুকুও বিচলিত হল না। ওরা জানে, অথরাইজড স্মার্ট কার্ড ছাড়া মেন গেট খুলবে না।

জিশানরা বাইরে এসে দাঁড়ানোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অদ্ভুত ধাঁচের গাড়ি ওদের কাছে এসে থামল। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দটা মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শোনাল।

জিশান গাড়িটাকে ভালো করে দেখল। মেন গেটের জোরালো বাতির রোশনাই গাড়িটার স্টেইনলেস স্টিল বডিতে পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে। গাড়ির বনেটের ওপরে গাঢ় নীল রঙে সিন্ডিকেটের লোগো আঁকা।

গাড়িটার আকৃতি অনেকটা কম্পিউটারের মাউসের মতো। তবে সামনের দিকটা ছুঁচলো। গতিবেগ বাড়ানোর জন্য আধুনিক এরোডায়নামিক ডিজাইনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গাড়ির দুপাশে হাঙরের কানকোর মতো ভেন্টিলেটর। আর ছাদের দুপাশে দুটো খাটো অ্যানটেনা লাগানো।

হঠাৎই গাড়িটার চারটে দরজা পাখির ডানার মতো খুলে গেল—উঠে গেল ওপরের দিকে। একজন গার্ডের নির্দেশে ওরা বসে পড়ল গাড়িতে।

এরকম গাড়ি নিউ সিটির রাস্তায় আগেও দেখেছে জিশান। তবে কখনও তার দরজা খুলতে দেখেনি। এ-গাড়ির নাম কেন কিউ-মোবাইল সেটা ওর মাথায় ঢুকল না।

গাড়ির পাইলট কী একটা বোতাম টিপতেই চারটে দরজা নেমে এল। 'ক্লিক' শব্দ করে লক হয়ে গেল। এবং কিউ-মোবাইল চলতে শুরু করল।

জিশান আর ফকিরচাঁদ পিছনের সিটে বসেছিল। আর গার্ড দুজন বসেছিল পাইলটের পাশে। গাড়ি চলা শুরু করতেই একজন গার্ড পাইলটকে বলল, 'আমরা নেক্রোসিটি যাব...।'

'ও. কে.।' মাথা নেড়ে বলল পাইলট। একইসঙ্গে ড্যাশবোর্ডের টাচস্ক্রিনের কয়েকটা উজ্জ্বল আইকনে আঙুল ছোঁয়াল।

কিউ-মোবাইল যে সঙ্গে-সঙ্গে একটা বাঁক নিল সেটা বেশ টের পেল

জিশান। ও গাড়ির জানলার কাচ ভেদ করে বাইরে তাকাল।

সুন্দর মসৃণ রাস্তা। কোথাও কোনও খানাখন্দ নেই। যেন একটা ইস্পাতের কালো ফিতে সযত্নে বিছানো রয়েছে।

ওল্ড সিটি ওরফে ডেড সিটির কথা মনে পড়ল জিশানের। সেখানকার সব পথঘাটই ভাঙাচোরা গর্তে ভরা। অথবা বলা যায় পুরোটাই খানাখন্দ—তার মধ্যে কোথাও কোথাও রাস্তা। জিশান স্বপ্ন দ্যাখে সেই গুটিবসন্তে ভরা রাস্তা একদিন ঝকঝকে মোলায়েম হবে। তার ওপর দিয়ে এতটুকুও শব্দ না করে ছুটে যাবে শানুর ঝকঝকে গাড়ি।

বিষণ্ণ হাসল জিশান। স্বপ্ন দেখার অসুখ ওর এখনও গেল না। কিন্তু যাবেই বা কেন? দুঃখ কষ্ট আছে বলে কি স্বপ্ন থাকবে না?

হঠাৎই ফকিরচাঁদ ওর হাত চেপে ধরাতে জিশানের চটকা ভাঙল।

'নেক্রোসিটিতে আমি যাব না, জিশানভাইয়া।'

মুখ ফেরাল জিশান। দেখল, ফকিরের চোখে জল।

'কেন, যাবে না কেন?'

'আমার ভাইয়ের ওই হেনস্থা সহ্য করা যায় না। ওঃ...।'

জিশান কিছু একটা জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সামনের সিট থেকে একজন গার্ড বলে উঠল, 'আমরা নেক্রোসিটিতে এসে গেছি—।'

প্রায় একইসঙ্গে কিউ-মোবাইল থেমে গেল। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনে তাকাল জিশান। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ওর চোখ আটকে গেল।

সামনেই গোটা পথ জুড়ে এক বিশাল তোরণ। তার চেহারা ওলটানো 'W' অক্ষরের মতো। তোরণের সর্বত্র নীল রঙের আলোকসজ্জা। আর মাথার ওপরে নীল রঙের নিওন সাইনে বড় বড় করে লেখা 'ওয়েলকাম টু নেক্রোসিটি'। তার ঠিক নীচে ছোট হরফে লেখা আছে : 'নো এন্ট্রি উইদাউট ভ্যালিড অথরাইজেশান।'

রাস্তাটা তোরণ পেরিয়ে সোজা চলে গেছে। তবে তোরণ পেরোনোমাত্রই রাস্তার দুপাশের আলোর রং সাদার বদলে নীল হয়ে গেছে। এবং সামনে যতদূর চোখ যায়, যতগুলো আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে, সবগুলোর রংই নীল।

নীলনগরী। মনে-মনে ভাবল জিশান। মৃত্যুর প্রতীকী রং নীল—হয়তো সেইজন্যেই নেক্রোসিটি নীল আলোয় সাজানো।

একজন গার্ডের নির্দেশে পাইলট কিউ-মোবাইলের দরজা খুলল। দরজা খুলতেই একজন গার্ড নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। জিশানদের লক্ষ করে বলল, 'তোমরা গাড়িতেই বোসো। আমি সিকিওরিটি গার্ডদের সঙ্গে কথা বলে কার্ড টেনে আসছি—।'

জিশান দেখল, তোরণের একপাশে একটা ছোট মাপের ঘর—সিকিওরিটি

ইল। এবং কবরেস্থানটের মধ্যেই পৌঁছে গেল আসল জায়গায়।

কিউ-মোবাইলের দরজা খুলে গেল। গার্ডদের নির্দেশে জিশান আর ফকি পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে নাম-না-জানা কোনও ফুলের এক মনোরম সুগ নের মন-প্রাণ ভরিয়ে দিল। আর চোখের সামনে যে-দৃশ্য ও দেখল, সেটা জুড়িয়ে দেওয়ার মতো।

ফকিরচাঁদ জিশানের বাহু আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। ত চোখ মেলে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। বোঝা গেল, এ-দৃশ্য আগে ও দেখেনি

জিশানের সামনে এক অন্ধকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেই অন্ধকারে হাজার র মোমবাতি উজ্জ্বল নীল শিখায় জ্বলছে। মোমবাতির মায়াময় নীল আলে সুগন্ধী বাতাস জিশানকে মুগ্ধ করে দিল, স্তব্ধ করে দিল।

একজন প্রহরী জিশানের হাত ধরে টান মারল। বলল, 'চলো, ভেতর —নেক্রোসিটি দেখে তোমার দশহাজার টাকা উশুল করো...।'

ওরা চারজন আলোকমালার দিকে এগিয়ে চলল। জিশান তখনও বুঝ ছিল না ফকিরচাঁদ কেন অকারণে কাঁদছে।

বেঁটে গার্ডটি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল—বোধহয় কিছু বলতে ছিল। ও ওর সঙ্গীর সঙ্গে চাপা গলায় কিছু পরামর্শ করে তারপর হঠাৎ ।, 'এখানে চ্যালেঞ্জ গেম খেলতে এসে যে ক'জন পার্টিসিপ্যান্ট মারা গেছে র মাথাপিছু একটা করে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে।'

জিশান একটা ধাক্কা খেল। এত মোমবাতি! এত পার্টিসিপ্যান্ট মারা গেছে ন! ভাবা যায় না।

চারপাশে দেখল গার্ডটি। তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকে করল। চাপা হেসে বলল, 'উফ, "নো স্মোকিং" নিয়মের ঠেলায় দম আটকে যাওয়ার জোগাড়। সিগারেট খাওয়া বারণ তো সিগারেট বিক্রি বন্ধ কর তা না, ওদিক থেকেও ট্যাক্সের পয়সা লুটবে আর আমাদেরও প্রাণ বাঁ । ওই শ্রীধর পাট্টা—সালা শুয়োরের বাচ্চা—যত নষ্টের গোড়া...।'

জিশান তাজ্জব হয়ে গেল। এসব কী শুনছে ও! শ্রীধর পাট্টার নামে এ রোয়া গালাগাল! নেশার ঘোরে আসল কথাগুলো কি বেরিয়ে আসছে?

গার্ডটির লম্বা সঙ্গী প্রায় ছুটে গিয়ে ওর মুখে হাত চাপা দিল ব কী বলছিস তুই! চুপ—চুপ! কেউ শুনতে পেলেই কেলেঙ্কারি হবে —।'

এক ঝটকায় সঙ্গীর হাত সরিয়ে দিয়ে বেঁটে গার্ডটি বলল, 'ছাড় তো কেলেঙ্কারির নিকুচি করেছে। এরা হাজার-হাজার লোককে কোত

করে মোমবাতি জ্বেলে দিল—তাতে কিছু না—আর আমি দুটো সত্যি কথা বললেই দোষ!'

চৌকশ গেস্তার প্যাকেটে সিগারেটটা কয়েকবার ঠুকে ঠোঁটে ঝোলাল গার্ড ছোট্ট ইলেকট্রিক লাইটার বের করে সিগারেট ধরাল। তারপর প্যাকেটটা সামনে বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, 'আর কেউ ধরাবে?'

ফকিরচাঁদ মাথা নাড়ল : 'না।'

দ্বিতীয় গার্ড কিছু বলল না।

জিশান বলল, 'না। ধন্যবাদ। তবে...' একটু ভেবে আরও যোগ করল : 'এখানে...মানে, এই কবরস্থানে...সিগারেট খাওয়াটা ঠিক নয়...।'

এ-কথা শুনে প্রথম গার্ডের কী হাসি। হাসতে-হাসতে পেটে হাত চেপে ঝুঁকে পড়ল ও। হাসতেই লাগল।

সঙ্গীর এই পাগলামি দেখে দ্বিতীয় ভয়ে-ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। পিস ফোর্সের কেউ এসব কথা শুনছে না তো—এসব কাণ্ড দেখে ফেলছে না তো!

হাসির দমক থামিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটে কষে টান দিল প্রথম। জিশানের গায়ে তাচ্ছিল্যের ঠেলা মেরে বলল, 'কে বলেছে এটা কবরস্থান? কে বলেছে এইসব মোমবাতির নীচে ডেডবডি আছে? সব ঢপের কেত্তন। ওগুলো সব ফল্‌স। আসল ডেডবডি আছে এই নকল লোকদেখানো কবরস্থানের পেছনে। সেখানে একটা ডেডবডির ডোবা আছে। জল-টল কিছু নেই—শুধু পচা-গলা ডেডবডি। সেগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে হায়েনা, শেয়াল, নেকড়ে আর শকুন।'

ফকিরচাঁদ ডুকরে কেঁদে উঠল। জিশানের একটা হাত আঁকড়ে ধরল। ওর দেহটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

প্রথম তখন সিগারেটে ঘন-ঘন টান নিচ্ছে। মাথা নাড়তে-নাড়তে ও বলল, 'চাকরির সারাক্ষণই তো শ্রীধর পাট্টার ভয়ে চুপ করে থাকি। কত আর চুপ করে থাকব?' জিশানের বুকে আঙুল ঠুকে বলল, 'তোমার কাছ থেকে যখন ঘুষ কবুল করেছি তখন তার এক্সট্রা সার্ভিস দেব, নেক্রোপলিসিটির সব কেলো ফাঁস করব...।'

সারি-সারি মোমবাতির মাঝখান দিয়ে সরু হাঁটা পথ। জিশান আর ফকিরকে মাঝখানে রেখে নিয়ে গার্ড দুজন হেঁটে চলল। জিশান অবাক হয়ে মোমবাতির নীল শিখাগুলো দেখছিল। এই বিচিত্র মোমবাতি এরা পেল কোথায়? সে-কথাই ও জিগ্যেস করল প্রথমকে।

সিগারেটে জোরে টান দিয়ে প্রথম বলল, 'কোথায় আর পাবে! হয় বিদেশ থেকে আনিয়েছে, নয়তো এই নিউ সিটিতেই তৈরি করেছে।' সিগারেটটা ছোট হয়ে এসেছিল। সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গার্ড বলল, 'এই যে নাকে মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ এটা কেমিক্যাল তৈরি। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা স্প্রেয়ারের নল থেকে স্প্রে

করা হচ্ছে। বাইরে থেকে যখন নামিদামি লোকজন নিউ সিটি ভিজিট করতে আসে তখন এইসব ব্যবস্থা দেখে ওদের মাথা ঘুরে যায়। ভাবে, মারা যাওয়া মানুষগুলোর জন্যে সরকারের কত না দরদ, কত না শ্রদ্ধা! হুঃ। আসল কাণ্ড তো আছে পেছনদিকটায়। বাইরের কাউকে ওদিকটায় নিয়ে যাওয়া বারণ। তুমি টাকা দেবে বলেছে, তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি...।'

কবরস্তানের নানান জায়গায় বড়-বড় গাছ লাগানো। আবছা আলোয় সেই অন্ধকার গাছগুলোকে অপার্থিব দানব মনে হচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে জোনাকির ঝাঁক দেখতে পেল জিশান। চলে বেড়ানো নীল আলোর ফুটকি।

ফকিরচাঁদ জিশানের পাশে-পাশে হাঁটছিল। ওর গা থেকে ঘামের গন্ধ পাচ্ছিল জিশান। সেইসঙ্গে শোকের গন্ধও।

প্রথমের কথার খেই ধরে দ্বিতীয় গার্ড জিশানকে বলল, 'তোমার হয়তো মনে হচ্ছে...আমরা তোমার কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছি...আমরা দুজন ঘুষখোর। আসলে ব্যাপার কী জানো...' অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল দ্বিতীয়ঃ 'এই নিউ সিটিতে ওপরমহলেই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি। ওই শ্রীধর পাট্টা...আমাদের মার্শাল...ওটাই সবচেয়ে বড় হারামজাদা। নেক্রোসিটির আইডিয়াটা ওরই। রেগুলার এত লোক গেম সিটিতে এসে মারা যাচ্ছে...এত ডেডবডির গতি হবে কী করে! কে রোজ এত ডেডবডি কবর দেবে? কে-ই বা দাহ করবে? তার চেয়ে অনেক ভালো...।'

দ্বিতীয় গার্ডের কথা শেষ হল না—ওদের কানে এল হিংস্র গর্জন।

জিশানের খেয়াল ছিল না, কথায়-কথায় ওরা কখন যেন মোমবাতির মিছিল পেরিয়ে গেছে। এখন ওরা এসে পড়েছে এক গাঢ় অন্ধকার এলাকায়।

প্রথমজন একটা টর্চ বের করে আলো জ্বালল। সেই আলোয় পথ দেখে-দেখে ওরা এগোতে লাগল।

হঠাৎই অন্ধকার ফুঁড়ে দুজন গার্ড আচমকা ওদের সামনে হাজির হল। ওদের হাতে বাগিয়ে ধরা অদ্ভুত ধরনের খাটো পিস্তল। ওদের একজন কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'এখানে এসেছ কেন বলো। অথরাইজেশান প্রোটোকলের জন্যে সময় দিলাম দশসেকেন্ড...।'

জিশানদের সঙ্গী দ্বিতীয় গার্ড চটপট স্মার্ট কার্ড বের করে দেখাল। বলল, 'স্পেশাল পারমিশান আছে...।'

দুটো পিস্তলই খাপে ঢুকে গেল। গার্ড দুজন জিশানদের সঙ্গে এগোল।

হিংস্র গর্জন আরও জোরালোভাবে শোনা যাচ্ছিল। সেইসঙ্গে একটা বিকট পচা গন্ধ এসে ওদের নাকে ঝাপটা মারল। ফকিরচাঁদ শিউরে উঠে 'ওয়াক' শব্দ তুলল। জিশান নাক টিপে দম বন্ধ করে গন্ধটা সামাল দিতে চাইল।

আর কয়েক পা এগোতেই ওরা দেখল সামনে একটা লোহার জালের বেড়া। বেড়ার মাঝে একটা ইস্পাতের দরজা।

জিশানদের পাহারাদার গার্ড দুজনের একজন একটা রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে বোতাম টিপল।

ইস্পাতের দরজায় দুটো সবুজ আলো জ্বলে উঠল এবং দরজা খুলে গেল।

রিমোট ইউনিটটা পকেটে রেখে গার্ড বলল, 'ভেতরে ঢুকে পাঁচটা স্টেপের বেশি এগোবে না। তখনই আমরা আলো জ্বেলে দেব—।'

জিশানরা এগোল।

ফকিরচাঁদ ভাঙা গলায় জিশানকে বলল, 'জিশানভাইয়া, এবার আমি চিনতে পেরেছি। আমাকে ওরা চোখ বেঁধে এখানেই নিয়ে এসেছিল। দুজন ডেডবডি হ্যান্ডলার আমিরচাঁদের বডিটা খুঁজে বের করে দিয়েছিল। সেটার যা অবস্থা দেখেছি...' ফুঁপিয়ে উঠল ফকিরচাঁদ : 'বাঁ-কানের একটা দুল দেখে ওকে চিনতে পেরেছিলাম। ওর নাক-চোখ কিছু ছিল না...সব খোবলানো। ফুলের তোড়াটা আমি ছুড়ে দিয়েছিলাম আমিরের দিকে...' দু-হাতে চোখ মুছে ফকির বলল, 'ও আটদিন আগে সাপের কামড়ে মারা গেছে। সে-দুঃখ যা পেয়েছি, পেয়েছি। কিন্তু ওর ডেডবডিটার কথা মনে পড়লেই আমার সবসময় কান্না পায়, জিশানভাইয়া। নিজেকে আমি আর রুখতে পারি না।'

জিশানরা ইস্পাতের দরজা পেরোনোর সময় ফকিরচাঁদ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'আমি এখানেই থাকব—ভেতরে আর যাব না।'

জিশান ওর করুণ মুখের দিকে একবার দেখল শুধু—কিছু বলল না। তারপর সামনে এগোল। কারণ, যতই বীভৎস দৃশ্য সামনে থাক জিশানকে দেখতেই হবে। যতই কটু দুর্গন্ধ ওর নাকে এসে ঝাপটা মারুক ওকে সেটা উপেক্ষা করতেই হবে। জিশান যদি স্নেক লেক, পিট ফাইট কিংবা কিল গেম-এ হেরে যায়, মারা যায়, তা হলে ওর যেখানে ঠাঁই হবে সেই জায়গাটা জিশান দেখতে [illegible] অনুভব করতে চায়।

[illegible]হাউস থেকে আসা গার্ড দুজনও ইস্পাতের দরজা পেরিয়ে আর এগোল না। নাকে-মুখে হাত চাপা দিয়ে জিশানকে ইশারা করল এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

জিশান কাঁধ ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল সামনে। চার পা এগিয়েই ও থমকে দাঁড়াল। আর ঠিক তখনই ওর সামনের জায়গাটা আলোর বন্যায় ভেসে গেল। উজ্জ্বল আলোয় জিশানের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

সামনে যে-দৃশ্য ও দেখল তাকে এককথায় মর্মান্তিক ছাড়া আর কী বলা যায় জিশান জানে না।

একটা বিশাল পুকুরের কিনারায় জিশান দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুকুরটার পাড় কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো। পুকুরে জল নেই। শুধু নগ্ন মানুষের মৃতদেহে পুকুরের অর্ধেকটা ভরতি। সেইসব মৃতদেহের বেশিরভাগই পচা-গলা। টুকরো-টুকরো হাত

পা, কিংবা মাথা এখানে-সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। তার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নেকড়ে, হায়েনা, শেয়ালের দল। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছে। কখনও-কখনও হিংস্র গর্জন করে উঠছে। চোয়ালে চোয়াল ঠোকার 'খটাস' শব্দ হচ্ছে। এ ছাড়া শকুনের পাল জটলা করে আছে নানান জায়গায়।

ওরা সবাই মিলে নরমাংস নিয়ে মহোৎসবে মেতে আছে।

চড়া আলোয় ঝকঝকে নোংরা দৃশ্যটা জিশানকে কাঁপিয়ে দিল। ও দেখল, পুকুরের ওপাশটায় গভীর জঙ্গল শুরু হয়েছে। ক্ষুধার্ত বন্যপ্রাণীগুলো সেই জঙ্গল থেকে আসা-যাওয়া করছে। ওরা জানে, এই পুকুরে নিয়মিত মহাভোজের ব্যবস্থা রাখা আছে ওদের জন্য।

জিশান নাক-মুখ চেপে অনেকক্ষণ ধরে দৃশ্যটা সহ্য করছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর পারল না। সাদা ফুলের তোড়াটা ওর হাত থেকে খসে পড়ে গেল। কয়েকবার 'ওয়াক' তুলে ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল কংক্রিটের মেঝেতে। দু-হাতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল। প্রবল হেঁচকি তুলে বিকট শব্দে বমি করতে শুরু করল। সেই শব্দগুলো জিশানের কানে জন্তুর ডাকের মতো শোনাল।

জিশানের মনে হল, এই জঘন্য ভয়ংকর জায়গায় কিছুতেই ও আসতে চায় না। মৃতদেহ হিসেবেও নয়।

সুতরাং এখানে না আসার জন্য ওকে দাঁত-নখ দিয়ে ভয়ংকর লড়াই করতে হবে।

বমির দমক শেষ হলে কয়েকবার থুতু ফেলল জিশান। মুখের ভেতরটা টক হয়ে গেছে। কিছুটা তেতোও। শ্রীধর পাট্টার কথা মনে পড়ল ওর। সুট-বুট পরা কেউটে সাপ। এখানে হাজির থাকলে নিশ্চয়ই ছড়া কেটে বলতেন, 'এই যে বাবু জিশান। এই হল আমাদের শ্মশান।'

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল জিশান। চারপাশের কটু গন্ধটা এতক্ষণে নাকে অনেকটা সয়ে এসেছে। যা দেখার ছিল তা দেখা হয়ে গেছে। এবার ফিরতে হবে। তারপর...ক'দিন পর...স্নেক লেক।

জিশানের ভেতরে হঠাৎই যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই গেমটায় ও কোয়ালিফাই করবেই। করতে ওকে হবেই।

ও টের পেল, স্নেক লেক গেমটার মোকাবিলার জন্য ও কোন ম্যাজিকে যেন চনমনে হয়ে উঠল।

নিয়মমাফিক পার্টিসিপ্যান্টদের স্নেক লেক গেম-এর কম্পিউটার সিমুলেশান দেখানো হল।

কমব্যাট পার্কের মতো এখানেও গেম সাইটের কাছাকাছি গেম কন্ট্রোল রুম বিল্ডিং। সেই বিল্ডিং-এর এয়ারকন্ডিশন্‌ড হলে বসে জিশানরা স্নেক লেক গেম-এর সিমুলেশানটা দেখল।

অগভীর জলের বিস্তীর্ণ আয়তাকার পুকুর। মাপ একশো মিটার বাই তিরিশ মিটার। সেই পুকুরে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে ছোট-বড় নানান বিষধর সাপ। সাপগুলো ঠিক কী-কী ধরনের সেগুলো ছবিসমেত বোঝানো হচ্ছিল। সাপগুলোর চলাফেরা, আচরণ, শিকার ধরা বিশদভাবে বোঝানো হচ্ছিল। তিনজন সাপবিশেষজ্ঞ পালা করে সবকিছু ব্যাখ্যা করছিলেন। সাপগুলোর বিষগ্রন্থি, তাদের বিষদাঁতের মাপ ও আকার, বিষের তেজ, ছোবল মারার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অত্যন্ত যত্ন আর নিষ্ঠা নিয়ে বোঝাচ্ছিলেন তাঁরা। এবং তারই মাঝে-মাঝে জাম্প কাট করে গেম-এর সিমুলেশানটা দেখানো হচ্ছিল।

জিশানের মনে হল, সাপ নিয়ে কোনও তথ্যচিত্র দেখেও বোধহয় ব্যাপারটা এত ভালো করে বোঝা যেত না।

বিষধর সাপের তালিকায় সাতরকমের সামুদ্রিক সাপের নাম ও ছবি দেখানো হল। সাঁতার কাটার সুবিধের জন্য প্রকৃতি ওদের লেজের দিকটা আচমকা চ্যাপটা করে দিয়েছে—অনেকটা মাছের লেজের মতো। একইসঙ্গে জিশানদের জানানো হল, প্রায় সব সামুদ্রিক সাপই মারাত্মকরকম বিষধর।

সিমুলেশান শেষ হওয়ার পর মিনিটপাঁচেক ধরে চলল প্রশ্নোত্তরের পালা। জানানো হল যে, এই গেম-এর সারভাইভাল ফ্যাক্টর 0.36।

সবশেষে গেম ইনস্ট্রাকটর ঘোষণা করলেন, এই খেলায় প্রাইজ মানি চল্লিশহাজার টাকা।

জিশান ভাবছিল, এরপর বোধহয় ওদের বিল্ডিং-এর বাইরে বেরোতে হবে। সার বেঁধে হাঁটা দিতে হবে স্নেক লেকের দিকে। কিন্তু অডিয়ো সিস্টেমে শোনা গেল একটি বিশেষ ঘোষণা : 'পার্টিসিপ্যান্টদের এবারে "ভেনম হাউস" দেখানো হবে। যেহেতু আসল গেম-এর সময় সাপগুলো থাকবে ঘোলাজলের আড়ালে, সেহেতু পার্টিসিপ্যান্টরা সাপগুলোকে দেখতে পাবে না। তাই "ভেনম হাউস"-এ সেই প্রজাতির সাপগুলো কাচের বাক্সে রাখা আছে—যাতে খেলায় নামার আগে তারা সাপগুলোকে ভালো করে দেখে নিতে পারে। "ভেনম হাউস" রয়েছে এই বিল্ডিং-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে...নর্থ-ইস্ট কর্নারে।

'নাউ স্টার্ট। হলের দরজায় "ভেনম হাউস"-এর গাইড আপনাদের জন্যে ওয়েট করছে। "ভেনম হাউস" দেখার জন্যে আপনাদের সময় দেওয়া হল তিরিশমিনিট। তার মানে, কাঁটায়-কাঁটায় এগারোটায় আমরা এই গেম কন্ট্রোল বিল্ডিং-এর মেন গেটে জড়ো হব। তারপর স্টার্ট দেব স্নেক লেকের দিকে। ও. কে., প্রসিড গাইজ...।'

জিশানরা সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হলের দরজার দিকে এগোল।

সেখানে একজন গাইড আর পিস ফোর্সের দুজন গার্ড ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গাইডের গায়ে নীল রঙের স্লিভলেস জ্যাকেট। জ্যাকেটের বুকের দিকটায় প্যাঁচানো একটা সাপের ছবি—ফণা তুলে আছে। আর জ্যাকেটের পিঠের দিকে সাদা ইংরেজি হরফে লেখা 'ভেনম হাউস'।

গাইডকে অনুসরণ করে জিশানরা সার বেঁধে এগোল। চোরা-দৃষ্টিতে সারির সামনে-পিছনে তাকিয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যাটা গুনে নিল জিশান। মোট ষোলোজন। তার মধ্যে মনোহর সিং-ও আছে।

প্রায় পনেরো সেকেন্ড হেঁটে কয়েকটা করিডর বদল করে ওরা 'ভেনম হাউস'-এ পৌঁছে গেল।

সহজ কথায় বলতে গেলে ব্যাপারটা সাপের চিড়িয়াখানা। আধুনিক ছাঁদে সাজানো বিশাল মাপের ঘর। ঘরের চারদেওয়ালে নানান মাপের কাচের বাক্স। নেমপ্লেট লাগানো সেইসব বাক্সে রাখা আছে জীবন্ত সাপ। যে-সাপগুলো একটু আগেই জিশানরা তথ্যচিত্রে দেখে এসেছে।

কী সাপ নেই এখানে। কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, শাখামুটি থেকে শুরু করে ব্ল্যাক মাম্বা, ঝুমঝুমি সাপ পর্যন্ত সবই হাজির।

এই সাপগুলোর পাশেই সার বেঁধে রাখা আছে অ্যাকোয়ারিয়াম। তার মধ্যে রয়েছে সমুদ্রের সাপ। একটা সাপের নাম পড়ল জিশান—অলিভ সি স্নেক। সেই নামের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা Alpysurus laevis।

জিশানের গা-টা কেমন শিউরে উঠল। মনে হল, সাপগুলো ওর পোশাকের নীচে কিলবিল করছে।

গাইড তখন মেগাফোনে ভরাট গলায় বলছে, '...এই সাপগুলোই থাকবে ওই লেকের জলের ভেতরে। আপনারা ভালো করে দেখে নিন কী-কী ধরনের সাপের কামড় আপনাদের বাঁচিয়ে চলতে হবে। অবশ্য রেসের ফিনিশ লাইনের পর এক্সপার্ট মেডিক্যাল ইউনিট হাজির থাকবে। ওরা সাপের কামড় খাওয়া পার্টিসিপ্যান্টদের দেখভাল করবে।'

কাচের বাক্সের ভেতরে সাপগুলো অলসভাবে নড়াচড়া করছিল। আর কতকগুলো সাপ অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে সাঁতার কাটছিল। ওদের আকর্ষণীয় রং মুগ্ধ হয়ে দেখছিল জিশান। আর একইসঙ্গে ভাবছিল, ওই বিচিত্র রঙের আড়ালে রয়েছে মারাত্মক বিষ।

জিশান চোয়াল শক্ত করল। গত কয়েকদিন ধরে বালির ওপরে দৌড় আর জলের ওপরে দৌড় ও কম প্র্যাকটিস করেনি। আজ আসল পরীক্ষায় বোঝা যাবে ওর প্র্যাকটিস ঠিকমতো হয়েছে কি না।

'ভেনম হাউস' দেখা শেষ করে এগারোটার দু-মিনিট আগেই গেম কন্ট্রোল

বিল্ডিং-এর মেন গেটে ওরা সবাই এসে জড়ো হল। তারপর ঠিক এগারোটা পাঁচে সার বেঁধে হাঁটা দিল স্নেক লেক-এর দিকে। ওদের ষোলোজনকে আগলে নিয়ে চলল চারজন গার্ড। তার মধ্যে সেই বেঁটেমতন গার্ডটাকে দেখতে পেল জিশান। ওর হাতেই ও ঘুষের দশহাজার টাকা তুলে দিয়েছিল।

গার্ডটার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও ছোট্ট করে হাসল। তারপর চোখের ইশারায় বলতে চাইল যে, পরে জিশানের সঙ্গে ও কথা বলবে।

আজ সকালে সূর্য নিয়মমতোই উঠেছে। সোনা রোদে ভরিয়ে দিয়েছে চারিদিক। গাছপালায় সারারাত ঘুমিয়ে থাকা পাখিরা ভোর হতেই বেরিয়ে পড়েছে খাবারের খোঁজে। সকালে ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেইসব পাখিদের দেখছিল জিশান। দেখতে-দেখতে মনখারাপ হয়ে যাচ্ছিল। পাখিরা কত স্বাধীন। ওদের কাছে ওল্ড সিটি আর নিউ সিটির মাঝে কোনও বাধা নেই। পাখি হলে ও এখুনি উড়ে চলে যেত মিনি আর শানুর কাছে। কে জানে, আজ রাতে ও মিনির সঙ্গে কথা বলতে পারবে কি না। স্নেক লেক গেম-এর সাপের ছোবল বাঁচিয়ে ও কি আজ গেস্টহাউসে ফিরতে পারবে?

মন-প্রাণ দিয়ে রোদের তাপ নিচ্ছিল জিশান। কে জানে, কাল যদি আর সূর্যের সঙ্গে ওর দেখা না হয়। সেইজন্যই হয়তো চারপাশের দৃশ্যটাকে ও ব্লটিং পেপারের মতো হৃদয়ে শুষে নিতে চাইছিল।

ওদের চলার পথের পাশ দিয়ে চলে গেছে মসৃণ রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে ছুটে যাচ্ছে কিউ-মোবাইল আর গেমস্‌ মোবাইল। রাস্তার দুপাশে ফুলের বাগান, লন। এ ছাড়া কোথাও-কোথাও আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ গাছের সারি। তাদের ফাঁকে ফাঁকে ছবির মতো আঁকা নীল আকাশের টুকরো। দেখে বোঝাই যায় না, এসবের আড়ালে চলেছে প্রাণ নিয়ে খেলা।

কখন যে বেঁটেমতন গার্ডটি জিশানের পাশাপাশি এসে পড়েছে জিশান খেয়ালই করেনি।

জিশানের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কেমন আছ?'

জিশান সামনের দিকে চোখ রেখে পথ চলতে-চলতে ছোট্ট করে বলল, 'ভালো।'

'আমি জানতাম আজ তোমার স্নেক লেক আছে। আমাদের কোনও গেম-এ ডিউটি দেওয়ার সময় পার্টিসিপ্যান্টদের আই-ডি নাম্বারের লিস্ট দিয়ে দেয়। কবরস্থানে তোমাদের নিয়ে যাওয়ার পারমিশান করানোর সময় তোমার আই-ডি নাম্বার নিয়েছিলাম মনে আছে?'

জিশান মাথা নাড়ল : 'হ্যাঁ, মনে আছে—।'

'তোমার নাম্বারটায় লাস্টে পরপর তিনটে ফোর ছিল। সেটা দেখেই আইডিয়া করলাম তোমার আজ স্নেক লেক আছে...।'

জিশান কোনও কথা বলল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

'তুমি লোক খারাপ না। একটা সামান্য কাজের জন্যে এককথায় দশহাজার টাকা দিয়ে দিয়েছ। তাতে আমাদের দুজনের খুব হেল্প হয়েছে। তাই তোমাকে হেল্প করা উচিত...।'

জিশান চমকে গার্ডের দিকে তাকাল। হেল্প করার ছুতোয় আবার টাকা চাইবে না কি?

গার্ডটা জিশানের মনের কথা আঁচ করতে পেরে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, কোনও টাকাপয়সার ব্যাপার না। এমনি তোমাকে একটা স্পেশাল খবর জানাতে চাই...।'

'কী?'

জিশানের সামনের আর পিছনের প্রতিযোগীর দিকে তাকাল গার্ড। জিশানের কাছ থেকে ওদের দূরত্ব প্রায় তিনফুট। সেটা চোখের নজরে মেপে নিয়ে জিশানের আরও কাছ ঘেঁষে এল। চাপা গলায় বলল, 'লেকের জলে যে-সাপগুলো ছাড়া আছে সেগুলো সাধারণ সাপ না...।'

'তার মানে?'

'জানো তো, সাপ কখনও তেড়ে এসে কামড়ায় না। কেউ গায়ে পা দিলে, বা হঠাৎ কাছাকাছি চলে গেলে, ছোবল মারে। লেকের সাপগুলো সেরকম না। ওদের বডিতে একটা স্পেশাল ড্রাগ ইনজেক্ট করা আছে। সেজন্যে ওরা কিছু দেখতে পেলেই তেড়ে গিয়ে কামড়াবে। ওই ড্রাগের জন্যে ওরা ভীষণ হিংস্র হয়ে যায়...।'

সাপের সঙ্গে 'হিংস্র' শব্দটা যে কখনও জোট বাঁধতে পারে এটা জিশান স্বপ্নেও ভাবেনি। তা হলে লেকে দৌড়নোর সময় বিষধর সাপের কামড় খাওয়াটাই স্নেক লেক কমপিটিশানের প্রতিযোগীদের ভবিতব্য। তা হলে সারভাইভাল ফ্যাক্টর যে 0.36 বলা হয়েছে সেটাও আগাপাশতলা মিথ্যে। এই লোডেড গেম-এর লাইভ টেলিকাস্ট দেখবে নিউ সিটির বাসিন্দারা! দেখবে আর আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়বে!

গেম কন্ট্রোল বিল্ডিং-এ সিমুলেশান ইত্যাদি দেখানোর সময় সাপগুলোকে যে ড্রাগ ইনজেক্ট করা থাকবে এ-তথ্য জানানো হয়নি। এটা শোনার পর জিশান এত দমে গেল যে, ও ধরেই নিল, আজ রাতে মিনির সঙ্গে ওর আর কথা বলা হবে না।

ওর মুখে যে একটা বিষাদের পরদা নেমে এসেছে সেটা বোধহয় গার্ডের নজরে পড়ল। ও নিচু গলায় বলল, 'তোমাকে একটা পাউচ দিচ্ছি —এটা লুকিয়ে রেখে দাও। প্যান্টের কোমরে-টোমরে গুঁজে নাও।'

কথা বলতে-বলতে মুঠো করা একটা হাত জিশানের দিকে বাড়িয়ে দিল

গার্ড।

জিশান ইতস্তত করছিল। সেটা লক্ষ করে গার্ড বলল, 'নাও, নাও। বললাম তো—কোনও পয়সা লাগবে না...।'

জিশানের বাঁ-হাত গার্ডের ডানহাতের মুঠোর কাছে চলে গেল। সকলের চোখ এড়িয়ে একটা ছোট পলিথিন পাউচ জিশানের হাতে চলে এল।

জিশান চাপা গলায় জানতে চাইল, 'কী আছে এতে?'

'স্নেক রিপেলান্ট অয়েল,' গার্ড বলল, 'এটা গায়ে মেখে নিলে সাপ আর কাছে আসবে না। এই তেলটা এমন পিকিউলিয়ার যে, শুধু সাপ এর গন্ধ পায়—মানুষ পায় না। আমাদের "ভেনম হাউস"-এর স্নেক হ্যান্ডলাররা এই তেলটা রেগুলার ইউজ করে। স্নেক লেক গেম-এর পার্টিসিপ্যান্টদের মধ্যে যারা ইন্টারেস্টেড তাদের আমরা এই পাউচ বিক্রি করি—অবশ্যই লুকিয়ে-চুরিয়ে। তবে তোমার কাছ থেকে টাকা নেব না...।'

'থ্যাংক্স—' বলে ছোট্ট পাউচটা প্যান্টের কোমরে গুঁজে ফেলল জিশান।

গার্ড বলল, 'লেকে নামার আগে পা চুলকানোর ভান করে ওই পাউচের তেলটা পায়ে মেখে নেবে...হাঁটু পর্যন্ত। কোনও সাপ যদি জল থেকে লাফিয়ে হাঁটুর ওপরে কামড়ায় তা হলে তোমার আর কিছু করার নেই...ভগবান যা করার করবে। যাকগে, জেতার চেষ্টা কোরো। তুমি জিতলে আমার খারাপ লাগবে না। ওই শ্রীধর পাত্রো আর তার চ্যালাচামুণ্ডাগুলোকে যদি টাইট দিতে পারতাম তা হলে আমার হাড়ে বাতাস লাগত। ওই শুয়োরের বাচ্চার দল ছাপোষা মানুষগুলোকে ধরে এনে আরশোলার মতো টিপে-টিপে মারছে। কোনও প্রতিবাদ নেই, কোনও আন্দোলন নেই। বুঝলে, আমরা সব ভেড়া হয়ে গেছি। এই দুঃখেই আমি মাল খাই, আর ঘুষ খাই। আমরা সব হেরে যাওয়া পাবলিক, জিশান। তোমার ব্যাপারে আমি খোঁজ নিয়েছি। তুমি হয়তো কিছু একটা করতে পারবে। তুমি জিতলে আমার মনে হবে আমিই জিতেছি।' হঠাৎই সামনের দিকে তাকিয়ে গার্ড বলল, 'আমরা এসে গেছি। ওই যে স্নেক লেক। বেস্ট অফ লাক, ভাই। মনে রেখো, আমাকে জেতানো চাই...।'

কথা বলতে-বলতে গার্ড চলে গেল।

কিন্তু জিশানের বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে গেল। যাওয়ার আগে জিশানকে কী বলে গেল ঘুষখোর লোকটা! 'মনে রেখো, আমাকে জেতানো চাই।'

মিনি বারবার বলছে, ওকে জিততে হবে। এই অসভ্য মরণখেলার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে।

মনোহর সিং চাইছে জিশান জিতুক।

ওকে ঘিরে এতরকম মানুষের এত আশা!

গার্ড বলে গেল, '...আমরা সব হেরে যাওয়া পাবলিক...।' গার্ড চাইছে,

এইসব হেরে যাওয়া পাবলিকদের হয়ে জিশান লড়বে—এবং জিতবে।

জিশান ঘাড় ঘুরিয়ে গার্ডকে খুঁজল। ও তখন প্রতিযোগীদের সারির একেবারে পিছনে গিয়ে পজিশন নিয়েছে। কয়েকসেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে রইল জিশান—যদি একটিবারের জন্য চোখাচোখি হয়।

চোখাচোখি হল। এবং হওয়ামাত্রই জিশান ঠোঁটের কোণে হাসল, আর বাঁ-হাতে 'থাম্‌স আপ' দেখাল। মনে-মনে বলল, 'আমি তোমাকে জেতানোর জন্যে শেষ দম পর্যন্ত লড়ব।'

জিশানদের নিয়ে যাওয়া হল লেকের সামনে। ওদের সবার গায়ে কমপিটিশানের চেনা পোশাক : হলদে টি-শার্ট আর কালো বারমুডা। টি-শার্টের বুকে সুপারগেমস কর্পোরেশনের লোগো আর তার নীচে বার কোড।

য়ুনিফর্ম পরা চারজন 'স্নেক হ্যান্ডলার'-কে দেখতে পেল জিশান। ওদের গায়ে কমলা রঙের জ্যাকেট। জ্যাকেটের পিঠের দিকে ইংরেজিতে লেখা : 'স্নেক হ্যান্ডলার'। এ ছাড়া মেডিক্যেল ইউনিটের হুডখোলা সাদা গাড়িও চোখে পড়ল ওর। না, কোনও ব্যবস্থাতেই কোনও ফাঁক নেই।

খেলাটা লাইভ টেলিকাস্টের জন্য টিভি চ্যানেলের ক্রু লেকের চারকোণে আর মাঝামাঝি দুটো জায়গায় যন্ত্রপাতিসমেত পজিশন নিয়েছে। একটা উঁচু ফ্রেমে ক্যামেরা বসিয়ে লেকের টপভিউ নেওয়ার বন্দোবস্তও করা হয়েছে। সব আয়োজনই এমন নিখুঁত যাতে উত্তেজনা ও আনন্দের মাত্রা ঠিকঠাক রেখে খেলার প্রতিটি মুহূর্ত 'জীবন্তভাবে' পৌঁছে দেওয়া যায় টিভি দর্শকদের কাছে।

একজন ইনস্ট্রাক্টরের নির্দেশে জিশানরা প্রত্যেকে জুতো খুলে ফেলল—যাতে জলের মধ্যে জোরে দৌড়তে সুবিধে হয়। তারপর সাঁতারের প্রতিযোগিতার মতো ওদের পরপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

ওদের সামনে একটা ধাতব পাঁচিল—তিনফুট মতো উঁচু। পাঁচিলটা ডিঙোলেই লেক। লেকের জলের রং সাদা, ঘোলাটে। জলে কি মিশিয়েছে কে জানে।

জিশানের ডানদিকে চারজন প্রতিযোগীর পর মনোহর সিং। ও মাঝে-মাঝে উঁকি মেরে জিশানের দিকে দেখছিল। ওর জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল জিশানের। ওর কাছে স্নেক রিপেলান্ট অয়েল রয়েছে—মনোহরের কাছে নেই। কিন্তু ওই তেলটা তো পায়ে মাখতে হবে!

হঠাৎই জিশান একজন গার্ডকে ডেকে বলল, 'আমাকে টয়লেটে যেতে হবে। খুব জোর পেয়ে গেছে।'

গার্ডটার মুখে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। জিগ্যেস করল, 'ছোট, না বড়?'

'ছোট।'

'বাঁচালে—।' গার্ড ওর কাছে এগিয়ে এল। আঙুল তুলে দেখাল : 'ওই

যে—ওইদিকে।'

জিশান ইশারা লক্ষ করে তাকাল। পনেরো-কুড়ি মিটার দূরে অদ্ভুত ছাঁদের একটা একতলা ঘর।

ও তাড়াতাড়ি পা চালাল সেদিকে।

টয়লেটের দরজায় দুজন গার্ড। ওদের বলে ভেতরে ঢুকল জিশান। ঢুকেই বুঝল বাথরুমটা এয়ারকন্ডিশনড এবং আধুনিক ঢঙে সাজানো। আরামের ব্যবস্থার বহর দেখে ওর তেতো হাসি পেল। তবে আর সময় নষ্ট না করে কোমর থেকে অয়েল পাউচটা বের করে নিল। চটপট পাউচ ছিঁড়ে তেলটা বের করে দু-পায়ে ভালো করে মাখতে লাগল—গোড়ালির গাঁট থেকে হাঁটু পর্যন্ত।

তেল মাখা শেষ হলে ও ছেঁড়া পাউচটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল। এটা এখানে পড়ে থাকা ঠিক নয়। গার্ডদের কারও নজরে পড়ে যেতে পারে।

ওটা লুকোনোর জায়গা খুঁজতে গিয়ে কাচের জানলায় লাগানো ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডের দিকে চোখ গেল জিশানের। তাড়াতাড়ি একটা জানলার কাছে গিয়ে ব্লাইন্ডের প্লাস্টিকের পাতের আড়ালে পাউচটা লুকিয়ে ফেলল।

তখনই ব্লাইন্ড টানার দড়ির দিকে নজর পড়ল ওর। কী ভেবে দুটো জানলা থেকে চটপট দুটো সিনথেটিক দড়ি খুলে নিল। দড়িদুটো দলা পাকিয়ে জাঙিয়ার ভেতরে গুঁজে দিল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল, পোশাকের ওপর থেকে দড়ির ব্যাপারটা মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। তারপর টয়লেট থেকে বেরিয়েই লেকের দিকে ছুটতে শুরু করল।

সেখানে পৌঁছে দ্যাখে একজন ইনস্ট্রাক্টর পোর্টেবল অডিয়ো সিস্টেমে পার্টিসিপ্যান্টদের আই-ডি নম্বর অ্যানাউন্স করে সেটা ল্যাপটপে চেক করে নিচ্ছেন।

জিশান পৌঁছনোর দু-মিনিটের মধ্যেই কম্পিটিশান শুরু হয়ে গেল। ওদের সামনের ধাতব পাঁচিলটা নিঃশব্দে ঢুকে গেল মেঝেতে। এবং ওরা স্টার্টারের বন্দুকের শব্দ শোনামাত্রই লেকে নেমে পড়ল। দুরন্ত গতিতে ছুটতে শুরু করল।

লেকের দুপাশে দর্শকের ভিড়। তারা এই অদ্ভুত রেস দেখছে আর উত্তেজনায় হইহই করছে। ওদের বেশিরভাগই পিস ফোর্সের গার্ড, সুপারগেমস কর্পোরেশনের স্টাফ, আর বিভিন্ন গেমে নাম দেওয়া সব পার্টিসিপ্যান্ট। নিউ সিটির বাসিন্দারা এখানে নেই। তারা ঘরের কিংবা অফিসের আরামে বসে এই মারাত্মক খেলার লাইভ টেলিকাস্ট দেখছে। যারা এখন দেখার সময় পাচ্ছে না তারা পরে সুবিধেমতো এর ভিডিয়ো রেকর্ডিং ডাউনলোড করে দেখে নেবে।

ওল্ড সিটিতেও এই গেমের লাইভ টেলিকাস্ট দেখছে বহু মানুষ। তাদের বেশিরভাগেরই চোখে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু মিনি টিভির সামনে বসে আছে জিশানের জন্য। আর জিশানকেও জিততে হবে মিনির জন্য। ওই ভয়ংকর

শ্মশানের ওই হতভাগ্য মরা মানুষগুলোর জন্য। এবং ওই গার্ডের জন্য।

স্নেক রিপেল্যান্ট অয়েলটা ঠিকঠাক কাজ করবে কি না এ নিয়ে জিশানের মনে এককণা হলেও সংশয় ছিল। তাই ও প্রাণপণে ছুটছিল। ও পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে ছপছপ শব্দ হচ্ছিল, জল ছিটকে উঠছিল। ওর সামনে-পিছনে বাকি পনেরোজনও একইরকম শব্দ তুলছিল। ছিটকে ওঠা জলের পরদায় প্রতিযোগীদের চেহারা আড়াল হয়ে যাচ্ছিল।

তারই মধ্যে দুটো সাপকে শূন্যে ছিটকে উঠতে দেখল জিশান। হয়তো কোনও পার্টিসিপ্যান্টের পায়ের টানে ওপরদিকে ছিটকে গেছে।

ছুটতে-ছুটতে তিনবার পায়ের নীচে নরম শরীর টের পেল ও। সাপের গায়ে পা পড়েছে ভাবতেই ওর গা-টা শিরশির করে উঠল। কিন্তু সেসব নিয়ে বেশি ভাবার সময় নেই। ছুট—ছুট—ছুট।

জিশান দেখল, এর মধ্যেই ছ'জন লোকের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ছিটকে ওঠা জলের ফোয়ারার জন্য মনোহরকে ও দেখতে পাচ্ছিল না। ও এখনও ছুটছে তো?

সামনেই লেকের পাড় দেখা যাচ্ছে—দৌড়ের ফিনিশ লাইন। জিশান পাগলের মতো ছুটতে লাগল। এবং কিনারার কাছাকাছি এসে সামনে প্রচণ্ড এক লাফ দিল।

লেকের ফিনিশ লাইনের পরই ঘাসে ঢাকা লন। ছুটন্ত প্রতিযোগীরা যখন রেস শেষ করছে তখন লাফিয়ে এসে পড়ছে এই লনে। জিশানের শরীরটা ঘাসের ওপর পড়ে দুবার ডিগবাজি খেয়ে গেল। তারপর একপাক গড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে রইল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল জিশান। ওর বুকটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছিল। দর্শকদের উল্লাসের চিৎকার কানে আসছিল। আকাশে তিনটে পাখি উড়ে যেতে দেখল ও। তখনই যেন ওর মনে পড়ল, ও বেঁচে আছে। স্নেক লেক রাউন্ডে ও কোয়ালিফাই করে ফেলেছে। আর এক[illegible] পিট ফাইটের মুখোমুখি চলে এসেছে।

হঠাৎই মনোহরের কথা খেয়াল হল ওর। ও চট করে উঠে বসল। চারপাশে তাকাতে লাগল। কোথায়? কোথায় মনোহর?

সব পার্টিসিপ্যান্টের পোশাক একইরকম হওয়াতে মনোহরকে খুঁজে নিতে জিশানের অসুবিধে হচ্ছিল। ও উঠে দাঁড়াল। বাজপাখির চোখে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল মনোহরকে।

হঠাৎই দেখতে পেল।

মনোহর সিং ঘাসের ওপরে শুয়ে ছটফট করছে। ওর কাছাকাছি কেউ নেই। ওর দিকে তেমন করে কারও নজর পড়েনি।

মনোহরের দিকে ছুটে গেল জিশান। 'মনোহর—' বলে চিৎকার করে উঠল।

ওর কাছে গিয়ে জিশান হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল।

'মনোহর! মনোহর!'

চোখ মেলে জিশানকে দেখতে পেল। যন্ত্রণা মেশানো গলায় বলল, 'জিশানভাইয়া...সালা হমে ডস্ দিয়া...।'

সাপে কেটেছে মনোহরকে।

ওকে পাশ ফেরাতেই জোড়া দাঁতের দাগ দেখতে পেল জিশান। বাঁ-পায়ের ডিমের ওপরে পাশাপাশি দুটো দাঁতের দাগ।

জিশান চিৎকার করে মেডিকেল ইউনিটের লোকজনকে ডাকতে লাগল। ওরা তখন সাপের কামড় খাওয়া অন্য প্রতিযোগীদের চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত।

কাছাকাছি পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন গার্ডকে জিশান ডাক্তার ডাকার জন্য বারবার বলতে লাগল। একইসঙ্গে জাঙিয়ার ভেতরে হাত ঢোকাল। ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডের দড়ি দুটো বের করে নিল। তারপর মনোহরকে চটপট ফাঁস বেঁধে দিল—একটা হাঁটুর নীচে, আর-একটা হাঁটুর ঠিক ওপরে।

মনোহর চিত হয়ে শুয়ে হাঁ করে মুখ দিয়ে 'আ—আঃ—' শব্দ করতে লাগল।

এর মধ্যেই টিভি ক্যামেরা নিয়ে লোকজন চলে এসেছে মনোহরের কাছে। কী করে একটা মানুষ সাপের কামড়ে ধীরে-ধীরে মারা যাচ্ছে তারই 'সিধা প্রসারণ' নিউ সিটির বড়লোকদের দেখাতে লাগল। মিনিও নিশ্চয়ই এই লাইভ টেলিকাস্ট দেখছে।

জিশানের মাথার ভেতরে সুপারনোভা ঘটে গেল। ও ভুলে গেল শ্রীধর পাট্টার কথা, রোলারবলের শাস্তির কথা, ভুলে গেল মিনি আর শানুর কাছে ওকে ফিরতে হবে।

ও উঠে দাঁড়াল। তিন-চার পা ফেলেই পৌঁছে গেল টিভি ক্যামেরায় চোখ সেঁটে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার কাছে। ওর জামার কলার আর কোমরের বেল্ট দু-হাতে খামচে ধরে ওকে তুলে নিল শূন্যে। লোকটার শরীর জিশানের কাছে পালকের চেয়েও হালকা বলে মনে হচ্ছিল। ওর মনে পড়ে গেল ওল্ড সিটিতে কার্তিকের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা।

চারপাশের লোকজনদের কেউ-কেউ এই কাণ্ড দেখে হইহই করে উঠল।

একজন গার্ড ছুটে এল জিশানের কাছে। শকার উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ওকে নামাও! এক্ষুনি! নইলে...।' শকারটা জিশানের নাকের ডগার কাছে এনে কয়েকবার নাড়াল।

জিশান মনে-মনে হিসেব কষল।

ক্যামেরাম্যান লোকটাকে ও অনায়াসে ছুড়ে দিতে পারে গার্ডের দিকে। তা হলে শংকরের সাধ্য নেই জিশানকে ছোঁয়। একইসঙ্গে জিশান জিমের 'লেগ পুশ' ব্যায়ামের মতো গার্ডটাকে পা দিয়ে এক প্রবল ধাক্কা মারতে পারে। তাতে গার্ডটা নির্ঘাত ছিটকে গিয়ে পড়বে স্নেক লেক-এ। তারপর জহুরিলা সাপ তার মহান দায়িত্ব পালন করবে।

জিশান জানে, এই কাজগুলো ও সহজেই করতে পারে। তেত্রিশদিন হল ও জিপিসি-তে এসেছে। এখানকার ব্যায়ামের রুটিন ওর শরীরটাকে এর মধ্যেই কাঁচা লোহা থেকে ইস্পাত বানিয়ে দিয়েছে। নিজের শরীরটার ওপরে ওর ভরসা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

কিন্তু মনোহরের কথা ভেবে কাজগুলো করল না জিশান। গার্ডের চোখে চোখ রেখে ক্যামেরাম্যানকে মাথার ওপর থেকে ধীরে-ধীরে নীচে নামিয়ে দিল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে ভয়-পাওয়া লোকটাকে বলল, 'যদি নিজে ছবি না হতে চাও তা হলে আমার বন্ধুর ছবি তুলবে না। তুললে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না...।'

লোকটার চোয়ালে আলতো করে দুবার চাপড় মারল জিশান : 'যাও, অন্য লোকদের ছবি-টবি তোলো...।'

লোকটা দু-চোখে ভয় নিয়ে ছিটকে চলে গেল ওর সঙ্গীসাথীর কাছে। যাওয়ার সময় পিছন ফিরে বারবার দেখতে লাগল জিশানের দিকে।

এবার গার্ডের দিকে তাকাল জিশান। ওর চোখে চোখ রেখে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তারপর ঘুরে হাঁটা দিল মনোহরের দিকে। মেডিকরা তখন মনোহর সিং-কে ঘিরে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে—ওর শুশ্রূষা করছে।

জিশান মনে-মনে চাইল, মনোহর যেন ভালো হয়ে যায়। ওর মতো ভালোমানুষের ভালো হয়ে যাওয়া উচিত।

•

জিশান আনমনা জিমে ব্যায়াম করছিল।

জিমের চারটে স্পেশাল কিউবিক্‌লের নাম 'সোলো জিম'। পিট ফাইটের যারা পার্টিসিপ্যান্ট তাদের এখন সোলো জিম-এ ওয়ার্কআউট করতে হয়। সকালে একঘণ্টা, বিকেলে একঘণ্টা। এটাই নির্দেশ।

সোলো জিম-এর মাপ বারো ফুট বাই বারো ফুট। এয়ার কন্ডিশানড। বডি টেম্পারেচারের সঙ্গে-সঙ্গে রুম টেম্পারেচার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নিজে থেকেই বদলায়। জিমের ভেতরের দেওয়ালগুলো সব আয়না। এমনকী সিলিং-ও।

একটা সোলো জিমে জিশান 'ইউনিভার্সাল ক্রাঞ্চ' মেশিন নিয়ে ব্যায়াম

করছিল। শরীরের নানান অংশের মাস্‌লকে হাইপার অ্যাক্টিভ করে তোলার জন্য এই মেশিনের জুড়ি নেই। তা ছাড়া জিশান বুঝতে পারছিল, পিট ফাইটের আগে পার্টিসিপ্যান্টদের ফিট করার জন্য মার্শাস শ্রীধর পাট্টার কেন এত মাথা ব্যথা যাতে ওয়ান-টু-ওয়ান লড়াইগুলো জমে। রাফনেস আর টাফনেসের চূড়ান্ত ক্ষেত্রে পৌঁছে যাওয়া লড়াই দেখে যেন মনে না হয় দুটো মানুষ খালি হাতে লড়ছে বরং যেন মনে হয়, দুটো নেকড়ে দাঁত-নখ দিয়ে মরণপণ লড়াই করছে, একটা আর-একটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খতম করতে চাইছে। তবেই না নিউ সিটির মানুষ লাইভ টেলিকাস্ট দেখে সত্যিকারের থ্রিল আর এক্সাইটমেন্ট এনজয় করবে। তবেই না মালটিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো কোটি-কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেবে।

তাই প্রতিটি কণা মাস্‌লের প্রতিটি কণা শক্তি এখন জিশানের দরকার সেই সুপার লেভেল শক্তি নিয়ে পিট ফাইট। এবং সেটা ডিঙোতে পারলেই সুপার ডুপার লেভেলের শক্তি চাই—সঙ্গে আর্মস—যার যেমন পছন্দ। তারপর কিল গেম। শেষ লড়াই। লড়াই শেষ। নাকি জীবনও?

জিশান ব্যায়াম করছিল, আর আয়নায় নিজেকে দেখছিল। ওর মধ্যে একটা জানোয়ার-জানোয়ার ভাব এসেছে না? বাইসেপ, ট্রাইসেপ, ল্যাট—সব মাস্‌লগুলো কেমন যেন পাথরের মতো দেখাচ্ছে। দু-গাল বসে গিয়ে চোয়াড়ে লাগছে। উজ্জ্বল চোখ দুটোকে ধূর্ত আলোর বিন্দু মনে হচ্ছে।

এ কোন জিশান?

আয়নার জিশানকে চিনতে ওর কষ্ট হল। একইসঙ্গে কান্না পেল। এই চেহারায় কোন মুখে মিনির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ও? অথচ এখানকার ভয়ংকর গেমগুলোতে জিততে হলে এই চেহারাটাই জরুরি।

সোলো জিমে একঘণ্টা ব্যায়াম করার পর দরজা খুলে বেরোল জিশান।

বাইরে একজন জিম বয় স্টপওয়াচ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঘড়ি দেখে হিসেব কষল একঘণ্টা হয়েছে কি না। যদি পাঁচমিনিটের বেশি এদিক-ওদিক হয় তা হলে সে সঙ্গে-সঙ্গে অ্যানালগ জিমের চিফ ইনস্ট্রাক্টরকে মোবাইলে ফোন করে জানাবে। তারপর ডিসিপ্লিন ভায়োলেট করার জন্য জিশানকে 'শিক্ষা' দেওয়া হবে। যেমন, ওকে মাঝরাতে ডেকে তুলে টানা তিনঘণ্টা ব্যায়াম করার হুকুম দেওয়া হতে পারে। অথবা অন্য কিছু।

জিশান শুনেছে, সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনে নতুন-নতুন শাস্তির টেকনিক আবিষ্কার করার জন্য নাকি চারজন এক্সিকিউটিভের একটা টিমকে প্রচুর মাইনে দিয়ে পোষা হয়।

অ্যানালগ জিমের দরজার দিকে হাঁটা দিল জিশান। একইসঙ্গে ও মনোহরের কথা ভাবছিল। তিনদিন হয়ে গেল, ও এখনও জিপিসি-র নার্সিংহোমে অ্যান্টিভেনম দিয়ে ওর চিকিৎসা চলছে। তার সঙ্গে ফলমূল, হেল্‌থ পাউডার

আর হেল্‌থ ড্রিংক। ডাক্তাররা বলছে চাঙ্গা হয়ে উঠতে মনোহরের এখনও চার-পাঁচদিন লেগে যাবে।

মনোহর সিং-এর কথা ভাবতে গিয়েই জিশান একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তাই লোকটাকে ও খেয়াল করেনি। খেয়াল যখন করল তখন দেখল লোকটার গায়ে লাল ইউনিফর্ম। অর্থাৎ, অ্যানালগ জিমের একজন ইনস্ট্রাক্টর।

জিশানের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সে মাটিতে ছিটকে পড়েছে।

জিশান 'সরি' বলে ঝুঁকে পড়ে তাকে তুলতে যাবে, হঠাৎই কে যেন পাশ থেকে ওর পাঁজরে সপাটে লাথি চালিয়ে দিল। একইসঙ্গে নোংরা ভাষায় খিস্তি করে উঠল।

লাথি চালানো পায়ে কালো চামড়ার জিম-বুট পরা ছিল। এবং বুটের তীক্ষ্ণ ডগাটা জিশানের পাঁজর যেন ফুটো করে দিল। একটা অসহ্য যন্ত্রণা ওর বুকের ভেতরে তৈরি হয়ে বেতার তরঙ্গের মতো শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় চিনচিন করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

জিশানের হাত থেকে তোয়ালে ছিটকে পড়ল। ও পড়ে গেল জিমের প্যাড দেওয়া মেঝেতে। সেই অবস্থাতেই শরীরটা আধপাক ঘুরিয়ে চিত করে নিল। তারপর আক্রমণকারীকে দেখতে চেষ্টা করল।

জিমের সিলিং-এ শৌখিন সাদা আলো। তার ফ্রস্টেড কাচের ঢাকনায় অসংখ্য হিরের কুচি চিকচিক করছে। সেই আলোর ব্যাকগ্রাউন্ডে আক্রমণকারীর অন্ধকার মুখটা ঠাহর করতে চাইল ও।

লোকটার টাক মাথা চকচক করছিল।

'কী রে শুয়োরের বাচ্চা! ট্রেনারের গায়ে হাত তুললি!' কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে বুট পরা পায়ের সোল নেমে এল জিশানের মুখের ওপরে।

জিশান এক ঝটকায় মাথাটা ঘুরিয়ে নিতে চাইল। লাথিটা এসে লাগল ওর বাঁ-গাল আর কানের ওপরে। শরীরের বাঁ-দিকটা ব্যথায় ঝনঝন করে উঠল।

লোকটা এবার নিচু হল। জিশানের বাঁ-রগের ওপর পরপর দুটো মারাত্মক ঘুষি মারল।

জিশানের মাথার ভেতরে যেন বোমা ফাটল। ওর চোখের সামনে অ্যানালগ জিম ঝাপসা হয়ে গেল। সিলিং-এর ঠান্ডা সাদা আলো ঘোলাটে হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। পলকে একটা উজ্জ্বল আকাশ ফুটে গেল যেন।

তারপরই জিশানের আর কিছু মনে নেই। অজ্ঞান হয়ে গেল।

কিন্তু তার আগে ও আক্রমণকারীকে চিনতে পেরেছে। লোকটা যখন ঘুষি মারার জন্য ওর ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল তখনই পাশ থেকে ছিটকে আসা আলোয় এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল জিশান। ওর চেতনা ঝাপসা হয়ে গেলেও রণজিৎ

পাত্রকে চিনতে ও ভুল করেনি।

রণজিৎ যে বদলা নেওয়ার সুযোগ খুঁজবে সে তো জানা কথা! কিন্তু যে-বুদ্ধিটা রণজিৎ ব্যবহার করেছে তার প্রশংসা করতে হয়। ও জিশানকে সবসময় চোখে-চোখে রাখছিল। এখন সামান্য সুযোগ পেতেই জিম ট্রেনারের পক্ষ নিয়ে জিশানের ওপরে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ব্যাপারটা কেউই ঠিকমতো খেয়াল করেনি। তাই রণজিৎ পাত্র যখন চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সবাইকে বলছিল জিশান কীরকম বদবুদ্ধি ধরে এবং জিম ইনস্ট্রাক্টরকে হেনস্থা করার জন্য ও বহুদিন ধরেই সুযোগ খুঁজছিল, তখন সকলেই রণজিতের কথা বিশ্বাস করছিল।

'...জানেন, ও আমাকে কতবার ওর প্ল্যানের কথা বলেছে? কিন্তু আমি রাজি হইনি। ওকে বুঝিয়েছি। বলেছি, ভাই, আমরা এখানে কম্পিটিশান লড়তে এসেছি—তার বাইরে আর কোনও লড়াই নেই। কিন্তু আমার কথা শুনলে তো! আপনারা তো নিজের চোখে...।'

রণজিৎকে ঘিরে চার-পাঁচজন জড়ো হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে পিস কোর্সের দুজন গার্ডও ছিল। কোমরে শকার। তাদের একজন মোবাইল ফোন বের করে ব্যস্তভাবে কারও সঙ্গে কথা বলছিল। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, জিশানের বেয়াদপির ব্যাপারটা নিয়েই সে কোনও ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে।

ইনস্ট্রাক্টরকে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে যে-দুজন তারা হাসান আর পাপুয়া। ওরা দুজন ইনস্ট্রাক্টরের গা থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছিল। এবং অভিনয়টাকে জোরদার করার জন্য জিশানের হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইছিল।

জিশানের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। বাঁ-দিকে রগের কাছের অসহ্য ব্যথা। অজান্তেই হাত চলে গেল সেখানে।

'উঃ!'

জায়গাটা চটচট করছে। হাত চোখের সামনে এনে ধরল।

রক্ত।

রাগে ফুঁসে উঠল জিশান। ওই তো রণজিৎ। ভিড় করে দাঁড়ানো লোকগুলোকে কাঁড়ি-কাঁড়ি মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে এখনও।

জিশান উঠে বসার চেষ্টা করল। ও এবার চেঁচিয়ে সত্যি কথাটা সবাইকে বলবে। ফাঁস করে দেবে রণজিতের নোংরা চালাকি। তারপর সুযোগ পেলে লাথি এবং ঘুষি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দেবে। পারলে তার চেয়েও কিছু বেশি।

কিন্তু পারল না। মাথাটা টলে গেল। শরীরটা বাঁকিয়ে মাথাটা শূন্যে ফুটখানেক তুলেছিল—সেখান থেকেই ওর মাথা খসে পড়ল। মেঝেতে প্যাডের

লাইনিং থাকায় তেমন শব্দ হল না।

জিশান শূন্য চোখে রণজিতের দিকে তাকিয়ে রইল। সত্যি ঘটনাটা কেউ খেয়াল করেনি ভেবে ওর ভীষণ মনখারাপ লাগছিল।

একজন কিন্তু সত্যি ঘটনাটা খেয়াল করেছিল। তবে জিশান সেটা খেয়াল করেনি।

অ্যানালগ জিম মাপে বিশাল। জায়গাটা শুধু যে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো তা নয়। সাজানোর ঢংটাও রীতিমতো আধুনিক।

পুরো ঘরটায় চিলিং এসি। ঘরের বাতাসে রুম ফ্রেশনারের সুগন্ধ। দেওয়ালের বেশিরভাগটাই আয়নায় ঢাকা। সিলিং-এ মোলায়েম সাদা আলো। ব্যায়ামের ছন্দ ঠিকঠাক রাখার জন্য জিমের হল জুড়ে হালকা মিউজিক ভেসে বেড়াচ্ছে।

পার্টিসিপ্যান্টদের ড্রেস হলদে রঙের স্লিভলেস ভেস্ট আর কালো শর্টস। হাতে আঙুল কাটা কালো চামড়ার দস্তানা। প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে একটা করে সাদা তোয়ালে। সবাই আপনমনে ব্যায়াম করছে, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। যেটুকু কথাবার্তা বলার ইনস্ট্রাক্টররা বলছে।

অ্যানালগ জিমে ঢোকার সময় প্রত্যেক প্রতিযোগীকে স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করতে হয়। আর ঢোকার পর একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হয়। ফর্মটার নাম ডেইলি ওয়ার্কআউট অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম। কী-কী ব্যায়াম করতে হবে, কতক্ষণ ধরে করতে হবে, ফর্মে তার খুঁটিনাটি হিসেব আর নির্দেশ দেওয়া আছে। ফর্ম ফিল আপের বেশিরভাগ কাজটাই অবশ্য বক্সে টিক মারা।

জিমের দরজার কাছাকাছি একটা বড় মাপের আধুনিক টেবিলে একটি ছিপছিপে মেয়ে বসে আছে। ওর সামনে রাখা একগোছা ফর্ম। তার পাশেই বসানো একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার। তার নীচের তাকে একটা লেসার প্রিন্টার।

মেয়েটির গায়ে হালকা নীল টপ। আর গাঢ় নীল স্কার্ট। বুকে কোড নম্বর লেখা একটা স্টিকার। গলায় একটা সরু নীল ফিতে হয় স্কাউটের ঢঙে বাঁধা। চুল বয়কাট। যদিও মুখটা ভীষণ মেয়েলি। এবং মিষ্টি।

ওর ফরসা মুখে দুটো টানা-টানা চোখ কী সুন্দর মানিয়ে গেছে! চোখের তারা দুটো যেমন উজ্জ্বল, তেমনই চঞ্চল। প্রতিদিন অ্যানালগ জিমে ঢুকে ফর্ম ফিল আপ করার সময় জিশানের মনে হয়, এত সুন্দর প্রাণচঞ্চল মেয়েটি এই নিষ্ঠুর দেশে কী করছে?

জিশান খেয়াল করেছে, ফর্ম ফিল আপ করার সময় মেয়েটি সবার সঙ্গেই গায়ে পড়ে টুকটাক কথা বলে। অন্তত বলার চেষ্টা করে। যারা নেহাতই খিটখিটে গম্ভীর তারা মেয়েটির কথা গ্রাহ্য করে না। ফর্মের রুটিন সেরে তারা জিমের যন্ত্রের কাছে এগিয়ে যায়। কিন্তু তাতে মেয়েটি মোটেই উৎসাহ হারায়

না। পরের প্রতিযোগী ঢুকলেই নতুন উদ্যমে ওর কথা শুরু হয়ে যায় আবার।

'আজ কেমন আছেন?'

'ভালো—' ফর্মের নানান খোপে টিক মারতে-মারতে জিশান বলল।

'এক্সারসাইজের মুড আছে তো?'

'কেন থাকবে না?'

'না, অনেক সময় দেখি সামনে কোনও টাফ কমপিটিশান থাকলে পার্টিসিপ্যান্টদের মুড অফ হয়ে যায়। মেঘ করলে আকাশের যা অবস্থা হয়...।' কথা শেষ করে হাসল।

জিশান চমকে চোখ তুলে দেখল ওকে। মেয়েটা কবি-টবি নাকি?

ওল্ড সিটিতে কবিতা লেখা কবে উঠে গেছে। অন্তত পত্র-পত্রিকাগুলো উঠে গেছে। কিন্তু কিছু-কিছু মানুষ এখনও পথে-ঘাটে কবিতা আবৃত্তি করে বেড়ায়, গান গেয়ে বেড়ায়। সবাই তাদের পাগল বলে। কিন্তু জিশানের মনে হয় ওই পাগলগুলো মরা শহরটাকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছে, ফুল-পাখি ফিরিয়ে আনতে চাইছে, ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলোকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে।

চাইছে অনেকেই। জিশান আর মিনিও চাইছে। তাই ওরা কবিতা ভালোবাসে। ওরা চায় কোনও এক অলৌকিক ম্যাজিকে ওল্ড সিটিটা কবিতা হয়ে যাক। এই চাওয়ায় কোনও ভুল নেই। কিন্তু পাওয়া বোধহয় এখনও অনেক দূরে।

নিউ সিটিতে কবিতা নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ নয়। তবে শ্রীধর পাট্টা আর তাঁর তৈরি ভয়ংকর সব নিয়মকানুন দেখলে মনে হয় কবিতা বোধহয় নিষিদ্ধের চেয়েও কিছু বেশি।

জিশান নিচু গলায় বলল, 'মুড অফ হলে তো চলবে না। ট্রেনিং-এর নিয়মে নড়চড় হওয়ার জো নেই।'

'সেটা ঠিক। তবে...' মাথার চুলে হাত চালাল মেয়ে : 'তবে আমরাও তো মানুষ...।'

'দেখে তো মনে হয় না।'

'তার মানে!' রাগ ঢুকে পড়ল গলায় : 'আমি কি জিমের ওইসব যন্ত্র নাকি?'

'হতেই পারে—।' ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল জিশান। তারপর একটু হেসে সরে এসেছিল টেবিলের কাছ থেকে।

দূর থেকে ও লক্ষ করেছিল মেয়েটি তখনও অখুশি চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে আছে।

দু-দিন আগে জিমে ঢোকার সময় মেয়েটি জিশানকে বলেছিল, 'আপনার নাম তো জিশান...।'

'হ্যাঁ—কেন?'

'কনগ্র্যাচুলেশানস্। আপনি কাল স্নেক লেক কমপিটিশানে জিতেছেন।'

জিতেছি এবং মৃত্যুর দিকে আরও এক পা এগিয়ে গেছি হয়তো। মনে-মনে ভাবল ঝিশান। কিন্তু মুখে বলল, 'থ্যাংক্স।'

ঝিশান ওর নাম জিগ্যেস করল না। শিবপদর কথা মনে পড়ে গেল। নাম জেনে কী লাভ। ঝামেলা বাড়বে।

'অল দ্য বেস্ট উইশেস ফর ইয়োর নেক্সট গেম—।'

'কেন? হঠাৎ আমাকে উইশ করছেন কেন?' ভুরু কুঁচকে মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিল ঝিশান।

চকচকে সাদা আলো ওর মিষ্টি মুখে একটা অদ্ভুত আভা তৈরি করেছে। মনে হচ্ছে, এই মুখটা যিনিই তৈরি করে থাকুন তিনি প্রচুর সময় এবং ভালোবাসা দিয়ে তৈরি করেছেন। এই শহরে এরকম প্রাকৃতিক অলীক সৌন্দর্য বেমানান। এখানকার যত সৌন্দর্য সব কৃত্রিম—মানুষের তৈরি। আর প্রতিটি সুন্দরের পিছনে বুদ্ধি, যুক্তি, পরিশ্রম, আর উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন, নেক্রোসিটির নীল আলো জ্বলা মোমবাতির আড়ালে রয়েছে মানুষের মৃতদেহের ভাগাড়।

মেয়েটি হেসে বলল, 'আমি সবাইকেই উইশ করি। আমি চাই সবার ভালো হোক। সবাই জিতুক—।'

ঝিশানের মধ্যে তর্ক করার সাধ জেগে উঠল। বহুদিন ও কারও সঙ্গে প্রাণ ভরে তর্ক করেনি। তাই ও ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'এই ইমপসিব্‌ল উইশের কোনও মানে নেই। একটা গেম-এ সবাই কখনও জিততে পারে?'

'না, পারে না।' মাথা ঝাঁকাল মেয়ে : 'জানি—এটা অবাস্তব। কিন্তু তাই বলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না? যদি এমন হত, কমপিটিটাররা সবাই মিলে সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের এগেইন্‌স্টে রুখে দাঁড়াত, ওদের ডেডলি গেমগুলো চিরকালের জন্যে ধ্বংস করে দিত, তা হলে কী ফ্যানট্যাসটিক হত! তখন কি বলা যেত না যে, গেমটায় সবাই ফার্স্ট হয়েছে! বলুন।'

ঝিশান কোনও কথা বলতে পারল না। হাঁ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। এ কী রূপকথা শোনাচ্ছে সোনার মেয়েটা?

গার্ডের কথা মনে পড়ে গেল। স্নেক লেক কমপিটিশানের আগে যে ওকে স্নেক রিপেলান্ট অয়েলের একটা পাউচ দিয়েছিল। বলেছিল, '...আমরা সব ভেড়া হয়ে গেছি। আমরা সব হেরে যাওয়া পাবলিক, ঝিশান...। তুমি জিতলে আমার মনে হবে আমিই জিতেছি...। মনে রেখো, আমাকে জেতানো চাই...।'

ঝিশানকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা বলল, 'আমি ভীষণ স্বপ্ন দেখি, ঝিশান। এখানকার কেউই—এমনকী নিউ সিটির মার্শালও আমার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করতে পারবে না। রিয়েল লাইফে যদি নাও পারি রূপকথার

অন্তত মানুষের মতো বাঁচবে। তাই আমি সবাই জিতেছে এমন স্বপ্ন দেখি। আপনিও স্বপ্ন দেখুন, জিশান। স্বপ্ন দেখার অসুখটা খারাপ না। আমি বলছি, রূপকথার মধ্যেই মানুষের আসল জীবন লুকিয়ে আছে। আমরা দেখতে চাই না, তাই দেখতে পাই না...।'

সেদিন থেকে জিশান মনে-মনে ওর নাম দিয়েছিল রূপকথা। কসাইয়ের দেশে ও রূপকথা বিক্রি করতে চাইছে! ওর সাহস তো কম নয়!

জিশানের সঙ্গে ইনস্ট্রাক্টরের সংঘর্ষের ঘটনাটা রূপকথা দেখতে পেয়েছিল।

কারণ, ওর হাতে তখন কোনও কাজ ছিল না। তাই টেবিলে বসে ও এমনিই জিমের পার্টিসিপ্যান্টদের দিকে তাকিয়েছিল। ও জানে, এরা ক্রমশ সংখ্যায় কমছে। আরও কমবে।

সোলো জিম থেকে জিশানকে ও বেরোতে দেখেছিল। সংঘর্ষটাও ভালো করে খেয়াল করেছিল। তাই জটলা এবং হইচই দেখে ও জিশানের কাছে ছুটে এল। ততক্ষণে চিফ ইনস্ট্রাক্টরও সেখানে চলে এসেছে।

রূপকথা উত্তেজিতভাবে তাকে বলল, 'স্যার, আমি সব দেখেছি। ব্যাপারটা পিয়োরলি অ্যাকসিডেন্ট। যেভাবে ওরা বলছে...' রণজিৎ পাত্রের দিকে আঙুল দেখাল : 'সেটা ঠিক নয়। আমি...।'

চিফ ইনস্ট্রাক্টর হাতের ইশারায় রূপকথাকে চুপ করতে বলল। তারপর রণজিৎ ও তার দুই সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনারা প্লিজ নিজেদের কাজে চলে যান। আমরা এখানে কোনওরকম হইহল্লা বা জটলা চাইছি না।'

জিপিসি-র ডিসিপ্লিন এমনই যে, অনুরোধ মানে আদেশের চেয়েও কিছু বেশি। রণজিৎ সেটা জানে। হাসান আর পাপুয়াও। তাই চোখের পলকে ওরা তিনজন সরে গেল। বাড়তি যে দু-তিনজন উৎসাহী পার্টিসিপ্যান্ট ছিল তারাও চিফ ইনস্ট্রাক্টরের কথা শেষ হওয়ামাত্রই পা চালাল।

যার সঙ্গে জিশানের ধাক্কা লেগেছিল সেই ইনস্ট্রাক্টর আর পিস ফোর্সের দুজন গার্ড অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। চিফ ইনস্ট্রাক্টরের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রূপকথা জিশানের তোয়ালেটা কুড়িয়ে নিল। তারপর ওর দিকে হাত বাড়াল। জিশান হাতটা ধরল। শরীরটা বাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাঁ-হাতে কপালের পাশ থেকে রক্ত মুছে নিল।

রক্তে লাল হয়ে যাওয়া হাতের আঙুলগুলো দেখল জিশান। আজ থেকে দেড়-দু-মাস আগে এভাবে রক্ত দেখলে ওর মধ্যে যে-প্রতিক্রিয়া হত আজ তেমন হল না। জিশান একটু অবাক হলেও বুঝল, এটাই হওয়ার ছিল। জিপিসি-তে যারা গেম খেলতে আসে তাদের সবারই এরকম হয়। ধীরে-ধীরে রক্ত-টক্ত সব গা-সওয়া হয়ে যায়।

রূপকথা চিফ ইনস্ট্রাক্টরকে আকুল গলায় বলল, 'স্যার, হি ইজ ব্লিডিং। দ্যাট গডড্যাম্‌ড গাই হিট হিম সো হার্ড...।'

চিফ ইনস্ট্রাক্টর হাতের ইশারায় ওকে আশ্বস্ত করে জিশানের স্মার্ট কার্ড দেখতে চাইল। চার-পাঁচ-সেকেন্ড সেটায় চোখ বুলিয়ে কার্ডটা জিশানকে ফেরত দিল। জিমের চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে কোমর থেকে মোবাইল ফোন বের করে কাউকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করল।

পরপর কয়েকবার চেষ্টা করে লাইন 'বিজি' পাওয়ায় বিরক্ত হল। তখন চিফ একজন গার্ডকে বলল, 'একে মেডিক রুমে নিয়ে যাও। চিফ মেডিকের ফোন বিজি। যখনই ফোন করি ফোন বিজি। কার সঙ্গে এত বকবক করে কে জানে!'

'আমি সঙ্গে যাব, স্যার?' রূপকথার চোখে অনুনয়। ও তখন জিশানের ডানহাতের ওপরদিকটা আঁকড়ে ধরে আছে। ওর বোধহয় মনে হয়েছে, জিশান হঠাৎ টলে পড়ে যেতে পারে।

চিফ ইনস্ট্রাক্টর বেশ কয়েকসেকেন্ড মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাতের ইশারায় দুজন গার্ডকে চলে যেতে বলল।

ওরা রোবটের মতো নির্দেশ পালন করল।

চিফ এবার জিশানের দিকে তাকাল। ওর নজর দেখে বোঝা যাচ্ছিল জিশানের শরীরের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা আঁচ করার চেষ্টা করছে।

জরিপের কাজ শেষ হতেই চিফের নজর গেল সামান্য দূরে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইনস্ট্রাক্টরের দিকে।

লোকটা মাথা নিচু করল। যেন জিশানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাওয়াটা ওর পক্ষে মর্মান্তিক অপরাধ হয়ে গেছে।

'এবার দয়া করে ডিউটিতে যাও—।' ঠান্ডা গলায় চিফ বলল।

লোকটা খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া ইঁদুরের মতো পালাল।

চিফ তাকাল রূপকথার দিকে। রূপকথা আবার বলল, 'আমাকে এই পেশেন্টের সঙ্গে থাকার পারমিশান দিন, স্যার। প্লিজ...। আমার রিকোয়েস্টটা রাখুন: প্লিজ...।'

'পেশেন্ট?' ছোট্ট করে উচ্চারণ করল চিফ, 'রিকোয়েস্ট? তোমার কত রিকোয়েস্ট রাখব বলো তো, রিমিয়া? তুমি আমার রিকোয়েস্ট রাখো?'

রূপকথা—রিমিয়া—চুপ করে রইল। চিফের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জিশান চিফকে ভালো করে দেখছিল। এমনিতে লোকটার মুখে শয়তানির ছাপ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল ছাপ পড়েছে। হাসলও লোকটা। হাসিতে আশা-প্রত্যাশা।

রূপকথা ঠোঁট কামড়াল : 'কী রিকোয়েস্ট, বলুন?'

চিফ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিশানকে দেখল। মুখে গম্ভীর ভাব ফিরিয়ে আনল। কষ্ট করে বলল, 'পেশেন্টকে নিয়ে এখন যাও—তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব...।'

রূপকথা আর দেরি করল না। জিশানের হাত থেকে গ্লাভ্‌স খুলে নিল। তারপর গ্লাভ্‌স আর তোয়ালেটা গারমেন্ট্‌স বিন-এ ফেলে দিয়ে জিশানকে নিয়ে রওনা হল।

চিফ ওদের চলে যাওয়া দেখছিল। দেখতে-দেখতে মোবাইল ফোন কানে দিল। কারও সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

অ্যানালগ জিমের বাইরে এসে ডানদিকের করিডরে ঘুরল মেয়ে। সামনেই একটা ঘর। ঘরের দরজায় সুন্দর করে লেখা : PHYSICAL REDRESSAL। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে একজন গার্ড। অল্পবয়েসি ছেলে। রোগা চেহারায় বেমানান মোটা গোঁফ। দুটো তরুণ চোখে চনমনে কৌতূহল।

রূপকথা জিশানকে নিয়ে গার্ডের কাছে গেল। আলতো গলায় বলল, 'পেশেন্ট।' একইসঙ্গে ইশারা করল জিশানের রক্তাক্ত বাঁ-গালের দিকে।

গার্ড পকেট থেকে একটা রিমোট বের করল। দরজার দিকে তাক করে রিমোটের বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল। ওরা ভেতরে ঢুকে পড়ল।

রূপকথা জিশানকে জিগ্যেস করল, 'কষ্ট হচ্ছে?'

জিশান হাসতে চেষ্টা করল : 'ততটা নয়।'

একটু চুপ করে থেকে তারপর জিগ্যেস করল, 'আপনার নাম রিমিয়া?'

ঘুরে তাকাল : 'হ্যাঁ।'

'অদ্ভুত নাম। অবশ্য আমি অন্য একটা নাম রেখেছি।'

'কী নাম?'

ততক্ষণে দুজন মেডিক এবং দুজন নার্স ওদের কাছে চলে এসেছে। জিশানকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটা সুন্দর বিছানায় বসিয়ে দিয়েছে।

জিশান চারপাশটা জরিপ করে দেখছিল। জায়গাটা আসলে নার্সিংহোম হলেও দেখতে একেবারে আলট্রা-টিপটপ, অন্যরকম।

বিশাল মাপের চৌকোনা ঘর। দেওয়ালের রং হালকা নীল। বিছানাগুলো মেঝেতে লুডোর ছকের ঢঙে ছোট-ছোট বর্গাকারে সাজানো। চারটে বিছানা একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি করেছে। এরকম পাশাপাশি দুটো বর্গক্ষেত্রের মাঝে গাঢ় নীল রঙের অ্যাক্রিলিকের পার্টিশান।

বিছানার চাদর কিংবা পিলো কভারের রং দেওয়ালের মতোই হালকা নীল। তবে বেডকভারগুলো সব গাঢ় নীল রঙের।

চার দেওয়ালে প্লেট টিভি আর পেইন্টিং সুন্দর করে সাজানো। একটা টিভি, তারপরই একটা পেইন্টিং—তারপর আবার টিভি। এইরকমভাবে সারিতা

চলে গেছে এক দেওয়াল থেকে আর-এক দেওয়ালে।

জিশান লক্ষ করল, পেইন্টিংগুলোর একটাতেও প্রকৃতির ছবি নেই। সবই বিমূর্ত। ছন্নছাড়া রঙের খেলা।

বেশিক্ষণ সময় লাগল না। প্রাথমিক চিকিৎসার ঢঙে জিশানের যত্ন নিল মেডিকরা। ওকে বিছানায় বসিয়ে ওরা ঘিরে ধরেছিল। কাটা জায়গায় ওষুধপত্র লাগিয়ে দেওয়ার পর একজন নার্স একটা স্প্রে-গান তাক করল জিশানের দিকে। বোতাম টিপতেই সাদা ধোঁয়ার মতো স্প্রে ছিটকে বেরোল। বাঁ-রগের কাছে কাটা জায়গাটা পলকে একটা চকচকে সাদা পরদায় ঢেকে গেল।

নার্স মেয়েটি স্প্রে-গানের সুইচ অফ করে বলল, 'ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট লেয়ার পেস্ট করে দিলাম। স্নান করার সময় জল-টল লাগলেও কোনও প্রবলেম নেই। পারফেক্টলি সেফ। ও.কে.?'

'ও.কে.। থ্যাংক্স।' ঘাড় নাড়ল জিশান। ওর মনে হল, দপদপানি ব্যথাটা এখনই যেন অনেকটা কমে গেছে।

রূপকথা এতক্ষণ চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। নার্স আর মেডিকদের শরীরের ফাঁকফোকর দিয়ে জিশানকে দেখতে চেষ্টা করছিল।

জিশান বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। ডাক্তার-নার্সদের আর-একবার ধন্যবাদ জানিয়ে রূপকথার কাছে এগিয়ে এল।

এবার ওদের ফিজিক্যাল রিফ্রেশাল রুম থেকে বেরিয়ে অ্যানালগ জিমে ঢুকতে হবে। আজকের মতো জিশান হয়তো ব্যায়াম থেকে ছুটি পাবে—তারপর কাল থেকে আবার একই রুটিন। টার্গেট : পিট ফাইট।

কিন্তু ওর রূপকথার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।

রূপকথা ওর কাটা জায়গাটার দিকে তাকাল। এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। চকচকে সাদা প্লাস্টিকের মতন কিছু দিয়ে ঢাকা।

ও জিগ্যেস করল, 'আর কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'না—।' মাথা নাড়ল জিশান।

ওরা দরজার দিকে এগোল।

'আমার কী নাম রেখেছেন বললেন না তো?' রূপকথা জিগ্যেস করল। এতক্ষণ ধরে জিশানের কথাটা ও মনে রেখেছে।

জিশান লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, থাক। শুনলে আপনার হাসি পাবে।'

'হাসতে আমার ভালো লাগে—।'

জিশান চুপ করে রইল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। রূপকথাকে একপলক দেখে নিয়ে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে বলল, 'এখানে চাকরি করতে আপনার ভালো লাগে?'

রূপকথা ঘুরে তাকাল। বুঝল জিশান এখন নামটা বলতে চাইছে না।

একটু চুপ করে থেকে ভাবল, উত্তর দেবে কি দেবে না। তারপর বলল, 'না—একেবারেই না।'

'তা হলে খেলছেন কেন? টাকার জন্যে?'

হাসল রূপকথা : 'হ্যাঁ—সবাইকে তাই বলি।'

'আসল কারণটা তা হলে কী?'

আবার তাকাল জিশানের দিকে। চোখের ওপরে কুয়াশা নেমেছে মনে হল যেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কুয়াশা সরিয়ে রোদের ঝিলিক দেখাল মেয়ে। হাসল।

'আসল কারণটা সিক্রেট।'

জিশান চুপ করে গেল।

ওরা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বালনি গ্রানাইটের ওপরে পা ফেলে এগিয়ে চলল অ্যানালগ জিমের দরজার দিকে।

দরজার কাছাকাছি এসে জিশান বলল, 'আমাকে নিশ্চয়ই এখন আর জিম করতে হবে না...।'

'না। এখন রেস্ট। আপনার ডেইলি অ্যাসেসমেন্ট ফর্মটায় আমি নোট দিয়ে দিচ্ছি।'

তারপরই কি অ্যানালগ জিম থেকে বিদায়? জিপিসি-র গেস্টহাউসে চলে যেতে হবে? ভাবল জিশান। রূপকথার সিক্রেট কারণটা ওর জানতে ইচ্ছে করছিল। তার সঙ্গে 'রূপকথা' নামটাও বলতে ইচ্ছে করছিল।

অ্যানালগ জিমে ঢুকল ওরা। রূপকথা জিশানকে নিয়ে গেল ওর টেবিলের কাছে। বিমূর্ত জ্যামিতি দিয়ে তৈরি একটা সুন্দর চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন। ফর্মটায় নোট দিয়ে দিই...।'

জিশান চারপাশে তাকাল একবার। সবাই ব্যায়াম নিয়ে ব্যস্ত। ডিসিপ্লিন। এখানে ডিসিপ্লিনই প্রথম এবং শেষ কথা। ও চুপচাপ বসে রইল।

রূপকথা কাজ করছিল, জিশান ওকে মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল। এই নিউ সিটিতেও স্বপ্ন নিয়ে বাঁচা যায়। শুধু স্বপ্নকে আঁকড়ে থাকার গোপন কৌশলটা জানতে হয়।

জিশান এক অদ্ভুত দোটানায় পড়ে গেল। একদিকে নিষ্ঠুর বাস্তব—হাই রিস্ক রিয়্যালিটি গেমস। আর একদিকে স্বপ্ন আর প্রকৃতি। ওর মনে হল, আকাশের সুন্দর চাঁদ, তারা, সূর্য যেমন সত্যি, ওই লাল-নীল আলো ছড়ানো অশুভ ধূমকেতুগুলোও সত্যি।

এই জিপিসি-তে আসার পর থেকে জিশান রোজ বদলাচ্ছে। মানুষ থেকে গুটিগুটি করে হেঁটে চলেছে অমানুষের দিকে। এটা ওর পছন্দ নয়। কিন্তু যদি ও না বদলায় তা হলে কিল গেম জেতার জন্য তৈরি হবে কী করে? বাঁচবে

কী করে? আগে তো ও বাঁচুক—তারপর বাঁচার মতো বাঁচতে চেষ্টা করবে।

মিনির কথা মনে পড়ল জিশানের। ওর মধ্যেও সেই একই টানাপোড়েন। যেরকম স্বামীকে ও চায় না, কখনও চায়নি, স্বামী যদি সেরকম না হয় তা হলে স্বামীকে ও আর কখনও ফেরত পাবে না। মানুষটাকে ফেরত পাওয়ার জন্যই মানুষটাকে অমানুষ হতে হবে।

'কী ভাবছেন?'

জিশানকে আনমনা দেখে রূপকথা জিগ্যেস করল।

জিশান তাকাল ওর দিকে। ছোট্ট করে হেসে বলল, 'সিক্রেট।'

'প্রতিশোধ নিলেন?'

'না—তা না। বলব—যদি আপনারটা বলেন।'

'আর আপনার রাখা নামটা?'

'সেটাও বলব।'

'গিভ অ্যান্ড টেক?'

'জানেন, রিমিয়া, আমাদের ওল্ড সিটিটা একসময়ে গিভ অ্যান্ড গিভ ছিল। ওখানকার সিনিয়ার সিটিজেনদের কাছে শুনেছি। এখন ব্যাপারটা ঘেঁটে গেছে। আর আপনাদের এই নিউ সিটি? মোস্টলি টেক অ্যান্ড টেক। গিভ বলতে এরা টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না।'

'কেন, আমার সিক্রেটটা বললে আপনি বুঝি আমাকে টাকা দেবেন?'

'না, আপনার কথা বলছি না। আপনি আলাদা।'

জিশান রূপকথাকে দেখল। রূপকথাও তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কয়েকসেকেন্ড পর হেসে ফেলল দুজনেই।

জিশান বলল, 'আপনার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে ভালো হত। এখানে কোথাও চা-কফি পাওয়া যায়? আপনাদের ক্যান্টিন নেই?'

'আছে। ক্যান্টিন নয়—ফুড প্লাজা। এমপ্লয়িদের জন্যে। কোনও গেস্ট সঙ্গে থাকলে স্পেশাল পারমিশান করাতে হয়—সেকশনাল চিফের কাছ থেকে। চলুন, যাবেন?' রূপকথার চোখে খুশি।

জিশানও চাইল, আজ কিছুটা সময় অন্তত অন্যরকমভাবে কাটুক।

রূপকথা টান-টান হয়ে দাঁড়াল। বোধহয় কোনও লড়াইয়ের জন্য মনে-মনে নিজেকে তৈরি করল। মোবাইল ফোন বের করে পটাপট বোতাম টিপল, ফোন কানে চেপে ধরল।

'স্যার, রিমিয়া হিয়ার।'

... ...

'আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। আপনি জিমের কোথায় আছেন?'

'আমি এখুনি যাচ্ছি।'

কানেকশান কেটে দিয়ে জিশানকে তাড়া দিল রিমিয়া : 'শিগগির চলুন। চিফ ইনস্ট্রাক্টর একেবারে লাস্টের সোলো জিমের কাছে আছে। আপনি সঙ্গে না গেলে হবে না। আপনার স্মার্ট কার্ডের নাম্বারটা চিফের লাগবে...।'

তাড়াতাড়ি পা ফেলে ওরা দুজন পৌঁছে গেল চিফের কাছে।

চিফ ইনস্ট্রাক্টর একটা ছোট্ট কিউবিক্‌ল-এ বসেছিল। একটা হেক্সাগনাল শেপের ট্রান্সপ্যারেন্ট সিপিং ওয়াটার বট্‌ল থেকে সিপ করে জল খাচ্ছিল। রূপকথাকে দেখে বাঁকানো সিপারটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিল। সিপিং ওয়াটার বট্‌লটা সামনের টেবিলে রাখল। কপালে ভাঁজ ফেলে ভুরু কুঁচকে চোখের ইশারায় বলতে চাইল, 'কী ব্যাপার?'

'একটা রিকোয়েস্ট আছে।'

'আবার রিকোয়েস্ট?' ভুরু আরও কুঁচকে গেল।

'হ্যাঁ—এই রিকোয়েস্টটা রাখুন। আমিও আপনার রিকোয়েস্টের ব্যাপারে সিরিয়াসলি ভাবব।' রূপকথার কথাগুলো কেমন কাঠ-কাঠ শোনাল। কিন্তু ও ঠোঁটে হাসছিল।

এটাই তা হলে লড়াই? এর জন্যই ও একটু আগে মনে-মনে নিজেকে তৈরি করছিল। ভাবল জিশান।

চিফের ঠোঁটে হাসি তৈরি হল। গালের পেশি নড়াচড়া করল। জিশানের দিকে একবার দেখল। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে রূপকথার গালে আঙুল ছোঁয়াল। আলতো করে বলল, 'আই ফিল ফর য়ু, রিমিয়া। সেই ফিলিংটা তোমার কাছে এক্সপ্রেস করতে চাই। আই হোপ য়ু নো দ্যাট—ডোন্ট য়ু?'

রিমিয়া রোবটের মতো হাসল। ওর ঠোঁটের চামড়া যেন মোটা প্লাস্টিকের তৈরি। চোখের তারায় কোনও আলো নেই।

'জানি, স্যার। আই ডু রেসপেক্ট ইয়োর ফিলিং...।'

'থ্যাংকস।' চিফ বড় করে হাসল : 'এবার বলো, তোমার কী রিকোয়েস্ট আমি রাখতে পারি।'

রূপকথা তখন বলল যে, জিশানকে নিয়ে ও ফুড প্লাজায় বসে একটু কফি খেতে চায়। বড়জোর আধঘণ্টা। কারণ কথায়-কথায় ও জানতে পেরেছে যে, জিশান ওর হাজব্যান্ডের বন্ধু।

হাজব্যান্ড? জিশান অবাক হল। ওর হাজব্যান্ডের বন্ধু জিশান!

রূপকথা জিশানের দিকে একবারও তাকায়নি। ও তখন ওর রিকোয়েস্টের সঙ্গে মিষ্টি হাসি মাখিয়ে দিতে ব্যস্ত।

কাজ হল খুব তাড়াতাড়ি। চিফ জিশানের স্মার্ট কার্ডটা চেয়ে নিল। পার্টিসিপ্যান্ট আই-ডি নম্বরটার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে ওটা বোধহয় কয়েকবার

আওড়ে নিল। তারপর মোবাইলের বোতাম টিপে কাকে যেন ফোন করল। লাইন পেয়ে গেল কয়েকসেকেণ্ডের মধ্যেই। কথা বলতে লাগল : '...হ্যাঁ, অ্যানালগ জিমের রিমিয়া। এমপ্লয়ি কোড সি-ওয়ান ওয়ান টু সেভেন ফাইভ। ও ফুড প্লাজায় যাচ্ছে। সঙ্গে একজন গেস্ট। পার্টিসিপ্যান্ট। আই-ডি নাম্বার পি-টু সেভেন ওয়ান থ্রি ফোর ফোর ফোর—হ্যাঁ, ট্রিপল ফোর। একটু আগে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হয়েছে। ওরা ফুড প্লাজায় থাকবে আধঘণ্টা—একজ্যাক্টলি হাফ অ্যান আওয়ার—থারটি মিনিট্স। নট মোর দ্যান দ্যাট। প্লিজ অ্যালাও। ও.কে.?'

ওপাশ থেকে কিছু একটা শুনল চিফ। তারপর ফোন কেটে দিয়ে রিমিয়ার চোখে তাকিয়ে চওড়া হাসল। রিমিয়ার গাল টিপে দিল ছোট্ট করে : 'কী, স্যাটিসফায়েড?'

'থ্যাংক য়ু, স্যার।'

'ও.কে.। বাট রিমেমবার—থারটি মিনিট্স। অলসো রিমেমবার মাই রিকোয়েস্ট।'

'অফ কোর্স, স্যার।' হাসল রিমিয়া। তারপর জিশানকে ডেকে নিয়ে রওনা হল।

রূপকথা খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে হাঁটছিল। জিশানও ওর পিছন-পিছন তাল মিলিয়ে হাঁটা দিল। ওর মাথার মধ্যে তখনও 'হাজব্যান্ড' শব্দটা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

অ্যানালগ জিমের চেঞ্জ রুমে গিয়ে জিশান জিম ভেস্ট ছেড়ে একটা টি-শার্ট পরে নিল। বাইরে আসতেই বোঝা গেল সূর্য আকাশে ঠিকঠাক আলো দিচ্ছে। কারণ জিমের ভেতরে, এমনকী ফিজিক্যাল রিহার্সাল ইউনিটেও, দিনের আলোর কোনও জায়গা নেই। তার বদলে হাইটেক ইলিউমিনেশান টেকনিক নকল আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখেছে।

গায়ে রোদ লাগতেই জিশানের ভালো লাগল। গরমে বিরক্ত হওয়ার কথাও ভুলে গেল।

ওরা মসৃণ রাস্তা ধরে হাঁটছিল। এ-রাস্তা শুধু হাঁটার জন্য। কারণ, রাস্তার দুপাশে ইংরিজিতে লেখা সাইনবোর্ড : WALKERS ONLY। তার নীচে একটা গাড়ির ছবি। তার ওপরে লাল রঙের 'X' চিহ্ন আঁকা।

রাস্তার দুপাশে সবুজ লন। লনে মিহি পালকের মতো ঘাস। দেখে মনে হয় সবুজ ভেলভেট। বা অনেকগুলো বাচ্চা টিয়াপাখি চুপ করে শুয়ে আছে।

কিন্তু এর নীচেই হয়তো লুকোনো রয়েছে রুক্ষ পাথর। জিশান ভাবল। এখানে বাইরের চেহারার সঙ্গে ভেতরের চেহারার এত গরমিল!

জিশান রিমিয়ার পাশে-পাশে হাঁটছিল। চাপা গলায় বলল, 'চিফ ইনস্ট্রাক্টর লোকটা সুবিধের নয়।'

'হুঁ।' ছোট্ট করে [illegible] দিল রূপকথা।

'আপনি ম্যাক্‌ডেং?' কৌতূহল চাপতে না পেরে জিগ্যেস করল।

'হুঁ—।'

'চিফ [illegible]ব ফিলিং টিলিং-এর কথা বলছিলেন...।'

[illegible]কথা ইশারায় জিশানকে চুপ করতে বলল। আঙুল তুলে দেখাল সামনের [illegible] ফুড প্লাজা। বিল্ডিং-এর গায়ে সিন্ডিকেটের লোগো। সুদৃশ্য গেটের সামনে পিস ফোর্সের দুজন গার্ড দাঁড়িয়ে।

রূপকথা এগিয়ে গিয়ে একজন গার্ডের সঙ্গে কথা বলল। তারপর জিশানকে ইশারায় কাছে ডেকে দরজার স্লটে নিজের স্মার্ট কার্ডটা সোয়াইপ করল।

ওরা ভেতরে ঢুকল।

ঢুকেই একটা ধাক্কা খেল জিশান। ভেতরের চেহারাটা যেমন বিচিত্র তেমনই সুন্দর। প্লাজার মেঝেটা ডানদিক থেকে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে।

জিশান গুনল। পাঁচটা পাক—পাঁচটা লেয়ার। লেয়ারের নতি কোণ এতই কম যে, সিঁড়ির ধাপের কোনও দরকার হয়নি।

প্লাজার দু-দিকের দেওয়াল স্বচ্ছ প্লাস্টিক কিংবা কাচ দিয়ে তৈরি। সেটার রং সামান্য নীল হওয়ায় রোদের তেজ কমানোর কাজ যেমন হয়েছে, তেমনই ভেতরে একটা নীল মায়া ছড়িয়ে দেওয়া গেছে। তার সঙ্গে রং মিলিয়ে ভেতরের অন্যান্য আলোও নীল।

প্লাজার মাপের তুলনায় লোকজন অনেক কম। তাদের কথাবার্তা এমনই নিচু গলায় চলছে যে, সবমিলিয়ে কোনও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে না। শুধু সাউন্ড সিস্টেমে চাপা মিউজিক বেজে চলেছে। চারদিকে একটা শান্ত আনন্দের ভাব।

রূপকথা জিশানের হাত ধরল। নিচু গলায় বলল, 'এখানে নানান জায়গায় স্পাই-ক্যামেরা লাগানো আছে। তা ছাড়া প্লেইন ড্রেসে গার্ডরাও ঘোরাফেরা করে। নজর রাখে যে, সিন্ডিকেটের এগেইনস্টে কোনও ছক কষা হচ্ছে কি না। সো বি কেয়ারফুল। আসুন—।'

সেকেন্ড লেয়ারের একটা টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা। চিলিং এসিতে জিশানের একটু শীত-শীত করছিল।

জিশান অবাক হয়ে দেখল, ওদের টেবিলে একটা চৌকোনা অংশে স্নিগ্ধ আলো জ্বলছে। সেখানে অনেকগুলো ব্যাক লাইটেড ছোট-ছোট খোপ—সেই খোপে আই-ফোনের রঙিন আইকনের মতো এক-একটা খাবারের ছবি। ছবির নীচে খাবারের নাম লেখা।

ধোঁয়া ওঠা কফির কাপের ছবিতে আঙুল ছোঁয়াল রূপকথা—দুবার। বলল, 'অবাক হবেন না। এটাই অর্ডার দেওয়ার সিস্টেম। হাইটেক সব ব্যাপার। এই

প্লাজায় যখন যে-যে আইটেম অ্যাভেইলেব্‌ল তখন সেইসব খাবারের নাম আর ছবি এই টাচস্ক্রিন অ্যাক্টিভেটেড আইকন মেট্রিক্স-এ ফুটে ওঠে। আইকনগুলো টাইম টু টাইম আপডেটেড হয়।'

'এবার স্টার্ট করুন।' বলল জিশান. 'গিভ অ্যান্ড টেক।'

'না, প্রথমে আপনি। বিকজ য়ু স্টার্টেড দ্য হোল গেম। বলুন, কী নাম রেখেছেন আমার—।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ কামড়াল জিশান। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বলছি। তবে আগেই বলে রাখছি, ব্যাপারটা স্পোর্টিংলি নেবেন। ও.কে.?'

'ও.কে.।' হাসল।

'নাম রেখেছি রূপকথা। নামটা খারাপ?'

রিমিয়া অদ্ভুত চোখে জিশানের দিকে তাকাল। একটু পরে বিষণ্ণ গলায় বলল, 'খুব ভালো নাম। আমি সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, রূপকথার মধ্যেই মানুষের আসল জীবন লুকিয়ে আছে। আমরা দেখতে চাই না, তাই দেখতে পাই না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'সেইজন্যেই এই নাম দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

টিপটপ ড্রেস পরা একজন বেয়ারা কফি নিয়ে এল। ট্রে থেকে কফির কাপ নামিয়ে দিল টেবিলে।

ফ্রস্টেড ক্রিস্টালের তৈরি কাপ-প্লেট। তার মধ্যে নীল আর গোলাপি রঙের ছটা।

বেয়ারা চলে যেতেই রূপকথা বলল, 'অর্কপ্রভও বলত, আমি খুব আজব পাবলিক। সবসময় গল্পের বইয়ের সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে রূপকথার দেশে বাস করি। কোনও বাস্তব বুদ্ধি নেই,.। কিন্তু একইরকম দেশে অর্কপ্রভও বাস করত। আমাদের জুটিটা ভারি অদ্ভুত ছিল।

'কে অর্কপ্রভ?' কফিতে চুমুক দিয়ে জিশান জিগ্যেস করল।

'আমার হাজব্যান্ড—ডেড হাজব্যান্ড।' মাথা নিচু করল রিমিয়া। ওর কফির কাপটাকে গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করতে লাগল। জিশান ওর চোখ দেখতে পাচ্ছিল না।

হঠাৎই কফির কাপের ওপারে জলের ফোঁটা পড়ল।

'সরি, রিমিয়া। আমি আপনাকে হার্ট করতে চাইনি। আই অ্যাম রিয়েলি সরি।'

মুখ তুলল। হাসছে। কিন্তু চোখের কোণে জলের কণা।

'আপনার হাজব্যান্ড কবে মারা গেছেন?'

'বেশিদিন নয়।' রুমাল বের করে চোখের কোণে চেপে ধরল : 'অ্যাবাউট ফোর মান্থস..।' স্কার্টের পকেটে রুমাল রেখে দিল।

'কী হয়েছিল?'

জোর করে হাসল রূপকথা। মাথা ঝাঁকিয়ে কফির কাপে চুমুক দিল। জিশানের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না। ও এখানকার কমপিটিশানে নাম দিয়েছিল। হাংরি ডলফিন। গেমটার নাম শুনেছেন তো?'

জিশান মাথা নাড়ল : হ্যাঁ, শুনেছে। শুধু শোনেনি নয়, গেমটার ভিডিয়ো রেকর্ডিংও টিভিতে দেখেছে।

'...তো সেই গেমটায় হাঙরের পেটে চলে গেল। হাঙরটাকে ডলফিন ভেবে ভুল করল। বাস, এন্ড অফ দা গেম...।'

কিছুক্ষণ ওরা দুজনেই চুপ করে রইল। শুধু কফির কাপে চুমুকের শব্দ শোনা যেতে লাগল। সাউন্ড সিস্টেমের মিউজিকটাকে দুঃখের সুর বলে মনে হচ্ছিল।

ধীরে-ধীরে পুরো গল্পটা শুনল জিশান।

অর্কপ্রভ ওল্ড সিটি থেকে এসেছিল। রিমিয়া তখনও এই আনন্দলোক জিমেই চাকরি করত। সেখানেই অর্কর সঙ্গে আলাপ।

অর্ক পড়াশোনা জানা ব্রাইট ইয়াং ম্যান ছিল। অনেক বিষয়ে খোঁজখবর রাখত। ওল্ড সিটিতে সাঁতারে বহুবার ফার্স্ট হয়েছে। ওর ভেতরে একটা চ্যালেঞ্জার পারসোনালিটি ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, ওরা ছিল ভীষণ গরিব। তাই হাংরি ডলফিন।

জিপিসি-তে অর্কপ্রভ ছিল একমাস মতন। তার মধ্যেই রিমিয়ার সঙ্গে পরিচয়, দুরন্ত আলাপ—এবং বিয়ে।

ওকে বিয়ে করতে চেয়ে শ্রীধর পাট্টার কাছে অ্যাপিল করেছিল রিমিয়া। সিন্ডিকেটের অনুমতি না পেলে কোনও এমপ্লয়ির সঙ্গে কোনও পার্টিসিপ্যান্টের বিয়ে মানে একটা ক্রাইম। সোজা কথায় পারমিশান ছাড়া এ ধরনের বিয়ে অসম্ভব।

শ্রীধর অনুমতি দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে এও বলেছিলেন, অর্কপ্রভ হাংরি ডলফিন গেম থেকে কিছুতেই উইথড্র করা যাবে না।

অর্কটা বোধহয় কিছুটা পাগল ছিল। কোনও নেগেটিভ ব্যাপারকে ও পাত্তা দিত না। সবসময় বলত, 'রিমিয়া, আমি জিতব। জিতবই।'

প্রথম কয়েকটা ছোটখাটো গেম-এ জিতে প্রাইজমানি পেয়েছিল অর্ক। সেইসব টাকা ও রিমিয়াকে দিয়েছিল। রিমিয়া আর অর্ক মিলে রিমিয়ার কোয়ার্টার সাজাতে শুরু করেছিল সংসার পাতবে বলে।

অর্ক বলত, 'হাংরি ডলফিন গেমটায় জিতলে বিশ লাখ টাকা। ভাবা যায়? বিশমিনিটে বিশলাখ। আর বিশমিনিটের আগে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলে একলাখ টাকা পার মিনিট। আমরা সত্যিকারের বড়লোক হয়ে যাব, রিমিয়া! ক্যান য়ু

বিলিভ ইট?'

অর্ক খুব অপটিমিস্ট ছিল।

কিন্তু হারে ডলফিন গেম ওকে শেষ করে দিল। ডলফিনের ছদ্মবেশে নেওয়া টাইগার-শার্কের ঝাঁক ওকে খতম করে দিল। একইসঙ্গে ওর স্বপ্নও খতম।

কথা বলতে-বলতে পকেট থেকে আবার রুমাল বের করল রিমিয়া। চোখ মুছে ভারী গলায় বলল, 'অর্ক চলে যাওয়ার পর থেকে আমি আরও বেশি করে স্বপ্ন দেখি। জোর করে স্বপ্ন দেখি। তাই ভালো না লাগলেও এই চাকরিটা আমি ছাড়িনি। সবসময় ভাবি, অর্ক আমাকে এই স্বপ্ন দেখার বিরাট দায়িত্বটা দিয়ে গেছে। আমাকে স্বপ্ন দেখতেই হবে। সবাইকে উইশ করতে হবে। সবাইকে জেতাতে হবে—শুধু ইচ্ছে দিয়ে জেতাতে হবে। আমি পারব না?'

শেষ প্রশ্নটা জিশানকে লক্ষ্য করে।

জিশানের খারাপ লাগছিল। অর্কপ্রভকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল ও। জিশান যেন পিট ফাইট-এ লড়ছে আর দর্শকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে অর্ক আর রূপকথা ওকে পাগলের মতো চিৎকার করছে, চেঁচাচ্ছে তারস্বরে : 'জি—শান জি—শান!'

'আমি পারব না, জিশান?' রূপকথা আবার জিগ্যেস করল।

জিশান ঘাড় হেলাল। আলতো করে বলল, 'পারবেন। আপনি পারবেন।'

নাক টানল রিমিয়া। ছোট্ট করে কেশে নিয়ে বলল, 'এই চাকরির যে কী অসুবিধে তা তো আপনি খানিকটা দেখেছেন। চিফের ওই হতচ্ছাড়া রিকোয়েস্ট। আমার হাজব্যান্ডের মৃত্যুতে উনি নাকি সাংঘাতিক মুষড়ে পড়েছেন তাই ওঁর ফিলিং এক্সপ্রেস করতে আমার কোয়ার্টারে আসতে চান। আপনি বলুন তো, জিশান, আমি সবসময় কী নিয়ে ভাবি, আর ওই লোকটা কী নিয়ে ভাবে! ও ভাবে আমি সবার গায়ে পড়া। পার্টিসিপ্যান্ট দেখলেই আমার চোখ দিয়ে লাল ঝরে। থুঃ!' মাথা ঝাঁকাল রিমিয়া। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আসলে সবাইকে আমি অর্কপ্রভ ভাবি। তাই সবাইকে আমি জেতাতে চাই। এটা কি চিফ কখনও বুঝতে পারবে? ওর চিন্তা এত নোংরা, এত ছোট...।'

জিশান নতুন চোখে রূপকথাকে দেখছিল। পিট ফাইটে জিততে হলে এইরকম একজন সাপোর্টার ভীষণ দরকার। জিশানের চোখে রূপকথার বাইরের সুন্দর আর ভেতরের সুন্দর একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

ও এবার মিনির কথা বলল রিমিয়াকে। বলল ছোট্ট শানুর কথা।

রিমিয়া মন দিয়ে শুনল। বলল, 'কাল আমাকে ওদের ফটো দেখাবেন?'

'দেখাব।' জিশান জানে মাইক্রোভিডিয়োফোন থেকে কীভাবে ছবি স্টোর করা যায়। তারপর ইউ. এস. বি. কেবল দিয়ে ওর ঘরে রাখা টার্মিনাল থেকে সহজেই তার প্রিন্ট বের করা যায়।

কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে হাতঘড়ির দিকে বারবার তাকাচ্ছিল রিমিয়া। হঠাৎই ও বলল, 'আমাদের হাতে আর দেড়মিনিট আছে...।' এবং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ওরা স্পাইরাল বেয়ে নেমে এল। ক্যাশ কাউন্টারে এসে স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করে বিল মেটাল রিমিয়া।

ফুড প্লাজার দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় ও জিগ্যেস করল, 'কবে আপনার পিট ফাইট?'

'আর সাতদিন পর—এই রোববারের পরের রোববার।'

'আমি ওটা দেখতে যাব। চিফ ইনস্ট্রাকটরকে বলে স্পেশাল লিভের বাবস্থা করব। চিফের রিকোয়েস্ট রাখব এই আশায় চিফ আমার অনেক রিকোয়েস্ট রাখে। বোধহয় ছুটি পেয়ে যাব।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল জিশান। বলল, 'আপনি দেখতে গেলে আমার খুব জিততে ইচ্ছে করবে।'

●

পিট ফাইটের গর্তটার কাছে পৌঁছে জিশান দৃশ্যটাকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল।

এই সাতদিনে পিট ফাইট নিয়ে আরও অনেক কিছু জেনেছে ও। এখন সেই তথ্যগুলোর সঙ্গে বাস্তবটাকে মনে-মনে যোগ করছিল।

নানানজনের মুখে ও শুনেছিল পিট ফাইটের বাঁধাধরা কোনও সময় নেই—দিনের যে-কোনও সময় হতে পারে। কিন্তু এখন যখন ওর নিজের লড়াইয়ের পালা এসেছে তখন ও এই প্রথম জানল পিট ফাইট রাতেও হতে পারে। যেমন, ওর লড়াই শুরু হবে ঠিক রাত একটায়।

এই রাতটাকে জিশান অন্য চোখে দেখছিল।

পিস ফোর্সের গার্ডের দল রাত ঠিক বারোটায় ওকে গেস্টহাউস থেকে নিতে এল। গার্ডরা ওর ঘরের কম্পিউটার টার্মিনাল অ্যাক্টিভেট করে দিতেই শ্রীধর পাত্রের ছবি ফুটে উঠল। সেইসঙ্গে জিশানের প্রতি নির্দেশও শোনা গেল : 'বাবু জিশান, কুইক। চটপট রেডি হয়ে নাও। কাম, কাম—ওয়েলকাম টু স্টেডিয়াম। পিট ফাইট। সি য়ু...।'

জিশানের ভেতরটা জ্বালা করে উঠল। কিন্তু ও ব্যস্তভাবে তৈরি হতে লাগল।

জিপিসি-র গেস্টহাউস থেকে কিউ-মোবাইলে রওনা হওয়ার সময় জিশান আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। সেই একই আকাশ। একই চাঁদ-তারা, ধূমকেতুর

একই লাল-নীল রঙিন আলো। কিন্তু আজকের রাতই ঠিক করে দেবে কাল সকালে সূর্য ওঠা জিশান দেখবে কি না।

পিট ফাইটের স্টেডিয়ামটা জিশানকে অবাক করল : ছোট মাপের আধুনিক স্টেডিয়াম। [illegible] হ্যালোজেন ল্যাম্পের আলো রাতকে দিন করে দিয়েছে। স্টেডিয়ামের ঠিক মাঝখানে তিরিশ ফুট ব্যাসের একটা গর্ত। গর্তটা মোটেই আধুনিক নয়। গোল করে কবর খুঁড়লে যেরকম কাদা-মাটির জমি পাওয়া যায়, ব্যাপারটা ঠিক তাই।

স্টেডিয়ামে এখনও দর্শক ঢোকানো শুরু হয়নি। পিস ফোর্সের চারজন গার্ড ফাঁকা স্টেডিয়ামে জিশানকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সবকিছু দেখাচ্ছিল। তার মধ্যে যে নেতা গোছের সে জিশানকে গাইডের ট্যুরের ধারাবিবরণী শোনাচ্ছিল।

গর্তটা প্রায় দশফুট গভীর। তার ভেতরে নামার কিংবা বেরিয়ে আসার কোনও ব্যবস্থা নেই। আর খালি হাতে গর্তের খাড়া দেওয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করাটা স্রেফ বোকামি। তা সত্ত্বেও যদি কেউ ভাগ্যের জোরে গর্তের কিনারায় হাত ছোঁয়াতে পারে তা হলে তার কপালে জুটবে ইলেকট্রিক শক—একহাজার ভোল্টের। কারণ, একটা সরু তার গর্তের কিনারায় ছোট-ছোট পোর্সিলেন বুশিং-এর ওপরে বসানো রয়েছে। ঠিক যেন একটা তারের পাঁচিল।

জিশান কমেন্টেটর গার্ডকে জিগ্যেস করল, 'কার সঙ্গে আমার লড়াই?'

গার্ড বলল, 'জানি না। ওটা শেষ মুহূর্তে সিন্ডিকেটের মার্শাল ঠিক করবেন।'

শ্রীধর পাট্টা ঠিক করবেন জিশানের প্রতিদ্বন্দ্বী।

জিশান একটু অবাক হল। এই যে গার্ডরা ওকে স্টেডিয়াম এবং যুদ্ধের জায়গাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাচ্ছে, সেরকম তো দেখানো উচিত ওর প্রতিদ্বন্দ্বীকেও! তা হলে তাকে কখন দেখানো হবে?

সে-কথাই ও গার্ডকে জিগ্যেস করল।

উত্তরে হাসল গার্ড : 'তোমার মতো আরও দুজনকে এরকম ঘুরিয়ে দেখানো হবে। একজন-একজন করে। অনেক সময় কী হয়, পিট ফাইটে নামার ঠিক আগে অনেকে ভয় পেয়ে যায়। প্যান্টে হিসি করে ফ্যালে। একবার তো একজন ফাইটার গর্তে নামার আগে পটি করে ফেলেছিল—' জোরে হেসে ফেলল গার্ড। ওর তিনজন সঙ্গীও ছোট করে হাসল।

গার্ড বলে চলল, 'তোমার বেশ কয়েকটা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট হয়েছে [illegible]'

জিশান মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, হয়েছে। তবে টেস্টের কারণ জিশানকে বলা [illegible]

'এই টেস্টগুলো থেকে বোঝা যায় কার নার্ভ কতটা স্ট্রং। তুমি ওইসব

টেস্টে ঠিকঠাক পাশ করে গেছ; তোমাকে নিয়ে কোনও প্রবলেম নেই। যারা পাশ-ফেলের বর্ডারে থাকে তাদের নিয়েই যত প্রবলেম। তবে তাদের কেউ-কেউ টিকে যায়। পিট ফাইটে নামে। অনেক সময় লাকের জোরে জিতেও যায়। আবার কারও-কারও ব্রেকডাউন হয়ে যায়। কান্নাকাটি করে। প্যান্টে ওইসব করে ফ্যালে। সেইসব ক্যান্ডিডেটকে নামালে লড়াই জমে না। তখন...।'

তখন কী হবে জিশান জানে।

স্টেডিয়ামে দর্শক হবে না। টিকিট বিক্রি হবে না। লাইভ টেলিকাস্ট জমবে না। বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া রেভিনিউ অনেক কমে যাবে।

তা হলে কে-কে নামবে জিশানের এগেইনস্টে? সাইকোলজিক্যাল টেস্টগুলোয় আর কে ঠিকমতো পাশ টাশ করেছে?

জিশান স্টেডিয়ামটা ভালো করে দেখছিল। বড়জোর দশহাজার দর্শকের জায়গা হতে পারে সেখানে। স্টেডিয়ামের চারদিকে একইরকম ডিজাইনের শৌখিন চেয়ার জ্যামিতিক ঢঙে সাজানো। তবে স্টেডিয়ামের এক-এক অংশে চেয়ারের রং এক-একরকম। সাদা, নীল, কমলা, সবুজ, আকাশি আর লাল।

এখন সব চেয়ার খালি। তবে একটু পরেই ভরতি হয়ে যাবে। পিট ফাইট স্বচক্ষে দেখার জন্য নিউ সিটির বাসিন্দাদের আগ্রহ কম নয়। কারণ, সুপার গেমস কর্পোরেশনের এই একটিমাত্র খেলাই গ্যালারিতে বসে দেখা যায়, ঠিকমতো এনজয় করা যায়। এই খেলাটা দেখার জন্য মানুষের আগ্রহ যে ফেটে পড়ে তার কারণ, সবাই জানে এর পরের ধাপই হল কিল গেম। যে-গেম-এর প্রাইজ মানি একশো কোটি টাকা। সেই গেম-এর খেলোয়াড়কে আগাম দেখা, এবং খালি হাতে লড়তে দেখা, কিছু কম উত্তেজনার ব্যাপার নয়।

পিট ফাইট যাতে দর্শকরা ভালোভাবে দেখতে পায় তার জন্য স্টেডিয়ামের দুপাশে গ্যালারির মাথায় দুটো জায়ান্ট টিভি স্ক্রিন। এ ছাড়া স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় করে থাকা দর্শকদের জন্য আরও দুটো জায়ান্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা আছে।

সবমিলিয়ে সবাইকে উত্তেজনার শরিক করে তোলার ব্যাপারে সিন্ডিকেটের বন্দোবস্তের কোনও ঘাটতি নেই।

আলো-ঝলমলে ফাঁকা স্টেডিয়ামটা জিশান ঘুরে ঘুরে দেখছিল আর কল্পনায় উত্তেজিত দর্শকদের হিংস্র উল্লাসের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল। আধুনিক প্রযুক্তি আর আদিম প্রবৃত্তির কী অদ্ভুত মিলন! একটু পরেই ওই কাদা-মাটির গর্তের মধ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে জিশানকে মরণপণ লড়তে হবে— জানোয়ারের মতো। যেমন করে হোক বেঁচে থাকতে হবে। তা হলে পাওয়া যাবে প্রাইজ মানি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, আর একশো কোটি টাকার গেম-এ ঢোকার ছাড়পত্র।

বাইরে থেকে জমায়েত দর্শকদের চিৎকার ভেসে আসছিল। স্টেডিয়ামের

গেট এখনও খোলা হয়নি বলে ওরা অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

জিশানের গ্রাউন্ড ট্যুর শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই গার্ডরা ওকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল পিট ফাইট প্যাভিলিয়নে।

প্যাভিলিয়নে এক-একজন পার্টিসিপ্যান্টের এক-একটা আলাদা এয়ারকন্ডিশানড ঘর। ঘরগুলো পার্টিশান ওয়াল দিয়ে এমনভাবে আলাদা করা যে, একজন খেলোয়াড় আর-একজনকে মোটেই দেখতে পাবে না। তবে প্রতিটি ঘরের দরজা দিয়ে বেরোলেই লম্বা করিডর। সাদা গ্রানাইট বসানো সেই করিডর চলে গেছে সোজা স্টেডিয়ামের ভেতরে—গর্তের কাছে।

প্যাভিলিয়নের তিন নম্বর ঘর জিশানের। অন্যান্য ঘরে কারা আছে ও জানে না। ওর ঘরে ফার্নিচার বলতে একটা সোফা, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা আয়না, একটা প্লেট টিভি, আর একটা ফ্রিজ। এ ছাড়া ঘরের এককোণে আছে আয়না বসানো একটা মিনি জিম—অনেকটা সোনো জিমের মতো। সেখানে পরীক্ষার আগে শেষ মুহূর্তের পড়ার মতো লড়াইয়ের আগে শেষ মুহূর্তের ব্যায়ামের জন্য হালকা কয়েকটা যন্ত্রপাতি রয়েছে। জিশান পনেরোমিনিটের জন্য গায়ের জামাটা ছেড়ে চেইন-পুলি আর বাটারফ্লাই ক্রাঞ্চ করে নিল। তারপর তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে চলে গেল উলটোদিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা ফ্রিজের কাছে।

ফ্রিজ খুলে দেখতে পেল দু-গ্লাস হেলথ ড্রিংক—ফাইবারের গ্লাসে রাখা। একটা গ্লাস নিয়ে খেয়ে নিল জিশান। ওর পিট ফাইট কোচ খেলার আগে এই ড্রিংক একগ্লাস খেতে বলেছে। এসি থাকায় এই ঘরের মধ্যে গরম কম। বাইরে ওই কাদা মাটির গর্তের মধ্যে গরম নিশ্চয়ই অনেক বেশি।

খালি গ্লাসটা ফ্রিজের ভেতরে ফিরিয়ে দিল জিশান। ফ্রিজের পাশেই টেবিলে রাখা ছিল একটা গোলাপি রঙের সিপিং ওয়াটার বটল। সিপারে ঠোঁট লাগিয়ে জল খেল ও। তারপর দেওয়ালে টাঙানো পাঁচকোনা আয়নায় নিজেকে একবার দেখল। ওর মনে হল আয়নার ওই পেশিবহুল চেহারাটা যেন অন্য লোকের। আর সেই অচেনা মানুষটার কাঁধের ওপরে জিশানের চেনা মুন্ডুটা বসানো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফায় বসে পড়ল জিশান। একটু পরেই লড়াই শুরু হবে। বুকের ভেতরে একটা চাপ টের পেল। দম যেন আটকে যেতে চাইছে। এ খেলায় হারলে খেল খতম। আর জিতলেও তাই। মাঝে শুধু কিল গেম-এর ছলনার ব্যবধান।

হঠাৎই হইহই আওয়াজ শুনে চোখ তুলল। তাকাল উলটোদিকের দেওয়ালে টাঙানো প্লেট টিভির দিকে। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে রিমোট তুলে নিল। ভলিয়ুমটা একটু বাড়িয়ে দিল।

স্টেডিয়ামে দর্শকরা ঢুকতে শুরু করেছে। লাউডস্পিকারে অদ্ভুত একটা

মিউজিক বাজছে। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা কমেন্টেটর তারই মধ্যে বকবক করে চলেছে।

'...একদিকে রয়েছে জিশান পালচৌধুরী। হাই স্কোরিং ফাইটার। আগের সবক'টা গেম এ জিশান যে শুধু কোয়ালিফাই করেছে তা নয়—দারুণ স্কোরও করেছে। স্পেশালিস্টদের ধারণা ওর মধ্যে ব্যাপক পোটেনশিয়াল রয়েছে। কিন্তু ওর সঙ্গে কে লড়বে? কে সেই সারপ্রাইজ ফাইটার?'

জিশানের মনে পড়ে গেল মালিকের কথা, ছুন্নুর কথা, কার্তিকের কথা, খালধারের সেই অন্ধকার রাতের ফাইটের কথা। টিভির কমেন্টেটরদের কথাবার্তাগুলো যেন খালধারের সেই টিংটিঙে রেফারির সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল।

'...আপনাদের একটা দারুণ খবর দিই। আজ স্টেডিয়ামে হাজির রয়েছেন আমাদের ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত মার্শাল শ্রীধর পাট্টা...।'

টিভি ক্যামেরা শ্রীধর পাট্টাকে দেখাল। জোরালো আলো পড়েছে ফরসা ছিপছিপে মানুষটার মুখে। ঠোঁট জোড়া এতই লাল যে, মনে হয় এইমাত্র পান অথবা রক্ত খেয়ে এসেছেন।

'...সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ!' কমেন্টেটর উত্তেজিতভাবে বলল, 'আমাদের মার্শালের অনারে আজ আসল ফাইটের আগে একটা সারপ্রাইজ ফাইট হবে। ডগ ফাইট।

'এই ফাইটটার পরেই হবে পিট ফাইট। দুটো ফাইট দেখার পর আপনারা কমপেয়ার করতে পারবেন লড়াইয়ের ব্যাপারে মানুষ এবং কুকুরের মধ্যে কী-কী মিল, আর কী-কী তফাত। ব্যাপারটা কি দারুণ ইন্টারেস্টিং নয়?...তোমার কী মনে হয়, রাজশ্রী?'

মহিলা কমেন্টেটর—যার নাম রাজশ্রী—ধারাবিবরণীর খেই ধরে বলল, 'ইট ইজ অ্যান একসিলেন্ট আইডিয়া, মণীশ। এরকম কমপ্যারিজন-এর স্কোপ আমরা আগে কখনও পাইনি, তাই না? সো লেট আস ওয়াচ, গাইজ...।'

ক্যামেরা গর্তটাকে বারবার দেখাচ্ছিল। দেখাচ্ছিল স্টেডিয়ামের দর্শকদেরও। এরপর মণীশ আর রাজশ্রী গর্তটার মেক্যানিকাল ডেটা টিভির দর্শকদের বলতে শুরু করল। তারই ফাঁকে-ফাঁকে পুরোনো পিট ফাইট-এর ভিডিয়ো ক্লিপিং দেখানো হতে লাগল। গত সাতদিন ট্রেনিং-এর সময় জিশানদের অনেক ফাইটের ভিডিয়ো দেখানো হয়েছে। পিট ফাইট কোচরা ফাইটার তৈরির কাজে সত্যিই আন্তরিক যত্ন নিয়েছেন।

বড় করে শ্বাস ফেলল জিশান। এখন যদি ডগ ফাইট হয় তা হলে বধ্যভূমিতে যেতে জিশানের এখনও কিছুটা দেরি আছে। একইসঙ্গে ওর মনে হল, ওল্ড সিটির জোড়াতালি দেওয়া ঘরে বসে মিনিও নিশ্চয়ই এই লাইভ টেলিকাস্ট দেখছে।

জিশানের হঠাৎ ইচ্ছে হল, এই ডগ ফাইটটা ও লাইভ টেলিকাস্ট-এ নয়—লাইভ দেখবে। কারণ তার পরের ডিজিটাল লড়াইটার জন্য ওর মনটা আরও হিংস্র আরও নৃশংস হওয়া দরকার। নিজেকে তৈরি করার জন্য ডগ ফাইটের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি টুকরো ওকে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে যাওয়াটা যদি ভবিতব্যও হয়, তা হলেও পিট ফাইটটা জিশান জিততে চায়। কারণ, এই লড়াইটা ও নিজের জন্য নয়—অনেকের জন্য লড়ছে, অনেকের হয়ে লড়ছে।

ডগ ফাইটটা স্বচক্ষে দেখার তেষ্টায় জিশানের বুক হঠাৎ শুকিয়ে গেল যেন। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। টেবিলে রাখা ওয়াটার বটল থেকে আবার অনেকটা জল খেল। তারপর দেওয়ালে গাঁথা কলিংবেলের পুশ বাটন-এ চাপ দিল। ৲

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই কোমরে শকার ঝোলানো একজন গার্ড ঘরে এসে ঢুকল। এই গার্ডকে জিশান আগে দেখেনি।

গার্ড বলল, 'কী দরকার বলো?'

হঠাৎই হাসি পেয়ে গেল জিশানের। শকার ঝোলানো গার্ডটাকে কেমন জোকারের মতো লাগছে না? ইচ্ছে করলে জিশান লোকটাকে এখুনি স্রেফ একহাতে মেরে ফেলতে পারে। ওর হাত-পাগুলো পাটকাঠির মতো পটপট করে মটকে ভেঙে দেওয়াটাও তেমন কঠিন নয়—তবে তখন আর একহাতে হবে না, দু-হাত লাগবে। তারপর কোথায় শকার, আর কোথায় গার্ড! মেঝেতে সব টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকবে। অথচ গার্ড বেচারা এসব বুঝতেও পারছে না। ভাবছে, শকার কোমরে ঝুলিয়ে ও কত শক্তিশালী।

ওর ভেতরে যে শক্তি টগবগ করে ফুটছে তার বুড়বুড়ির শব্দ পেল জিশান। শক্তিকণাগুলো পাগলের মতো মাথা খুঁড়ছে। বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজেদের ব্যবহার করতে চাইছে।

জিশানের পাগল-পাগল লাগছিল। ও গার্ডকে ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমি স্টেডিয়ামে বসে ডগ ফাইট দেখব—টিভিতে দেখব না।'

গার্ডটা জিশানের মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে। 'দেখছি কী করা যায়—' বলে চট করে চলে গেল।

পাঁচ থেকে দশসেকেন্ডের মধ্যেই গার্ড ফিরে এল। সঙ্গে একটি লম্বা রোগামতন মেয়ে। গায়ে সিন্ডিকেটের ইউনিফর্ম। হাতে একটা মোবাইল। কারও সঙ্গে কথা বলছে।

'...হ্যাঁ, স্যার। নিয়ে যাচ্ছি। স্পেশাল এনক্লেভে সিট আছে। সেখানেই বসাচ্ছি, স্যার। ও. কে., স্যার...।'

ফোন কেটে দিয়ে জিশানকে লক্ষ করে বলল, 'চলুন। পারমিশান গ্র্যান্টেড।

দিকে পা বাড়াল।

টিভির পরদায় তখন রাজশ্রী বলছে, 'শুরু হচ্ছে ডগ ফাইট। দুটো
ডেন কুকুরকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সঙ্গে তাদের ট্রেনার অভিজিৎ
কমলেশ্বর। গ্রেট ডেন আসলে ম্যাস্টিফ আর আইরিশ উল্‌ফহাউন্ডের ক্রস
দুটো ব্লাডলাইন মিশিয়ে ব্রিড করার জন্যে গ্রেট ডেনের সাইজও যেমন
শক্তিও অসাধারণ। সো উই এক্সপেক্ট আ গ্রেট ফাইট। আ গ্রেট সাইট।
ডু য়ু সে, মণীশ?'

মণীশ কী বলল সেটা জিশানের আর শোনা হল না। ও আর
তখন নির্জন করিডরে প্রতিধ্বনি তুলে হেঁটে চলেছে।

স্পেশাল এনক্লোজে আকাশি রঙের সিটে জিশানকে বসানো
চারপাশের দর্শকদের উত্তেজনার শোরগোলটা যেন মাইকে শোনা মউমাছির
একবার চোখ বুলিয়েই জিশান বুঝল দর্শকে স্টেডিয়াম টইটম্বুর। অসম্ভব
ওর চোখ রিমিয়াকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। চেনার সুবিধের
রিমিয়াকে বলেছিল লাল ড্রেস পরে আসতে।

রিমিয়াকে খুঁজে পেল না জিশান। চোখ ফিরিয়ে গর্তের দিকে
ওর সিট থেকে গর্তটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। আর যেটুকু জ্যামিতির জন্য
হচ্ছে সেটুকু ষোলোআনার বেশি পুষিয়ে দিচ্ছে জায়ান্ট টিভি স্ক্রিন।

গর্তের কিনারায় দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে অভিজিৎ
কমলেশ্বর।

অভিজিতের গায়ে টকটকে লাল রঙের ফুলহাতা শার্ট, আর পায়ে
প্যান্ট। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ওর গ্রেট ডেন। লম্বা-চওড়া কুকুর। হালকা
রং। কান দুটো ভাঁজ হয়ে ঝুলছে। মুখের ডগাটা কালচে। চোয়ালের নীচে
সামান্য ঝুলে আছে।

কুকুরটার পেটের কাছে দু-দিকেই লাল রঙের একটা ছাপ। গোল
মাপে টেনিস বলের মতো।

গর্তের ওপারে, অভিজিতের ঠিক বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আছে কমলে
গায়ে ক্যাটক্যাটে হলদে রঙের শার্ট আর পায়ে কালো প্যান্ট। ওর পাশে দাঁ
গ্রেট ডেনটার পেটে গোল হলদে ছাপ।

লাউডস্পিকারে মণীশ আর রাজশ্রীর ধারাবিবরণী চলছিল। ওরা বল
দুটো কুকুর যেহেতু একইরকম দেখতে সেহেতু কোনটা অভিজিতের আর
কমলেশ্বরের কুকুর সেটা স্পষ্টভাবে বোঝার জন্যই ওই লাল আর হলদে

দুটো কুকুরের গলাতেই চামড়ার কলার, সঙ্গে স্টিলের চেইন।

ট্রেনারই চেইনটা হাতে পাকিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে। কুকুর দুটো চেইন টেনে সামনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। চাপা গর্জন করছিল।

মাইকে কুকুর দুটোর নাম-ধাম পেডিগ্রি শোনা যাচ্ছিল। হলদে ছাপওয়ালা কুকুরটার নাম ইয়েলো, আর অন্যটার নাম রেড। রং অনুযায়ী নাম, অথবা নাম অনুযায়ী রং। ওদের বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। যখনই নিউ সিটিতে কোনও ডগ ফাইটের ব্যবস্থা করা হয় তখন কুকুর আনা হয় বিদেশ থেকে। ফাইটের আগে এখানে ওদের অ্যাক্লাইমেটাইজ করা হয় এবং ট্রেনিং দেওয়া হয়। অভিজিৎ ও কমলেশ্বর খুবই নামি ট্রেনার। ওরা এ-বিষয়ে বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

ধারাবিবরণী চলছিল আর টিভি ক্যামেরা বারবার ট্রেনার দুজন এবং কুকুর দুটোর ক্লোজ আপ দেখাচ্ছিল।

হঠাৎই স্টেডিয়ামের দুপাশের একটা ফোকর দিয়ে দুটো ক্রেনের ধাতব বাহু ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এল। এসে থামল অভিজিৎ আর কমলেশ্বরের কাছে।

ক্রেনের বাহুর প্রান্তে একটা ছোট কেবিন। দুজন করে গার্ড ছুটে চলে এল কেবিনের কাছে। ট্রেনারকে কুকুরসমেত কেবিনে উঠতে সাহায্য করল। তারপর ক্রেন নিখুঁতভাবে ট্রেনার ও কুকুরকে নামিয়ে দিল গর্তের ভেতরে।

মাইকে তখন রাজশ্রীর গলা : '...শুনলে আপনাদের ভালো লাগবে—লড়াইটা যাতে থ্রিলিং হয়, এনটারটেইনিং হয় সেজন্যে ইয়েলো আর রেডকে আজ সারাদিন খেতে দেওয়া হয়নি। সো উই এক্সপেক্ট আ ভেরি থ্রিলিং ফাইট, আ ভেরি এনটারটেইনিং ফাইট, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন...।'

ট্রেনার দুজন কুকুর নিয়ে একইসঙ্গে কেবিন থেকে নেমে গেল গর্তের মাটিতে। কুকুর দুটোকে গর্তের দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড় করাল। গলা থেকে কলার খুলে নিল। খালি হাতে কুকুরটার ঘাড় ধরে রইল। তারপর মাইকে যেই শোনা গেল 'ওয়ান, টু, থ্রি—স্টার্ট।' অমনি কুকুরটার গালে একটা থাপ্পড় মেরে ট্রেনার তার মুখটা সামনে ঘুরিয়ে দিল।

ইয়েলো আর রেড এখন মুখোমুখি। পরমুহূর্তেই দুই ট্রেনার লাফিয়ে উঠে পড়ল যার-যার কেবিনে। এবং ক্রেন কেবিনটাকে টেনে তুলে নিল শূন্যে।

শুরু হয়ে গেল ডগ ফাইট।

দুটো ক্রেন তখন দুজন ট্রেনারকে নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে চলেছে।

ইয়েলো আর রেড মুখোমুখি ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ওদের ধারালো দাঁতের কামড়গুলো মাংস পেল না—পেল বাতাস। তাই চোয়ালের শব্দ হল।

জিশান অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করল। কুকুর দুটো কোনও শব্দ করছে না। গরগর শব্দও নয়। নিঃশব্দে লড়ছে। শব্দহীন যন্ত্রের মতো।

দ্বিতীয়বার যখন ইয়েলো আর রেড পরস্পরের দিকে ঝাঁপাল তখন ওদের মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি লাগল। ইয়েলো চিত হয়ে ছিটকে পড়ল। রেড হাঁ করে

খেয়ে গেল। কামড় বসাতে চাইল ইয়েলোর গলায়। কিন্তু ইয়েলো ঝটিতি মাথা তুলে রেডের নাকে কামড় বসাল। এবারে মাংসে দাঁত বসেছে।

দর্শক হইহই করে উঠল। মণীশের ধারাবিবরণী থেকে জিশান বুঝল, রেড আর ইয়েলোর মধ্যে কে জিতবে তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বাজি ধরা শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার খালপাড়ের সেই লড়াই।

রেড তখন ইয়েলোকে হেঁচড়ে টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে গর্তের মধ্যে। ওর নাক থেকে কামড় ছাড়াতে চেষ্টা করছে। বারেবারেই মাথা ঝাঁকুনি দিচ্ছে। টিভির ক্লোজ আপে দেখা যাচ্ছে রেডের রক্তাক্ত নাক।

শেষ পর্যন্ত মারাত্মক এক ঝটকায় মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের নাক ছাড়াতে পারল রেড। তবে নাকের খানিকটা অংশ ওকে খোয়াতে হল।

ইয়েলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই রেডের ওপরে ঝাঁপাল। ওর হাঁ করা চোয়ালের কাছ থেকে চকিতে মাথা সরিয়ে নিল রেড। ইয়েলোর দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি হল। লালা ছিটকে বেরোল শূন্যে।

টিভি স্ক্রিনের দৌলতে লড়াইয়ের বীভৎস খুঁটিনাটিও নিখুঁতভাবে দেখা যাচ্ছিল। দর্শকরা উত্তেজনায় পাগলের মতো চিৎকার করছিল। অভিজিৎ আর কমলেশ্বর গর্তের কিনারায় ছোটাছুটি করে ঘুরপাক খেয়ে যার-যার কুকুরকে চেঁচিয়ে নানান ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিল।

রেড ইয়েলোর ডান কানটা কামড়ে ধরল। কামড়ে যে যথেষ্ট জোর ছিল সেটা বোঝা গেল প্রবল ঝাঁকুনির বহর দেখে। চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দেওয়ার মতো রেড ইয়েলোকে হ্যাঁচকা-ঝাঁকুনি দিয়ে চলল। ইয়েলোর অতবড় শরীরটা ক্রেনের হুকে ঝোলানো ভেজা তুলোর বস্তার মতো অসাড় হয়ে রইল, লাট খেতে লাগল।

কয়েকটা প্রবল ঝাঁকুনির পর ইয়েলোর কান চলে এল রেডের মুখে। সেখান থেকে টুকরোটা ছিটকে পড়ল ভেজা মাটিতে।

জিশানের গা গুলিয়ে উঠল। মনে হল, এই বুঝি বমি পাবে ওর। লড়াই থেকে চোখ সরিয়ে নিল। পরপর কয়েকটা ঢোক গিলে বমির ভাবটা সামলে নিল।

টিভির পরদায় ইয়েলোর কানের টুকরোটার ক্লোজ আপ দেখাচ্ছিল। কমেন্টেটরের গলা তখন উত্তেজনায় উঁচু পরদায় পৌঁছে গেছে। মণীশ বলছে, '...ওই দেখুন, ইয়েলোর কান। রেড ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর কান ছিঁড়ে নিয়েছে। তা হলে বুঝে দেখুন, রেডের দাঁত কত ধারালো, ওর চোয়াল কত শক্তিশালী! গ্রেট ডেন কুকুর বলে কথা! এদের মধ্যে আইরিশ উল্ফহাউন্ডের জিন রয়েছে...।'

জিশানের মনে হচ্ছিল, ও নিজের লড়াইয়ের ধারাবিবরণী শুনছে। গর্তের মধ্যে যে-জিশান লড়ছে সে অন্য জিশান।

পাবলিকের চিৎকারে জিশানের কানে তালা লেগে যাচ্ছিল। কুকুর দুটোর রক্তারক্তি লড়াই দেখে তারা সব উত্তেজনার তুঙ্গে। কখনও 'রেড! রেড!' চিৎকার শোনা যাচ্ছে, কখনও বা 'ইয়েলো! ইয়েলো!'

পুরো ব্যাপারটা জিশানকে পুরোনো আদিম ইতিহাসে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। যখন মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখেনি, চাকা আবিষ্কার করেনি। যখন মানুষ সোজা হয়ে ঠিকঠাক দাঁড়াতেও পারত না।

গর্তের মধ্যে কুকুর দুটো তুলকালাম লড়াই করছিল। এখন ওরা আর চুপচাপ নয়। ওদের গর্জন চিৎকার ইত্যাদি শোনা যাচ্ছে। ওরা শূন্যে লাফিয়ে উঠছে, গায়ে-গায়ে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে, গর্তের দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে। ওদের শরীরের নানান জায়গায় কাদার ছোপ আর রক্তের দাগ।

অভিজিৎ আর কমলেশ্বর একনাগাড়ে উত্তেজিতভাবে ছোটাছুটি করছে। চিৎকার করে নিজের-নিজের কুকুরকে নির্দেশ দিচ্ছে। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ওরা গর্তের মধ্যে নেমে পড়বে।

হঠাৎই ইয়েলো প্রবল চিৎকার করে উঠল। জিশান চোখ ফেরাল গর্তের দিকে।

একমুহূর্তের সুযোগে রেড ইয়েলোকে চিত করে ফেলেছে। এবং অলৌকিক ক্ষিপ্রতায় ইয়েলোর পেটে এক ভয়ংকর কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

ইয়েলো মাথা তুলে রেডের গলায় কামড় বসাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওর চোয়ালে বোধহয় আর ততটা ক্ষমতা ছিল না। কামড়গুলো রেডের লোমের ওপরে পিছলে যাচ্ছিল।

ততক্ষণে রেড ওর কাজ সেরে ফেলেছে। ইয়েলোর পেটে আরও একটা গভীর কামড় বসিয়েছে এবং চোয়ালের এক হ্যাঁচকায় ইয়েলোর নাড়িভুঁড়ির অনেকটাই বাইরে বের করে ফেলতে পেরেছে।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। আর ইয়েলো যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল।

'দে, দে —খতম করে দে!' দর্শকের চিৎকার শোনা গেল।

'আরে মাথামোটা, গলা কামড়ে ধর!'

'শাবাশ, রেড! তুই কুত্তার বাচ্চা না—বাঘের বাচ্চা!'

এ ছাড়া সমবেত কণ্ঠে 'রেড! রেড!' বলে চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। গোটা স্টেডিয়াম যেন টগবগ করে ফুটছে।

জিশান দেখল, প্রতিটি দর্শক সামনে ঝুঁকে বসেছে। ওদের লালচে মুখে ঘামের বিন্দু। চোখ উত্তেজনায় যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। হিংস্র লালসা ছাপ ফেলেছে চোখে-মুখে। ওরা যেন কয়েকমুহূর্তের জন্য গর্তে নেমে পড়েছে। গ্রেট ডেন কুকুর হয়ে গেছে নিজেরাই। টান-টান উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ উপভোগ করছে—অথচ কোনও যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে না।

ইয়েলোর পাগুলো শূন্যে সাইকেল চালানোর চেষ্টা করছিল। ওর ছটফটানি নিভে আসছিল।

দর্শকদের সমবেত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।

'খতম কর! খতম কর! শেষ করে দে!'

'কিল হিম! কিল হিম!'

ইয়েলোর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু রেড তখনও ওর ছেঁড়া পেটের ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে কী যেন খুঁজে চলেছে।

হঠাৎই তীব্র এক হুইস্‌ল শোনা গেল। রাতের বাতাস ছুরি দিয়ে চিরে দিল যেন কেউ। তারপরই মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, লড়াই শেষ। রেড জিতেছে।

তখনই ক্রেনের বাহু দুটো স্টেডিয়ামের দু-দিকের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল। দুটো কেবিনে উঠে পড়ল দুই ট্রেনার—কমলেশ্বর আর অভিজিৎ। কেবিন দুটো গর্তের ভেতরে নামতে শুরু করল।

ততক্ষণে টিভির পরদায় ডগ ফাইটের চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গেছে। দুজন বিশেষজ্ঞ সুচিন্তিত মতামত দিচ্ছেন। একইসঙ্গে পরের লড়াইটা কার ফেবারে যেতে পারে তা নিয়েও আলোচনা করছেন।

দর্শকদের চিৎকার এখন কমে গেছে। তার বদলে শুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা আর গুঞ্জন। মাথার ওপরে খোলা আকাশ থাকলেও কেমন যেন একটা গুমোট ভাব জাঁকিয়ে বসেছে। কে জানে বৃষ্টি হবে কি না।

জিশান জায়ান্ট টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েছিল। না, কোনও ফাইটারের নাম ওঁরা বলছেন না। যা বলার জেনারেল টার্মস-এ বলছেন। যেমন, পিট ফাইট জেতার জন্য মেজর ফ্যাক্টরগুলো হল : বডি ওয়েট, স্পিড, হাইট, রিচ, স্কিল, মাস্‌ল পাওয়ার আর সাইকোলজিক্যাল স্টেবিলিটি। আর এগুলোর মধ্যে শেষেরটাই সবচেয়ে জরুরি।

টিভি ক্যামেরা এবার গর্তের ক্লোজ আপ দেখাল।

রেড এখনও ইয়েলোকে নিয়ে ব্যস্ত। অভিজিৎ ওর কাছে গিয়ে ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে একটু আদর করল। তারপর টেনে সরিয়ে নিয়ে এল। কমলেশ্বরকে বলল, 'আপনার কুকুরটা এখনও বেঁচে আছে।'

কমলেশ্বর অভিজিতের কথার কোনও জবাব দিল না।

রেড অভিজিতের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। সারা গায়ে দাঁত-নখের চিহ্ন, রক্তের দাগ। ওর দিকে একবার তাকাল কমলেশ্বর। তারপর নিজের হেরে যাওয়া গ্রেট ডেনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কার সঙ্গে যেন দশ-পনেরো সেকেন্ড কথা বলল।

কথা শেষ হতেই ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলভার বের করে

নিল কমলেশ্বর। ডাবল অ্যাকশন 0.44 ম্যাগনাম। স্টেইনলেস স্টিলের লম্বা নল। স্যান্টোপ্রিন-ওয়ান এর তৈরি কালো গ্রিপ।

ইয়েলোর মাথা তাক করে পরপর তিনবার গুলি করল। ইয়েলোর শূন্যে উঠে থাকা পা একটুও কাঁপল না—শুধু একপাশে কাত হয়ে গেল। আর একইসঙ্গে ছুরিটা পটি করে দিল।

রেড কী বুঝল কে জানে: চট করে চলে এল ইয়েলোর ডেডবডির কাছে। মাথার কাছে মুখ নিয়ে বারকয়েক কী শুঁকল। তারপর পিছনের এক পা তুলে ইয়েলোর মুখে পেচ্ছাপ করে দিল। পেচ্ছাপের রং টকটকে লাল।

অভিজিৎ ওর কুকুরকে ডেকে নিয়ে ক্রেনের কেবিনে ঢুকল। ক্রেন ওদের তুলে নিল গর্ত থেকে—নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজন মেডিক রেডকে নিয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে চলে গেল। চিকিৎসা করে ওরা রেডকে সুস্থ করে তুলবে। অভিজিৎও ওদের সঙ্গে হাঁটা দিল।

কমলেশ্বরও কেবিনে চড়ে ওপরে উঠে এসেছিল। ও মোবাইল ফোন বের করে কাকে যেন ফোন করল। কথা বলতে-বলতেই প্যাভিলিয়নের পথ ধরল।

সঙ্গে-সঙ্গে সুইপারদের ইউনিট এসে হাজির হল। ওরা দরকারি যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্রেনে চড়ে গর্তে নেমে গেল। পাঁচমিনিটের মধ্যেই জায়গাটা সাফ করে দিল। মরা কুকুর আর নোংরা হয়ে যাওয়া মাটির সিলড প্যাকেট নিয়ে ওরা ওপরে উঠে এল। পিট এখন আবার লড়াইয়ের জন্য তৈরি। এবার লড়বে মানুষ।

বাইরে শান্ত থাকার চেষ্টা করলেও ভেতরে ভেতরে জিশান উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। টের পাচ্ছিল ও ঘামছে। টেনশনটা কমানোর জন্য ও দর্শকের ভিড়ে আবার রূপকথাকে খুঁজল। ও বলেছিল, লাল ড্রেস পরে আসবে। এ-কথা ভাবতেই ওর রেডের কথা মনে পড়ল। আর তখনই মাইকে ঘোষণা করা হল : 'এইবার শুরু হবে আজকের পিট ফাইট। লড়বে এমন একজন ফাইটার যে এর আগে অনেকগুলো গেম জিতেছে। কিল গেম-এর একজন মেজর পার্টিসিপান্ট। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, প্লিজ ওয়েলকাম আওয়ার ফেভারিট পার্টিসিপান্ট জিশান পালচৌধুরী।'

টিভি ক্যামেরা জিশানের মুখে জুম করল। জায়ান্ট স্ক্রিনের পরদা জুড়ে এখন জিশানের মুখ।

জিশানকে দেখেই দর্শকরা হইহই করে উঠল। কারণ, জিশান নিউ সিটির রিয়ালিটি শো-র খুব চেনা মুখ। অনেকগুলো গেম-এ জিতেছে। কিল গেম-এ পার্টিসিপেট করার দৌড়ে রয়েছে।

দর্শক আবার পাগলের মতো চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল। আওয়াজ উঠছিল : 'জি—শান! জি—শান!'

প্রথম থেকেই জিশান খেয়াল করেছিল আশপাশের দর্শকদের অনেকেই

কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে। ওর দিকে গোপন ইশারা করে দেখাচ্ছে।

এতক্ষণ যেটা ছিল দর্শকদের দোলাচলে ঘেরা অনুমান, এখন সেটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে বদলে দিয়েছে জায়ান্ট টিভি স্ক্রিন।

জোরালো স্পট লাইট এসে পড়ল জিশানের ওপর।

নীল ইউনিফর্ম পরা একটি ভারি চেহারার মেয়ে কোথা থেকে যেন চলে এল জিশানের কাছে। বুকে কোড নম্বর লেখা স্টিকার।

মেয়েটি বলল, 'জিশান, উড য়ু প্লিজ স্ট্যান্ড আপ ফর আ মিনিট?'

জিশান উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকদের তুমুল চিৎকার কয়েক ধাপ বেড়ে গেল।

জায়ান্ট স্ক্রিন তখন জিশানের ছবির পাশে স্ক্রোল করে দেখিয়ে চলেছে জিশানের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স : ওজন, উচ্চতা, বাহুর দৈর্ঘ্য, পায়ের দৈর্ঘ্য, বুকের মাপ, কোমরের মাপ ইত্যাদি। এবং তার সঙ্গে মণীশের ধারাবিবরণী।

তারপরই স্ক্রিনে দেখানো শুরু হল ওর নানান কমপিটিশানের ভিডিয়ো রেকর্ডিং-এর অংশ : শিবপদর সঙ্গে লড়াই, কোমোডোর সঙ্গে মোকাবিলা, স্নেক লেকের দৌড়। রেকর্ডিং-এর বিশেষ বিশেষ অংশ আবার স্লো মোশানে দেখানো হচ্ছিল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক্সপার্ট কমেন্টস।

জিশান অবাক হয়ে দেখছিল, টিভির ছবিগুলো 'পশু' জিশানকে কী নিখুঁতভাবেই না দর্শকদের সামনে পেশ করছিল।

জিশান বসে পড়ল।

তারপরই ওকে অবাক করে দিয়ে টিভিতে দেখানো হল ওর এলিভেটারের লড়াই—রণজিৎ পাত্রের সঙ্গে। এবং সেই ছবির পরই রোলারবল এপিসোড।

রোলারবল এপিসোড দেখানোর সময় রাজশ্রী বারবার জিশানের অলৌকিক সহ্যশক্তির প্রশংসা করছিল। বলছিল, বহুদিন পর নিউ সিটি এমন একজন পার্টিসিপ্যান্ট পেয়েছে যে শুধু মারতে জানে না, মার খেতেও জানে।

জিশানের অডিয়ো-ভিশুয়াল পরিচয়ের পালা আরও কিছুক্ষণ ধরে চলল। তারপর রাজশ্রী বলল, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, এইবার আপনাদের জানাব সেকেন্ড ফাইটারের নাম। এই নামটা এইমাত্র আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। নামটা সিলেক্ট করেছেন আমাদের ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্টের মার্শাল মাননীয় শ্রীধর পাত্র...।'

সঙ্গে-সঙ্গে টিভির পরদায় চলে এল শ্রীধর পাত্রের ছবি।

'...জিশানের সঙ্গে আজ পিট ফাইট যে লড়বে সেও কম নয়। এর আগে অনেকগুলো কমপিটিশানে সে জিতেছে। নিজেকে বারবার প্রমাণ করেছে। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, লেট আস ওয়েলকাম দা গ্রেট ফাইটার মনোহর সিং...।'

জিশানের হাত থেকে একরাশ কাচের বাসন পড়ে গেল যেন। ওর সারা শরীর ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। একটা কান্নার দমক ঠেলে উঠল বুকের ভেতরে।

ওঃ ভগবান!

শেষ পর্যন্ত মনোহর সিং!

মণীশের পলকে জায়ান্ট স্ক্রিনে মনোহর সিং-এর ছবি ফুটে উঠল। ক্যামেরা ওর হাত পা-কাঁধের পেশির ক্লোজ আপ দেখাতে শুরু করল। তারপর পৌঁছে গেল ওর মুখে।

কিন্তু এ কোন মনোহর সিং!

চাপ-চাপ লোহা দিয়ে তৈরি ওর শরীরের পেশি। মাথায় কদমছাঁট চুল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট থাকলেও মনোহরের সরল মুখে সবসময় হাসির ছোঁওয়া। ও অনেক কিছু পারে। এত অভাবের মধ্যে থেকেও ও প্রাইজ মানির পঞ্চাশহাজার টাকা জিশানের ছেলেকে উপহার দিতে পারে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কোমোডো ড্রাগনের শরীরে কামড় বসাতে পারে।

সেই হাসিখুশি উদার অশিক্ষিত মানুষটা এখন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে জল। চোয়াল শক্ত করে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে। বলছে 'নহি! নহি!' কিন্তু অডিয়ো সিস্টেম লাগানো নেই বলে শুধু ওর ঠোঁট নাড়াটা দেখা যাচ্ছে।

মনোহরের ছবির সঙ্গে মণীশ আর রাজশ্রীর ধারাভাষ্য চলছিল। গেম সিটিতে আসার পর থেকে মনোহর সিং লড়াইয়ে কী-কী কারিশমা দেখিয়েছে, কোন-কোন কম্পিটিশানে কীভাবে জিতেছে, সেসব কথা ওরা অনর্গল বলে চলেছে।

'...মনোহর সিং কোমোডো ড্রাগনের কামড় খেয়েছে, বিষধর সাপের ছোবল খেয়েছে—কিন্তু তাও ও হারেনি। হি ইজ আ বর্ন উইনার। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনারা...।'

জিশানের কানে টিভির ধারাবিবরণীর একটা শব্দও ঢুকছিল না। ও শুধু মনোহরের গাল বেয়ে নেমে আসা চিকচিকে জলের রেখা দেখছিল আর শ্রীধর পাট্টার সর্বনাশা বুদ্ধির শক্তি আঁচ করছিল। কিল গেম-এ যাওয়ার আগে শুধু গায়ের জোরের লড়াই নয়, মনের জোরের লড়াইও জিততে হয়।

জিশানের হাত-পাগুলো যেন রবারের হয়ে যাচ্ছিল। ও উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ওর শরীরের শিরা-উপশিরায় তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। একটা চিনচিনে জ্বালা ছড়িয়ে যাচ্ছিল প্রতিটি স্নায়ুতে।

জিশানের ভয় হচ্ছিল, ওর রবার হয়ে যাওয়া শরীর না গলে যায়! গলে কনডেন্সড মিল্কের মতো গড়িয়ে যায় স্টেডিয়ামের মেঝেতে!

জিশান চিৎকার করে বলতে চাইল, 'মনোহরের সঙ্গে আমি লড়ব না—কিছুতেই না।' কিন্তু ওর ঠোঁট থরথর করে কাঁপল শুধু—কোনও শব্দ বেরোল না।

কিন্তু মনোহর সিং প্রতিবাদে ফেটে পড়ল।

ওর কোনও কথা শোনা যাচ্ছিল না, কিন্তু মূকাভিনয়ের মতো ব্যাপারটা জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছিল।

মনোহর পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছিল। টিভি ক্যামেরা খানিকটা পিছিয়ে যেতেই দেখা গেল চারজন গাঁট্টাগোট্টা সিকিওরিটি গার্ড মনোহরের দুটো হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। মনোহর প্রবল শক্তিতে ট্যানাহ্যাঁচড়া করছে, ওদের বাঁধন ছাড়াতে চেষ্টা করছে। ওর গলার শিরা ফুলে উঠেছে।

স্টেডিয়ামের দর্শক মনোহরের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারছিল। ওরা হইহই চিৎকারে মনোহরকে 'দুয়ো' দিতে লাগল। দর্শকের ক্ষিপ্ত গর্জনে টিভির ধারাবিবরণী ডুবে গেল।

জিশানের মনখারাপ হয়ে যাচ্ছিল। একটা মানুষ জীবনের মূল্যবোধ বজায় রাখতে বলছে, 'জিশানের সঙ্গে লড়ব না।' আর সেই কারণে পাবলিক তাকে 'দুয়ো' দিচ্ছে!

নিউ সিটির মূল্যবোধের বিকৃত আকারটা জিশানকে আরও একবার ব্যথা দিল। মনোহরের করুণ অবস্থা দেখে ওর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ওর চোখ যে জলে ভরে উঠেছে সেটা জিশান টের পাচ্ছিল, কিন্তু চোখের জল ফেললে চলবে না। টিভি ক্যামেরার চোখ যে-কোনও মুহূর্তে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তখন স্টেডিয়ামের দর্শকরা, নিউ সিটির আরামের ফ্ল্যাটে টিভির সামনে বসে থাকা দর্শকরা, দেখবে জিশান কাঁদছে—ফাইটার জিশান কাঁদছে।

জামার হাতা দিয়ে চোখের জল মুছে নিল। তারপর জোর করে রিমিয়ার কথা ভাবতে শুরু করল। কোথায় লাল ড্রেস পরা মেয়েটা? এই স্টেডিয়ামে ঠিক কোন জায়গাটায় বসে আছে ও? জিশানের দুঃখ নিশ্চয়ই ওর চেয়ে বেশি নয়! স্টেডিয়ামের গিজগিজে দর্শকের ওপরে সন্ধানী চোখ বোলাতে লাগল। চোখজোড়া যে জ্বালা করছে সেটা ভুলতে চাইল।

হঠাৎই জায়ান্ট স্ক্রিনের দিকে চোখ গেল জিশানের। কারণ, এইমাত্র ও একটা অদ্ভুত অ্যানাউন্সমেন্ট শুনতে পেয়েছে। মণীশ[illegible] বলছে, 'সারপ্রাইজ, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, সারপ্রাইজ! এইমাত্র আমাদের কাছে একটা স্পেশাল ইনফরমেশান এসে পৌঁছেছে। মনোহর সিং কিল-ফাইট থেকে ব্যাক আউট করেছে বলে আমাদের মাননীয় মার্শাল শ্রীধর পাট্টা এইমাত্র ওর শাস্তি ঘোষণা করেছেন—খুব সহজ শাস্তি—"হাউন্ড গেম"। নরমালি এই ধরনের ব্যাক আউটের কেসে সিন্ডিকেটের তরফ থেকে "ডগ স্কোয়াড" শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সেটাকে

ইনজিনিয়াসলি মডিফাই করেছেন আমাদের মাননীয় মার্শাল। এবারে আপনারা তাঁর কথা শুনুন...।'

সঙ্গে-সঙ্গে জায়ান্ট টিভির পরদায় শ্রীধরকে দেখা গেল। তিনি চিবিয়ে-চিবিয়ে নিচু গলায় বলছেন, 'ওকে শাস্তি দেব। আর-একটা খেলা খেলব। ও জিশানের সঙ্গে লড়বে না। তাই শেম, শেম। হাউন্ড গেম। ওই গর্তে নামবে ও [illegible]। সেইসঙ্গে পাঁচটা হাউন্ড যাবে দেখা...।'

ছন্দবাণী শেষ করে অদ্ভুতভাবে হাসলেন শ্রীধর। ওঁর ঠোঁট সামান্য চওড়া হল, চোখের কোণে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। মুখের আর কোনও পেশি নড়ল না। মরা মানুষ হাসতে পারলে বোধহয় এইভাবেই হাসত।

কয়েকসেকেন্ড চুপ করে থেকে শ্রীধর ঠান্ডা গলায় আবার বললেন, 'শেম, শেম। হাউন্ড গেম।'

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনার হিংস্র রসদ খোঁজা দর্শকের দল শ্রীধরের তালে তাল মিলিয়ে গর্জন করে উঠল, 'শেম, শেম। হাউন্ড গেম।'

শ্রীধরের কথার মধ্যে পদ্যের লুকোনো ছন্দ জিশানের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু ও কেমন যেন শক পেয়ে স্থবির চোখে টিভির পরদার দিকে তাকিয়ে ছিল।

দর্শকদের উল্লাসের চিৎকার জিশানের ঘোর কাটিয়ে দিল। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল হাউন্ড গেম-এ কী হতে চলেছে। আর ঠিক তখনই মণীশের উত্তেজিত কমেন্ট্রি শোনা গেল।

'...একটা নতুন গেম। গর্তের ভেতরে পাঁচটা হাউন্ডের সঙ্গে লড়বে ফাইটার মনোহর সিং—ডাকাবুকো বর্ন ফাইটার মনোহর সিং...।'

লড়বে? নাকি মরবে? ভাবল জিশান।

ও দেখল, দুটো ক্রেন তাদের কাজ শুরু করেছে। কুচকুচে কালো রঙের পাঁচটা হিংস্র হাউন্ডকে একে-একে গর্তের ভেতরে নামিয়ে দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে কোনও ট্রেনার নেই। একটা নিরস্ত্র মানুষকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য কোনও ট্রেনারের দরকারও নেই।

ওরা গর্তের ভেতরে এলোমেলো ছুটোছুটি করতে লাগল।

শ্রীধর পাট্টার ছবি সরে গিয়ে জায়ান্ট স্ক্রিনে আবার ফিরে এসেছে মনোহর সিং-এর মুখ। এবার ওর অডিয়ো সিস্টেম কাজ করছে। শোনা যাচ্ছে ওর পাগলের মতো চিৎকার।

'...জিশান ভাইয়াসে ম্যায় নহি লড়ুঙ্গা। তুম লোগ ইয়ে কাম মুঝসে নহি করা সকতে। নহি লড়ুঙ্গা ম্যায় মেরে জিগরি দোস্তসে। অওর কোই ভি ফাইটার হমে মনজুর হ্যায়, পর জিশানভাইয়া? কভি নহি...।'

জিশান অবাক হয়ে সহজ-সরল মানুষটাকে দেখছিল। লোকটা ওই গর্তের

মনোহরকে এবার সরাসরি দেখা গেল। প্যাভিলিয়নের করিডর ধরে টডিয়ামে চলে এসেছে। ওর গায়ে টকটকে লাল রঙের জিম ভেস্ট আর ক ঙের বারমুডা। পায়ে সাদা-কালো-রুপোলি স্পোর্টস শু। আর কালো মো নাহরের দুপাশে দুজন সিকিওরিটি গার্ড।

একটা ক্রেনের কেবিন ওদের কাছে এসে থামল। গার্ড দুজন ওকে ে লে দিল কেবিনে। তারপর নিজেরা উঠে পড়ল। ক্রেনের লম্বা হাত কেবিনট ন্য ভাসিয়ে নিয়ে গেল গর্তের ওপর। গর্তের ঠিক কেন্দ্রে মনোহরকে না য়ে ক্রেন আবার উঠে গেল শূন্যে।

মনোহর অসহায় চোখে কুকুরগুলোর দিকে একবার তাকাল। সঙ্গে াচটা কালো বিদ্যুৎঝলক চাপা গর্জন করে মনোহরের ওপরে ঝাঁপিয়ে প

মনোহর চিৎকার করতে লাগল।

শুরুর দিকে ও হাত-পা ছুড়ছিল, শ্রীধর পাট্টার নাম ধরে গালিগা রছিল। কিন্তু সেটা মাত্র কয়েকসেকেন্ডের জন্য।

কারণ, তারপরই ও হিংস্র কুকুরগুলোর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে প কুরগুলো এতই ক্ষিপ্র যে, পাঁচটা কুকুরকে দশটা বলে মনে হতে লাগ

মনোহরের চিৎকার জিশানের কানে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর-এব লিক অথবা শিবপদকে ও দেখতে লাগল। মনোহরের কথা জায়ান্ট টি লকারেও শোনা যাচ্ছিল। ও তখন জড়ানো গলায় কাটা-কাটাভাবে ব জশান! জিশানভাইয়া! ইন হারামি লোগোঁকো ছোড়না নহি। ইনকো সবক খানা। ছোড়না নহি সালোকো...।'

চিৎকার করতে-করতে মনোহর পড়ে গেল। ওর চিৎকার থেমে গে কুরগুলোর শরীরে ওর শরীর ঢাকা পড়ে গেল। জন্তুগুলো মনোহরের ে াস্ট আর জুতো-মোজা নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ির হরির লুঠের খেলা খেলতে লাগ ারপর শুরু হল ওর চামড়া আর মাংস নিয়ে খেলা।

জায়ান্ট স্ক্রিন মাঝে-মাঝেই জাম্প কাট করে শ্রীধর পাট্টার মুখ দেখাচ্ছি াবলেশহীন মুখ। চকচকে চোখ। সরু পাতলা লাল ঠোঁট। দেখে মো ন হয় না, তিনি কারও নৃশংস মৃত্যু দেখছেন।

উত্তেজিত জনতা প্রবল চিৎকার করছিল, নানান মন্তব্য করছিল। কে উ শূন্যে রঙিন বেলুন ওড়াচ্ছিল। আর কুকুরগুলোর আক্রমণের তালে-ত নতার চিৎকার সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ওঠা-নামা করছিল।

অসম লড়াইটা শেষ হতে কুড়ি সেকেন্ডের বেশি লাগল না।

কুকুরগুলো মনোহরকে ছেড়ে যখন সরে দাঁড়াল তখন মনোহরের শরী

সুর একটা অবশিষ্ট নেই।

জায়ান্ট স্ক্রিনে দেহাবশেষের ক্লোজ-আপ দেখা গেল। অতিথি নেমন্তন্ন খেয়ে চলে গেলে পরে এঁটোকাঁটা যেরকম পড়ে থাকে মনোহরের এঁটোকাঁটা ঠিক তেমনই গর্তের মাটির ওপরে পড়ে রয়েছে।

জিশানের চোখে জল এসে গেল আবার। গা গুলিয়ে উঠল। মনোহর আর নেই—এই সত্যিটা উপলব্ধি করার জন্য ও মাথার ওপরে কালো আকাশের দিকে তাকাল। ওপরওয়ালা এই মৃত্যুটা কি দেখতে পেয়েছেন? ওই অন্ধকার থেকে?

হা ঈশ্বর!

ওল্ড সিটিতে মালিক যখন ফাইটার কার্তিকের হাতে মারা যায় তখন ঘোলাটে চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে মালিক বিড়বিড় করে বলেছিল, '...তুই ওকে উড়িয়ে দে। ওই কার্তিক সালাকে না উড়িয়ে তুই জল খাবি না। গড প্রমিস।'

জিশান মনে-মনে শপথ নিয়েছিল। এবং কথা রেখেছিল।

এখনও তো এই একটু আগেই মনোহর বলল, '...জিশানভাইয়া। ইন হারামি লোগোঁকো ছোড়না নহি। ইনকো সবক জরুর সিখানা। ছোড়না নহি...।'

না, জিশান ছাড়বে না। এদের উচিত শিক্ষা অবশ্যই দেবে।

শরীরে যেন মন্ত্রশক্তি টের পেল ও। বিদ্যুতের হলকা ছুটে বেড়াতে লাগল ওর শরীরের শিরা উপশিরায়। ও বিড়বিড় করে বলল, 'মনোহর, সালোঁকো হম সবক জরুর সিখাউঙ্গা। তু আশমানসে দেখতে রহেনা।'

জিশান এবার উঠে দাঁড়াল। চোয়ালে চোয়াল চেপে নিজের মনেই বলল, 'যদি এই পিট ফাইটে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে লড়তেই হয় তা হলে আমি এই গেমটার নাম দিলাম "কিল গেম" খতমের খেলা।'

টিভির বিশাল পরদায় শ্রীধর পাট্টাকে দেখা যাচ্ছিল। তিনি তখন সুপারগেমস কর্পোরেশনের কঠোর নিয়মকানুনের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখছিলেন। ওঁর কথা বলা শেষ হতেই আবার শুরু হয়ে গেল জিশানের কীর্তির পাঁচালি। তার সঙ্গে চলতে লাগল নানান গেমের মানানসই চলমান ছবি। অর্থাৎ, ব্যাপারস্যাপার একটু আগে দেখানো পিট ফাইটের প্রোমোশনাল ট্রেলারের অ্যাকশনে রিপ্লে বলে মনে হতে লাগল। সবমিলিয়ে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যেন মনোহর সিং-এর ঘটনাটা কখনও ঘটেনি। গর্তের মধ্যে মনোহর সিং নামে কেউ কখনও নামেনি, পাঁচটা কালো হাউন্ডও কেউ কখনও দ্যাখেনি।

জিশানের মাথার ভেতরে গরম তেল টগবগ করে ফুটতে লাগল।

মাইকে মার্শালের কথা শোনা যাচ্ছিল। জিশানের ফাইটিং ক্যালিবার সবিস্তারে বুঝিয়ে বলার পর ও বলল, '...এখুনি আপনাদের সামনে আমরা নতুন একজন ফাইটারের নাম ঘোষণা করব। মাননীয় শ্রীধর পাট্টা নিজে সেই নাম

আপনাদের জানাবেন। আর-একটু ধৈর্য ধরুন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন..।'

গর্তের ভেতর থেকে পাঁচটা কুকুরকেই ক্রেন-কেবিনে তুলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গর্তের মাটি সাফ করে আবার ঠিকঠাকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন দাঁত-নখ লড়াইয়ের জন্য গর্ত আবার তৈরি।

জায়ান্ট স্ক্রিনে শ্রীধর পাট্টার মুখ ভেসে উঠল। ওঁর চোয়াল নড়ছে। কিছু একটা চিবোচ্ছেন যেন। চোখজোড়া তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল। মনে হয়, কোনও কিছুর প্রত্যাশায় একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে।

শ্রীধর হঠাৎই চিৎকার করে বললেন, 'জিশান! বাবু জিশান! কোথায় তুমি? আর য়ু রেডি?'

অন্য আর-একটা ক্যামেরা তাক করল জিশানের দিকে। জায়ান্ট স্ক্রিনে ইনসেটে দেখা গেল জিশানের মুখ।

ওর ঠোঁট কাঁপছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। চোয়ালের হাড় শক্ত।

জিশানকে দেখানোমাত্রই জনতা তীব্র গর্জন করে উঠল।

শ্রীধর পাট্টা ঠোঁটে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে তুললেন। তারপর চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, 'তোমার জন্যে আমাদের প্রীতি উপহার/জাব্বার সঙ্গে তোমাকে মানাবে চমৎকার। হ্যাঁ, জিশান—এইবার দেখি কেমন করে ওড়াও তোমার নিশান। তোমার সঙ্গে পিট ফাইটে লড়বে জাব্বা, জাব্বা, জাব্বা। ওরে বাব্বা, বাব্বা, বাব্বা।'

শ্রীধরের ছড়া-কাটা বাণের খোঁচা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই জায়ান্ট স্ক্রিনে জাব্বার ক্লোজ-আপ ভেসে উঠল। জিশান তাকাল সেই ভয়ংকর মুখের দিকে। শতকরা দুশো ভাগ একটা পোড়খাওয়া খুনির মুখ।

জিশানের মনে পড়ল, পিট ফাইটে জাব্বার হাতে পুনিয়া মারা গেছে—খিদিরপুরের পুনিয়া সরকার। এ ছাড়াও আর-একজন ফাইটারকে জাব্বা খতম করেছে। তার নাম জিশান জানে না।

মোট দুজন জান দিয়েছে। আজ কি সংখ্যাটা দুই থেকে তিনে যাওয়ার পালা?

টিভির পরদায় জাব্বার গুণকীর্তন চলছিল। ওর ওজন, উচ্চতা, হাতের দৈর্ঘ্য, পায়ের দৈর্ঘ্য, বুকের মাপ ইত্যাদি জানানো হচ্ছিল আর মাঝে-মাঝেই দেখানো হচ্ছিল ওর ক্লোজ-আপ।

জিশান লোকটাকে দেখছিল। এখনই জাব্বাকে পিট ফাইট চ্যাম্পিয়ন বলা যেতে পারে। দুজন ফাইটার ওর হাতে মারা গেছে। এ ছাড়া আর ক'জন হেরেছে জিশান জানে না। পিট ফাইটের এতগুলো রাউন্ড জাব্বাকে দিয়ে কেন লড়ানো হচ্ছে তাও জিশানের জানা নেই। হয়তো বাড়তি রাউন্ডগুলো সারপ্রাইজ রাউন্ড—কিংবা নিউ সিটির বাসিন্দাদের বাড়তি আনন্দ আর উত্তেজনা জোগান দেওয়ার

জন্য।

জাব্বার গায়ের রং বেশ কালো। তবে তা থেকে একটা চকচকে আভা বেরোচ্ছে। মাথাটা বড়—প্রায় ফুটবলের মতো। মাথায় মিলিটারিদের মতো কদমছাঁট চুল। মুখে এত ব্রণ যে, মনে হচ্ছে ব্যাঙের চামড়া গ্রাফটিং করে লাগানো হয়েছে। চোখ গর্তে ঢোকানো কিন্তু জ্বলজ্বল করছে। ভুরু চওড়ায় ছোট, লোমশ। দাড়ি-গোঁফ চেঁছেপুঁছে কামানো। ডানকানের ঠিক পাশ ঘেঁষে একটা বড় আঁচিল। আর বাঁ-চোয়ালের ওপরে ইঞ্চিতিনেক লম্বা একটা কাটা দাগ।

সবমিলিয়ে কাউকে খুন করার ব্যাপারে বেশ সম্ভাবনাময় মুখ।

নীল ইউনিফর্ম পরা ভারী চেহারার মেয়েটি বোধহয় কাছাকাছিই ছিল—হঠাৎ চলে এল জিশানের কাছে।

'জিশান, এবার প্যাভিলিয়ানে চলুন। আপনাকে পিট ফাইট গেমটার জন্যে খুব কুইকলি রেডি হয়ে নিতে হবে। প্লিজ।'

জিশান মেয়েটার সঙ্গে হাঁটা দিল। আর মনে-মনে ভাবল, কী চমৎকার। পিট ফাইট গেম। হাউন্ড গেম। কিল গেম। এই নিউ সিটিতে মৃত্যুও একটা খেলা।

কোনও নিয়মকানুনের বালাই না মেনেই ঘেন্নায় পায়ের কাছে একদলা থুতু ফেলল জিশান। মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে ভুরু কুঁচকে তাকাল জিশানের দিকে। বিরক্ত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিশান বলে উঠল, 'এটা থুতু ফেলার গেম, ম্যাডাম—।'

লাউডস্পিকারে তখন মিউজিক বাজানো শুরু হয়েছে। তার ঢং অনেকটা যুদ্ধের বাজনার মতো।

প্যাভিলিয়নে যাওয়ার টানেলে ঢোকার সময় স্টেডিয়ামের গ্যালারির দিকে তাকাল জিশান—রিমিয়ার লাল ড্রেসটা যদি ওর চোখে পড়ে। পড়ল না।

●

গর্তের ভেতরে মুখোমুখি দুজন।

একজন পুরুষ মাইকে নির্দেশ দিচ্ছিল। তার নির্দেশমতো জিশান আর জাব্বা গর্তের দুটো বিপরীত কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল।

জিশানের গায়ে কালো রঙের জিম ভেস্ট আর লাল বারমুডা। পায়ে স্পোর্টস শু আর কালো মোজা।

জাব্বার পোশাক ঠিক উলটো : লাল জিম ভেস্ট আর কালো বারমুডা—মনোহরের মতো।

জিশান বুঝল, লড়াইয়ের সময় প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠিকমতো চেনার সুবিধের জন্যই দুজনের পোশাক দুরকম।

চ্ছ, আমরাই সেরা, আমরাই পিট ফাইটের চ্যাম্পিয়ন।

জাব্বাকে দেখে মনে হচ্ছিল ও মানুষ নয়—কালো পাথরে খোদাই ক
ই। কয়েকমাস আগে ও রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল। কিন্তু একটানা ভয়ং
নিং করার পর ও পাথর হয়ে গেছে।

নিজের শরীরেও পাথর টের পেল জিশান। পাথর, নাকি স্টেইনে
ল? মাসের-পর-মাস অ্যানালগ জিমের ব্যায়াম, বালির ওপরে দৌড় প্র্যাকটি
লের তলায় কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকা যায় তার অভ্যাস, তিরিশ কেজি বা
া কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দৌড়নো, দড়ি বেয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ও
া করা, পায়ে ওজন বেঁধে দৌড়নো, লেকে ফ্রি স্টাইল সাঁতারে এককিলোমি
রোনো—সেসব যাবে কোথায়?

তা হলে জিশান কি পারবে না তিরিশ ফুট দূরে দাঁড়ানো ওই লোক
লো ঘাড়টা মটকে দিতে? শানু, মিনি—ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য জিশান
বেঁচে থাকতেই হবে!

ভগবান। ভগবান। তুমি মাথার ওপরে আছ তো?

মুখ তুলে ওপরদিকে তাকাল জিশান। চারপাশের উজ্জ্বল আলো ওর চ
ধিয়ে দিল। তবু চোখে পড়ল উজ্জ্বল আলো দিয়ে ঘেরা একটা কালো গ
টই আকাশ।

লাউডস্পিকারে হঠাৎই নতুন একটা গলা শোনা গেল। কোনও মে
ষ্ট গলা।

'জিশান—জাব্বা—আমি এই গেমের রেফারি। নিয়মের কোনও ভুল
ন আমি তোমাদের ইনস্ট্রাকশন দেব। তোমরা সেটা খেয়াল রাখবে...।'

জিশান জায়ান্ট স্ক্রিনের দিকে তাকাল। অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে
খানে দেখা যাচ্ছে। মিষ্টি গলায় সে-ই কথা বলছে।

'জিশান—জাব্বা—তোমরা দুজনে ওপরদিকে হাত তুলে দেখাও
মাদের সঙ্গে কোনও লুকোনো অস্ত্র নেই...।'

জিশান আর জাব্বা রেফারির কথা শুনল। দুহাত ওপরে তুল
ঙুলগুলো তালপাতার শিবের মতো ছড়িয়ে দিল।

না, ওদের হাতে কোনও লুকোনো অস্ত্র নেই। তবে যে-অস্ত্র রয়েছে ে
াসরি দেখা যাচ্ছে : ওদের শক্ত শক্তিশালী আঙুল—চামড়া আর মাংস দি
ড়াল করা আঙুলের হাড়—লোহা দিয়ে তৈরি হাড়।

জাব্বা ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফাতে লাগল, হাত-পা ঝাঁকাতে লাগ
র মরা মানুষের চোখে জিশানকে দেখতে লাগল। হয়তো ভাবছিল,

ছোকরাটাকে মটাস করে ঘাড় ভেঙে মারতে ও ঠিক কতটা সময় নেবে।

লাউডস্পিকারে রেফারির গলা শোনা গেল : 'আর য়ু রেডি, জাব্বা?'

জাব্বা একটা হাত ওপরে তুলল। ওপর-নীচে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল যে, ও রেডি।

সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকের দল পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল।

রেফারি এবার চেঁচিয়ে জিশানকে জিগ্যেস করল, 'আর য়ু রেডি, জিশান?'

জিশান ডানহাতটা তুলে ধরল শূন্যে। মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ, রেডি—।'

সঙ্গে-সঙ্গে স্টেডিয়ামে আবার তুমুল চিৎকার।

রেফারি বলল, 'ওয়ান...টু...থ্রি...স্টার্ট।'

লাউডস্পিকারে শোনা গেল কানফাটানো রক মিউজিকের ঝলক।

জিশান আর জাব্বার পিট ফাইট শুরু হল।

ওরা দুজন কিছুক্ষণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দুটো হাত সামনের দিকে খানিকটা বাড়িয়ে গোল হয়ে পাক খেতে লাগল।

জাব্বা অদ্ভুত এক প্রশান্ত চোখে জিশানকে দেখছিল, আর মাঝে-মাঝেই দু-হাতের তালু ঘষছিল। কী এক কৌশলে ও যেন ওর জ্বলজ্বলে চোখের বাতি নিভিয়ে দিয়েছে।

বৃত্তাকার পথে ওরা দুজন পাক খাচ্ছিল আর অদৃশ্য এক টানে ওদের দুজনের মধ্যে দূরত্ব কমছিল।

পনেরোসেকেন্ডের মধ্যেই দূরত্বটা ছ'ফুটে এসে দাঁড়াল। তখনই জাব্বা হিংস্রভাবে চাপা গর্জন করে বলে উঠল, 'খতম।' এবং জিশানের দিকে থুতু ছেটাল।

জিশান কোনও পালটা জবাব দিল না। শরীরের প্রতিটি শক্তিকণা ও সঞ্চয় করে রাখতে চায় লড়াইয়ের জন্য। ও মনে-মনে মিনির কথা ভাবল। ভাবল শানুর কথা। যদি এই পিট ফাইটে জাব্বার হাতে ও শেষ হয়ে যায় তা হলে আর কোনওদিনও মিনি আর শানুর সঙ্গে ওর দেখা হবে না।

জিশানের হঠাৎ মনে হল, জাব্বার সঙ্গে ও নয়—মিনি আর শানু লড়ছে। আর ও বাইরে থেকে দেখছে। যদি ওরা জাব্বার হাতে খতম হয়ে যায় তা হলে জিশানের সঙ্গে ওদের আর কখনও দেখা হবে না।

দুটো ব্যাপার জিশানের কাছে একই বলে মনে হল। ওর মনে হল, মিনি আর শানুকে জাব্বার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই ওকে লড়তে হবে। প্রাণপণ লড়তে হবে।

জিশানের নাকে গন্ধ আসছিল। মাটির গন্ধ, কুকুরের গন্ধ, রক্তের আঁশটে গন্ধ। হয়তো ওর আর জাব্বার লড়াই শেষ হওয়ার পর এই গর্তে মানুষের গন্ধও পাওয়া যাবে।

দর্শকের দল খ্যাপা নেকড়ের মতো চিৎকার করছিল। শূন্যে হাত-পা ছুড়ছিল। ওরা রক্ত দেখতে চাইছিল। হাতাহাতি শুরু হওয়ার এক-একসেকেন্ড দেরি ওদের কাছে এক-একঘণ্টা বলে মনে হচ্ছিল। ওদের ধৈর্যের সুতো ছিঁড়ে গেছে অনেকক্ষণ।

নানান সুরে গালাগালের টুকরো ছিটকে আসছিল জিশানদের দিকে। সেইসঙ্গে মাইকের ধারাবিবরণী। হিংসার চাহিদা যে এত তীব্র হতে পারে সেটা জিশান আগে কখনও ভাবেনি। ওর কান ভোঁ-ভোঁ করছিল। মনে হচ্ছিল, শরীরের কাঠামোয় বসানো কতকগুলো জ্যান্ত খুলি রক্তের পিপাসায় পরিত্রাহি চিৎকার করছে।

জিশান আর জাব্বার বৃত্ত এখন অনেক ছোট হয়ে এসেছে। এত ছোট যে, ওরা হাত বাড়ালেই একে অপরকে ছুঁয়ে ফেলতে পারবে।

জাব্বা কথা বলছিল। প্রায় ফিসফিস করে বিড়বিড় করছিল। কথাগুলো শুনতে না পেলেও জিশান অনুমান করতে পারছিল। জাব্বা খিস্তির ফোয়ারা ছোটাচ্ছে।

হঠাৎই জাব্বা চোখের ইশারা করল। জিশানের বাঁ-পাশ দিয়ে যেন জিশানের পিছনে কারও দিকে তাকাল। বলল, 'দ্যাখ, কে এসেছে—।'

জিশান বুঝতে পারছিল এটা বহু পুরোনো লোকঠকানো প্যাঁচ। কিন্তু সেই মুহূর্তে কী যে হল! ও মাত্র পাঁচ কি দশ ডিগ্রি মাথাটা ঘুরিয়ে ছিল। তাও এক লহমার জন্য। তাতেই গণ্ডগোল হয়ে গেল। জাব্বা ওর নেমন্তন্নের চিঠি পেয়ে গেল।

জাব্বার লাথিটা সপাটে এসে পড়ল জিশানের বুকে—ডানদিকে। জিশান ছিটকে পড়ল মাটিতে। একটা পাক খেয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে শরীরটাকে তুলে ধরল। ততক্ষণে জাব্বা ওর আরও কাছে চলে এসেছে। ফুটবল খেলায় ফ্রি কিক শট নেওয়ার মতো পরপর তিনটে লাথি কষাল জিশানের মাথায় আর পাঁজরে।

জিশানের মনে হল বুকের ভেতরে পাঁজরের হাড়-টাড় বা কিছু একটা বোধহয় ভেঙে গেল। ছুঁচ ফোটানো ব্যথা টের পেল ও। তবু কোনওরকমে মাটিতে ভর দিয়ে মাতালের মতো হাঁচরপাঁচর করে টলতে-টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এই ওর লড়াইয়ের নমুনা। বাঁচা-মরার লড়াই লড়তে গিয়ে বস্তাপচা প্যাঁচে মাত হয়ে যাচ্ছে!

'শাবাশ, জাব্বা! শাবাশ!' একজন ক্ষিপ্ত দর্শকের উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল।

'অ্যাই, জিশান। তোর জুতোর ফিতে খুলে গেছে. তাকা—পায়ের দিকে তাকা, সালা! মাথামোটা খালুরদম কোথাকার।' আর-একজন দর্শক। বোকা বোকা

লড়াই লড়ার জন্য জিশানকে [illegible] করছে।

জিশান আন্দাজ করল, ওর আর জাব্বার লড়াই নিয়ে দর্শকদের মধ্যে নিশ্চয়ই বাজি ধরা[illegible] চলছে। আর সুপারগেমস কর্পোরেশন নিশ্চয়ই এ থেকে ভালো পয়সা লুটছে। এক ঢিলে দু-পাখি—বিনোদন আর ফায়দা।

জাব্বা কুঁজো হয়ে দু-হাত দুপাশে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মরা মাছের চোখ জিশানের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে-চিবিয়ে ও বলল, 'বাঁচতে চাস তো এই গাড্ডা থেকে ফুটে যা। নইলে পাঁচমিনিটে তোকে টুটা-ফুটা সও টুকরা করে নেব। দাঁতগুলো গোটা-গোটা হাতে দিয়ে দেব। সালা...সুয়ার কা বাচ্চা!'

জিশানের মাথা ঘুরছিল। ও যেন জায়ান্ট্স হুইলে পাক খাচ্ছিল। কপালের পাশ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। নাক বেয়ে নেমে এসে ফোঁটা-ফোঁটা করে ঝরে পড়ছিল ঠোঁটের ওপর। ঝাপসা চোখে দেখছিল জাব্বা ওর কাছে এগিয়ে আসছে।

হাতের পিঠ দিয়ে রক্ত মুছে নিল। মনে-মনে ভাবল, এই গর্ত থেকে ওর বোধহয় আর বেরোনো হবে না। গর্ত নয়, আসলে একটা কবরের মধ্যে ও লড়াই করছে—জিশান পালচৌধুরীর কবর।

দলাপাকানো কাগজের বল ছিটকে আসছিল গর্তের ভেতরে। সেইসঙ্গে কিছু পেপার কাপ আর প্লাস্টিকের হালকা কৌটো। না, নিউ সিটির খেলায় এ ধরনের 'মিসাইল' ছোড়া বারণ নয়। কারণ, সুপারগেমস কর্পোরেশনের কর্তাদের মতে এগুলো উত্তেজনাময় খেলার একটা অঙ্গ। তাই অঙ্গহানি যাতে না হয় তার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে দর্শকরা।

হঠাৎই লম্বা মোটা দড়ির মতো কী যেন একটা উড়ে এসে পড়ল গর্তের ভেতরে। জিনিসটা এসে পড়েছে জিশান আর জাব্বার কাছ থেকে প্রায় দশ-বারো ফুট দূরে। কিন্তু মেটাল ল্যাম্পের চোখধাঁধানো সাদা ঝকঝকে আলোর কৃপায় বস্তুটাকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হল না।

প্রায় সাতফুট লম্বা একটা কালচে রঙের সাপ। নরম মাটিতে ছিটকে এসে পড়ার পর স্থির হয়ে রয়েছে।

সাপটা বোধহয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নড়াচড়া বন্ধ রেখেছিল। জিশান আর জাব্বারও তখন একই অবস্থা। কিন্তু চার-পাঁচসেকেন্ড পরেই সাপটা নড়ে উঠল। কিলবিল করে চলতে শুরু করল। তখন জিশান দুরকম শত্রুর ওপরে সতর্ক চোখ রেখে পায়ে-পায়ে সরতে লাগল। লক্ষ করল, জাব্বার নজরও দুই শত্রুর দিকে।

সাপটা হঠাৎ কোথা থেকে এল? কেন এল? সাপটা কি বিষধর?

জিশানের এইসব প্রশ্নের উত্তর দিল মণীশের ধারাবিবরণী।

'সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ! এক্সাইটিং! এক্সাইটিং! এক্সাইটিং! পিটের মধ্যে উড়ে গিয়ে পড়েছে জাম্বো আফ্রিকান ব্ল্যাক মাম্বা। এবার দুই

ফাইটারের সঙ্গে চলবে জ্যান্ত সাপের কিলবিল। তবে ভয়ের কিছু নেই। ব্ল্যাক মাম্বা সাংঘাতিক বিষধর সাপ হলেও এই সাপটার বিষ দুয়ে নেওয়া হয়েছে—কিন্তু ওর ধারালো বিষদাঁত জোড়া ইনট্যাক্ট রয়েছে। অ্যাজ আ রেজাল্ট, এই সাপটা যদি জিশান কিংবা জাব্বাকে কামড় বসায় তা হলে সেই বাইটটা পেইনফুল হবে, কিন্তু ডেডলি হবে না। জিশান আর জাব্বা—তোমাদের বলছি—এই সাপটার বিষ নেই বটে, কিন্তু তবু ওটা সাপ। সাপটা এখন তোমাদের লড়াইয়ের প্যাকেজে ঢুকে পড়েছে। সো, কাম অন ফোকস, লেট্‌স নাউ ওয়াচ দিস সুপার এক্সাইটিং ভেনোমাস গেম। হো—য়া—।'

মণীশের উল্লাসের চিৎকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খ্যাপা দর্শকের দল ক্ষিপ্ত গর্জন করে উঠল।

কোনও গেমকেই সুপারগেম্‌স কর্পোরেশন কখনও একঘেয়ে হতে দেয় না। তাই এইসব সারপ্রাইজ হচ্ছে ওদের আস্তিনের তাস। নতুন-নতুন ধরনের গেম আর নতুন-নতুন ধরনের সারপ্রাইজ ডিজাইন করার জন্য সুপারগেম্‌স কর্পোরেশনের কোর ডিজাইনার গ্রুপ রয়েছে। সেই গ্রুপের হাই আই-কিউ এক্সিকিউটিভরাই হচ্ছে গেম ডিজাইনের থিংক ট্যাংক। এই খেলায় সারপ্রাইজ ফ্যাক্টর হিসেবে ওরা একটা নন ভেনোমাস ব্ল্যাক মাম্বা অ্যাড করার কথা ভেবেছে।

ব্ল্যাক মাম্বাটা গর্তের কোণ ঘেঁষে সড়সড় করে চলে বেড়াচ্ছে। হয়তো জোরালো আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে বলে

সরীসৃপটা অন্ধকার কোণ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লাউডস্পিকারের এবার শোনা গেল রেফারির গলা : 'জিশান! জাব্বা! ওই সাপটা তোমাদের। তোমরা ওটা নিয়ে যা খুশি করতে পারো। যেমন তোমরা তোমাদের রাইভালকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো। পিট ফাইটে কোনও রুল নেই। ফ্রি ফর অল। স্কাই ইজ দ্য লিমিট। সো ক্যারি অন। আর তোমাদের তো আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পিট ফাইটের রাউন্ড একটাই—এবং তার কোনও টাইম লিমিট নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যাট আ স্ট্রেচ লড়াই—একটাই রাউন্ড...।'

গর্তের ঠিক মাঝখানে জিশান আর জাব্বার আবার সংঘর্ষ হল।

জাব্বার ঘুসি তো নয়, যেন দু-দুটো কালো হাতুড়ি বারবার আছড়ে পড়ল জিশানের মাথার দুপাশে। গর্তটা ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে লাগল। গর্তের দেওয়াল যেন এখুনি ধসে পড়বে, জিশানকে কবর দিয়ে দেবে মাটির তলায়। ওকে একটানে শুষে নেবে অন্ধকার পাতালে।

জিশান হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছিল। সেই অবস্থাতেই মাথা ঝাঁকাল এপাশ-ওপাশ।

সাপটা কোথায়? কোথায় গেল ব্ল্যাক মাম্বাটা? ওটা শানুকে ছোবল মারবে

না তো? শানু কোথায়? ওকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কোথায় আমার ছোট্ট শানু? ওকে দেখার জন্যে আমাকে বাঁচতে হবে...।

সেই তীব্র ইচ্ছেটাই জিশানের ডানহাত মুঠো করে একটা লোহার ঘুসি তৈরি করে দিল। সেটা ও সজোরে চালাল ওপরদিকে। অনেকটা আন্দাজে ও ঘুসিটা চালালেও সেটা লাগল গিয়ে জাব্বার তলপেটে।

জাব্বার মুখ দিয়ে 'ওঁক' শব্দ বেরিয়ে এল। ও কুঁজো হয়ে গেল। এলোমেলো পা ফেলে খানিকটা পিছিয়ে গেল।

পাবলিক কানফাটানো গর্জন করে উঠল।

হঠাৎই জিশান দেখল, কালো সাপটা ওর কাছে এসে গেছে। ওটার গা চকচক করছে। যেন সারা গায়ে ভেসলিন মেখে এসেছে।

সাপটা ছোবল মারার আগেই জিশান ছোবল মারল। সাপটাকে এক ছোবলে মাটি থেকে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিল জাব্বার দিকে। সাপটা ওর বুকের ওপর গিয়ে পড়ল। চাবুক মারার মতো শব্দ হল। জাব্বা খপ করে সাপটার হিলহিলে শরীর চেপে ধরল। সাপটা চকিতে ছোবল মারল জাব্বার কাঁধে।

পলকের জন্য চোখ কুঁচকে গেলেও জাব্বা সাপটার দিকে ফিরেও তাকাল না। রোবটের মতো যান্ত্রিকভাবে ওটাকে সজোরে ছুড়ে দিল গর্তের এবড়োখেবড়ো দেওয়ালে।

সাপটা জাব্বার কালো চামড়া ফুটো করে দিয়েছিল। ওর কাঁধ থেকে সরু রক্তের রেখা গড়িয়ে পড়ছিল।

জিশান বিদ্যুৎঝলকের মতো লাথি চালাল।

লাথিটা ও চালিয়েছিল জাব্বার দু-পায়ের জোড় লক্ষ্য করে। আঘাতটা এড়ানোর জন্য জাব্বা ওর কোমরটাকে একঝটকায় পিছিয়ে নিল। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে ওর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনে। ফলে লাথিটা যে-বৃত্তচাপ তৈরি করছিল সেটা থামল গিয়ে জাব্বার চোয়ালে।

জাব্বার শরীর হয়তো ইস্পাত দিয়ে তৈরি, কিন্তু জিশানের ইস্পাতও তো ফেলনা নয়! সুতরাং সংঘর্ষটা মেগাটন লেভেলের শোনাল। জাব্বার একটা দাঁত ছিটকে পড়ল মাটিতে। জাব্বা পিছনদিকে একটা ঝটকা খেয়েই সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

জিশান ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর ওপরে। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে দু-হাত মুঠো করে পাগলের মতো রদ্দা মেরে চলল জাব্বার কালো মোটা ঘাড়ে। যেভাবেই হোক, শত্রুকে ও মাটিতে পেড়ে ফেলতে চায়।

হয়তো সেই উদ্দেশ্যেই জিশান হঠাৎ একটু পিছিয়ে এল। একটা জোরালো লাথি কষানোর জন্য ডান পা-কে তৈরি করল। কিন্তু লাথিটা শুরু করার আগেই হাঁটুগেড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকা জাব্বা ডানহাতে ছোবল মারল জিশানের দু-পায়ের

ফাঁকে। ওর সবচেয়ে দুর্বল প্রত্যঙ্গ আঁকড়ে ধরল। তারপর ইস্পাতের আঙুল দিয়ে পাথর গুঁড়ো করার শক্তিতে চাপ বাড়িয়ে চলল।

জাব্বার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল জয়ের গর্জন। আর জিশান যন্ত্রণায় এমন এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল যে, সে-চিৎকার শুনে ও নিজেও ভয় পেয়ে গেল।

গ্যালারির দর্শক একসঙ্গে গর্জে উঠল। গ্যালারি থেকে পঞ্চাশ-ষাটটা রঙিন বেলুন উড়ে গেল আকাশে।

জিশান প্রাণ বাঁচাতে জাব্বার মাথায় প্রাণপণে ঘুসি-বৃষ্টি করতে লাগল। তারপর দু-হাতে ওর গলা টিপতে চাইল। কিন্তু ঘাড়ের দিক থেকে গলা টেপার চেষ্টা করায় ও তেমন জুতসই বাঁধন পাচ্ছিল না। এদিকে যন্ত্রণার তীব্র স্রোত দু-পায়ের ফাঁক থেকে শুরু হয়ে কোমর-বুক বেয়ে জিশানের মাথায় পৌঁছে যাচ্ছিল। সেখান থেকে ফেটে পড়ছিল যন্ত্রণার তীব্র চিৎকারে। সেই চিৎকার অ্যানটেনা থেকে বেরিয়ে আসা অদৃশ্য তরঙ্গের মতো আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। জিশানের মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।

সেই অবস্থাতেই জিশান টের পেল জাব্বা ওর শর্টস খামচে ধরা মুঠোটাকে ধীরে-ধীরে কাছে টানছে—ওর মুখের কাছে। ও কি মুঠোর বদলে এবার ওখানে কামড় বসাবে নাকি? একটা ভয়ের স্রোত মিশে গেল যন্ত্রণার স্রোতের সঙ্গে। বাঁচার ইচ্ছেটা জিশানের ভেতরে প্রবল হয়ে উঠল। ওর মনে পড়ল মাণিকের কথা, মনোহর সিং-এর কথা। তারপরে মনে হল, জাব্বা ওর দুর্বল প্রত্যঙ্গ নয়, শানুর কচি গলাটা বজ্রমুঠিতে আঁকড়ে ধরেছে। এখন সেই নরম গলায় হিংস্র কামড় বসাতে চাইছে।

শানু আর মিনির ছবি পালা করে ঝলকে যেতে লাগল ওর চোখের সামনে।

●

সেই রাতটার কথা জিশান কোনওদিনও ভুলবে না।

যেমন ঝড়, তেমন বৃষ্টি। ঘরের ভেতর থেকে ঝড়-বৃষ্টির দাপট শুনলে মনে হয় প্রকৃতির দাঙ্গা চলছে। ঝোড়ো বাতাস পাগলের মতো ছুটে চলেছে। এ-রাস্তা সে-রাস্তায়, এ-বাড়ি ও-বাড়ি, কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর মাঝে-মাঝেই বাজ পড়ছে।

সকাল থেকে শানুর জ্বর ছিল। তখন কতই-বা বয়েস বাচ্চাটার? বড়জোর মাস দেড়েক হবে। কিছুতেই খেতে চাইছে না। চোখ মুখ লালচে। গাল দুটো ফোলা-ফোলা লাগছে। মিনি অস্থির হয়ে উঠেছে। কান্নাকাটি করছে।

ডাক্তারের বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করে হোমিওপ্যাথি ওষুধ এনে দিয়েছিল

জিশান। সেটা খেয়ে জ্বরটা একটু কমেছিল। কিন্তু বিকেলের পর আবার বাড়তে শুরু করল।

যখন পরিস্থিতি আরও খারাপ হল তখন মিনি জিশানকে বারবার বলতে লাগল, 'চলো, ওকে হসপিটালে নিয়ে চলো। এরপর আরও দেরি করলে আমার শানু আর বাঁচবে না...আর বাঁচবে না...।' কথা বলতে-বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে মিনি।

জিশান যে একটু কিন্তু-কিন্তু করছিল তার কারণ তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তা ছাড়া সন্ধের পর মিনিকে নিয়ে রাস্তায় বেরোনোটা এ-শহরে মোটেই নিরাপদ নয়। তাই ও ভাবছিল যদি আজকের রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায় তা হলে কাল সকালে...।

কিন্তু শানুর জ্বর ক্রমশ বাড়তেই লাগল। বাইরের পাগল করা ঝড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিনিও পাগল হয়ে উঠল। আর জিশান দোটানায় পড়ে অস্থিরভাবে ছটফট করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত ওরা যখন রাস্তায় বেরোল তখন প্রায় সাতটা। দুটো ছাতা নিয়ে ঘুমন্ত শানুকে পলিথিনে জড়িয়ে মাথা হেঁট করে ওরা সামনে এগোচ্ছিল। আর ট্যাক্সির খোঁজে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অনেকটা পথ পেরিয়ে ওরা বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ভাঙাচোরা খানাখন্দে ভরা রাস্তার বেশিরভাগটাই পুকুরের চেহারা নিয়েছে। তারই মধ্যে দিয়ে কয়েকটা গাড়ি লাফাতে-লাফাতে ছুটে চলেছে। ওদের হেডলাইটের আলো সেই তালে-তালে ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

না, একটাও খালি ট্যাক্সি চোখে পড়ল না।

তিনটে ছেলে কাকভেজা হয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ওদের একজনের হাতে টর্চলাইট। জিশানদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা থমকে দাঁড়াল। টর্চের আলো ছুড়ে দিল মিনির মুখে। একজন বলে উঠল, 'চলে এসো, মা-মণি। দুজনে মিলে একটু ঝড় তুলি—তারপর বৃষ্টি।' বলেই খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল।

আর-একজন জড়ানো গলায় গান গেয়ে উঠল, 'এই রাত তোমার আমার...।'

তৃতীয়জন চাপা গলায় দুই সঙ্গীকে ধমক দিল, 'কী করছিস কী! দেখছিস না, কোলে একটা ছোট বাচ্চা রয়েছে! চল, চল—।'

সে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বাকি দুজনকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

যেতে-যেতে একজন একটা হাত ওপরে তুলে মাতালের গলায় বলল, 'সরি, হাজব্যান্ড। সরি...সরি...গুড বাই...।'

জিশান মিনিকে জড়িয়ে ধরে ছিল। সেইজন্যই টের পেল মিনি থরথর করে কাঁপছে। একইসঙ্গে ডুকরে কাঁদছে। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে ওর চাপা কান্না

ভালো করে শোনা যাচ্ছে না।

'মিনি, মিনি—' ওকে আশ্বাস দিতে গাঢ় গলায় ডাকল জিশান, 'ভয় পেয়ো না। এখুনি একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাব। জানোই তো, এ-শহরটা কেমন বাজে হয়ে গেছে। এটার দিকে আর কেউ তাকায় না। এটার কথা কেউ আর ভাবে না। সবাই বলে 'শহরটা' একেবারে গোল্লায় গেছে।'

জিশান অস্থির হয়ে পড়ছিল। ছাতা মাথায় দিয়েও বৃষ্টির দাপট আটকানো যাচ্ছে না। শানুর হয়তো আরও ঠান্ডা লাগবে, জ্বর বাড়বে, এখুনি ও হয়তো জেগে উঠবে।

ওদের পাশ দিয়ে দুটো গাড়ি পরপর চলে গেল। জিশান রাইড পাওয়ার আশায় প্রবলভাবে হাত নেড়েছিল কিন্তু একটা গাড়িও দাঁড়াল না।

জিশান রাস্তা বরাবর নজর চালিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিল আর কোনও গাড়ি আসছে কি না। কিন্তু বৃষ্টির চিক ভেদ করে বেশিদূর নজর গেল না। তবে হেডলাইট জ্বেলে কোনও গাড়ি যদি এগিয়ে আসত তা হলে তার হলদে আভা আর বৃষ্টির ফোঁটার ঝিকমিক নিশ্চয়ই জিশানের চোখে পড়ত।

ঝোড়ো হাওয়ার বেগ হঠাৎ বেড়ে গেল। কড়কড় করে দূরে কোথাও বাজ পড়ল। নীল আলোর ঝলকানি দেখা গেল। তার পরেই কানফাটানো শব্দ। জিশান উদ্‌ভ্রান্তের মতো এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। একটা ট্যাক্সি...ইস, একটা খালি ট্যাক্সি।

রাস্তার দুপাশের ফুটপাথ ঘেঁষে বেশ কয়েকটা ঝুপড়ি। ঝুপড়িগুলোর মাথায় পলিথিনের চাল—তার ওপরে ইটের টুকরো, কাঠের তক্তা আর বাঁশ চাপা দেওয়া। কয়েকটার পলিথিনের চালের কোনা হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে, অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে : ফটফট, ফটফট। রাস্তার ওপারে দাঁড়ানো দুটো বিশাল গাছ। গাছদুটো ঝোড়ো বাতাসে একটুও নড়ছে না। কারণ, গাছদুটোয় একটাও পাতা নেই। ধুলো-ময়লায় নোংরা এই শহরের বাতাস এতটাই নষ্ট প্রকৃতির যে, গাছের পাতা ক'দিন বাদেই ডাল থেকে খসে পড়ে।

আরও মিনিট-পনেরো-কুড়ি কেটে যাওয়ার পর মিনি কান্না-কান্না গলায় জিশানকে বলল, 'চলো, বাড়ি ফিরে যাই। রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে দিই। তারপর কাল সকালে...।'

মিনির কথা শেষ হওয়ার আগেই হেডলাইট জ্বেলে ছুটে আসা একটা গাড়ি জিশানের নজরে পড়ল। গাড়িটা ট্যাক্সি কি না কে জানে। উত্তাল সাগরে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টার মতো জিশান একছুটে রাস্তার ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। পাগলের মতো ওর ছাতা আর হাত নাড়তে লাগল। ওর মনে হচ্ছিল, এ-গাড়িটা যদি না দাঁড়ায়, ওদের না সাহায্য করে, তা হলে শানুকে আর বাঁচানো যাবে না।

গাড়িটা জিশানের কাছে এসে দাঁড়াল। জলে ভেজা জিশান হেডলাইটের আলোয় মাখামাখি। ঠিকরে পড়া আলোয় ও বুঝতে পারল গাড়িটা ট্যাক্সি নয়—করসিকা-এইট—প্রাইভেট কার আর জিপের মাঝামাঝি একটা মডেল।

গাড়ির বনেট রং চটা, তোবড়ানো। বাকি চেহারাটাও তার সঙ্গে মানানসই। গাড়ির ভেতরে কতকগুলো ছায়া-ছায়া মানুষ। তাদেরই একজন নেমে পড়ল জল-কাদায় মাখামাখি রাস্তায়। হেডলাইটের আলোর পিছনে লোকটার অন্ধকার বিশাল চেহারা জিশানের চোখে পড়ল।

'কী ব্যাপার? গাড়ি আটকালে কেন?' ভরাট গলা। শুনেই মনে হয়, এই মানুষটা সবসময় আদেশ দিতে অভ্যস্ত।

'আমার...আমার বাচ্চাটার খুব জ্বর...' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল জিশান, 'এখুনি হাসপাতালে না নিয়ে গেলে ছেলেটা মরে যাবে...' কথা বলতে-বলতে জিশান কেঁদে ফেলল। ব্যস্তভাবে হাত নেড়ে মিনিকে কাছে ডাকল। তারপর কী মনে করে ও হাতজোড় করে বলে উঠল, 'আমার বাচ্চাটাকে বাঁচান, স্যার। আমাদের একটু হাসপাতাল পৌঁছে দিন। প্লিজ। নইলে ছেলেটা মরে যাবে। আমাদের বাঁচান, স্যার...।'

লোকটা গাড়ির ভেতরে কাকে যেন ইশারা করল। অমনি গাড়ির হেডলাইট নিভে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার হাতে একটা টর্চ জ্বলে উঠল। জোরালো আলো ছিটকে এসে পড়ল জিশানের অসহায় মুখে, মিনির মুখে। মিনির মুখে আলোটা দু-চার সেকেন্ড বেশি রইল। তারপর ছায়ামানুষটা বলল, 'ভয় নেই—আমরা পুলিশের লোক। এসো, গাড়িতে ওঠো। তোমাদের হাসপাতালে নামিয়ে দিচ্ছি—।'

জিশান আর মিনি প্রায় দৌড়ে চলে এল গাড়ির কাছে। জিশান আবেগ জড়ানো গলায় বলল, 'থ্যাংক য়ু, স্যার...থ্যাংক য়ু...।'

লোকটা পিছনের দরজা খুলে ধরল। কোনওরকমে ছাতা দুটো বন্ধ করে পলিথিনে জড়ানো শানুকে সামলে ওরা গাড়িতে উঠে বসল। প্রথমে মিনি, তারপর জিশান। আর সবশেষে উঠে পড়ল লোকটা।

গাড়ির দরজা বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গেই কানফাটানো শব্দে বাজ পড়ল। শানু কেঁপে উঠল মিনির হাতে। কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

হেডলাইট জ্বলে উঠল। গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি আর ভাঙাচোরা রাস্তা।

জিশানের পাশে বসা লোকটা জিশানকে জিগ্যেস করল, 'কোন হসপিটাল?'

'যেখানে হোক। আমার বাচ্চাটা যেন বেঁচে যায়, স্যার।'

'ঠিক আছে। "সোলাস মেডিক্যাল কলেজ" চলো।' ড্রাইভারকে লক্ষ করে শেষ কথাটা বলল লোকটা।

মিনি লক্ষ করল, গাড়ির সামনের সিটে দুজন—তার মধ্যে একজন গাড়িটা চালাচ্ছে। আর পিছনের সিটে ওরা তিনজন।

এই প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এই তিনজন পুলিশের লোক কোন কাজে বেরিয়েছে?

মিনি কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছিল। শানুকে আরও কাছে টেনে নিয়ে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করল। হাতের পিঠ দিয়ে বাচ্চাটার জ্বর দেখল। ভয়ে ওর প্রাণটা বারবার কেঁদে উঠছিল। শানু ওদের সঙ্গে থাকবে তো? নাকি আকাশে একটা তারা কম আছে? সেখানে শানুকে খুব দরকার?

শানুকে একটু শান্ত করার পর মিনি জিশানের বাহু আঁকড়ে ধরল। ওকে কাছে টানল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কীরকম বিচ্ছিরি একটা গন্ধ...।'

জিশান ওর ঊরুতে চাপ দিয়ে ওকে চুপ করতে ইশারা করল। কারণ, গন্ধটা ও চিনতে পেরেছে।

মদের গন্ধ।

জিশানের মনে একটা আশঙ্কা ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু শানুকে বাঁচানোর মরিয়া দায় সেই আশঙ্কার গলা টিপে ধরছিল। মিনির ঊরু থেকে ও হাতটা সরাল না। ওর মনে হল, মিনিকে ছুঁয়ে থাকলে ওর মনে উথলে ওঠা ভয়টা কমে যাবে।

গাড়ি ঝাঁকুনি তুলে ছুটে যাচ্ছিল। ঝমঝম বৃষ্টি। নির্জন রাস্তা। রাস্তার দুপাশে কোথাও আলো আছে, কোথাও নেই।

জিশানের পাশে বসে থাকা লোকটা হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'কোথায় থাকো?'

জিশান মদের গন্ধের ঝাপটা টের পেল। লোকটার দিকে ফিরে তাকাল। বৃষ্টির ফোঁটা থেকে ঠিকরে আসা হেডলাইটের আলোর আভায় লোকটার আবছা মুখ দেখা যাচ্ছে।

জোরে শ্বাস টেনে জিশান বলল, 'মালির বাগানের বস্তিতে। যেখানে গাড়িতে উঠলাম তার কাছেই...।'

লোকটা আর কোনও কথা বলল না।

গাড়িটা এ-রাস্তা সে-রাস্তা ধরে বাঁক নিয়ে ছুটে চলল। কতকগুলো রাস্তায় এমন জল দাঁড়িয়ে গেছে যে, গাড়িটাকে জল ঠেলে এগোতে হচ্ছিল। ড্রাইভার মাঝে-মাঝেই বিরক্তির শব্দ করছিল।

মিনি অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। ভাবছিল, সোলাস মেডিকেল কলেজ আর কতদূর। আর কতদূর? জিশানকে সে-কথা একবার জিগ্যেসও করল। জিশান চাপা গলায় বলল যে, সোলাস মেডিকেল কলেজ ও চেনে না।

একটু পরেই গাড়িটা একটা মাঝারি রাস্তায় ঢুকে পড়ল। রাস্তাটা নির্জন।

দু-ধারে বড়-বড় ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়ি। ফুটপাথে বেশ কয়েকটা রুগ্ন গাছ। তার নীচে দু-চারটে ঝুপড়ি।

রাস্তাটায় তেমন আলো নেই। গাড়ির হেডলাইটের আলোই একমাত্র ভরসা। সেই আলো জমে থাকা বৃষ্টির জলে নাচছে।

রাস্তার শেষে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে একটা বড় বিল্ডিং—চারতলা কি পাঁচতলা হবে। তার গায়ে একটা গ্লো-সাইন জিশানের নজরে পড়ল। নীল আর লাল আলোকরেখা দিয়ে লেখা 'সোলাস মেডিকেল কলেজ'। তার মধ্যে বেশ কয়েকটা অক্ষর অন্ধকার—দাঁতের পাটি থেকে উধাও হয়ে যাওয়া দাঁতের মতো সেই রঙিন আলোর ভাঙাচোরা ছায়া রাস্তায় জমে থাকা জলে কাঁপছে।

মাঝারি রাস্তাটা শেষ হল সোলাস মেডিকেল কলেজে গিয়ে। জিশান দেখল, বিল্ডিং-এর দুপাশ দিয়ে দুটো সরু গলি অন্ধকারে ঢুকে গেছে।

গাড়িতে লোকগুলো নিজেদের মধ্যে প্রায় কোনও কথাই বলেনি। শুধু জিশানের পাশে বসা লোকটা দু-চারবার ছোট্ট করে ড্রাইভারকে কী যেন বলেছে। সেইসব কথার মানে বুঝতে পারেনি জিশান। হয়তো সাদা পোশাকের পুলিশের কোনও সাংকেতিক ভাষা হবে।

হসপিটাল বিল্ডিং-এর দিকে তাকিয়ে জিশানের একটু অবাক লাগছিল। কারণ, বিল্ডিং-এর নানান তলার কয়েকটা জানলায় খাপছাড়াভাবে আলো জ্বলছিল। বাকি সব জানলা অন্ধকার।

এখন রাত বেশি হয়নি। হাসপাতালের ব্যস্ততা এসময় কিছু কম হওয়া উচিত নয়। তা হলে...।

জিশান একটু অস্থির হয়ে পড়ছিল। মিনিকে ছুঁয়ে থাকায় ওর অস্থিরতাও টের পাচ্ছিল। ওদের করসিকা-এইট গাড়িটা গতি কমিয়ে হসপিটালের গাড়িবারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

কোনও কথা না বলে সামনের সিটে বসা দুজন দুপাশের দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল।

জিশানের পাশের লোকটা জিশানকে বলল, 'নেমে পড়ো। আমরা এসে গেছি।' বলে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল।

জিশান নীচু গলায় মিনিকে বলল, 'এসো—।' তারপর নিজে নেমে দাঁড়াল।

শানুকে ভালো করে মুড়ে জিশানের হাতে দিল মিনি। সাবধানে গাড়ি থেকে নামল।

গাড়ির দরজাগুলো শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। জিশানের পাশে দাঁড়ানো লোকটা ওর পিঠে হাত রেখে চাপ দিল : 'চলো—।'

ওরা সবাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ওদের পা ফেলার ছপছপ শব্দ বেশ জোরে শোনা গেল। ঝোড়ো

হাওয়ার ঝাপটায় জিশানের ঠোঁট শীত-শীত করে উঠল।

ওরা ভেতরে ঢোকার পর কেউ একজন সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির আওয়াজের মুখে কেউ যেন রুমাল চেপে ধরল।

ভেতরের দৃশ্যটা জিশান আর মিনিকে অবাক করে দিল। এতটাই যে, ওরা হতবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চারপাশটা দেখতে লাগল। একইসঙ্গে দেখতে লাগল তিনটে মানুষকেও—যারা এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে দেবতা হয়ে ওদের উপকার করেছে।

যে-ঘরটায় ওরা ঢুকেছে সেটা হসপিটালের রিসেপশান লাউঞ্জ। তবে এককালে ছিল—এখন আর নয়।

স্পেসটা মাপে বিশাল। দেখেই বোঝা যায়, বহুবছর ধরে অযত্নেঅবহেলায় পরিত্যক্ত। দেওয়ালে তিনটে জানলা, দুটো দরজা। সবগুলোই বন্ধ। সদর দরজার মুখোমুখি দেওয়ালে একটা করিডর ভেতর দিকে চলে গেছে।

সারাটা ঘর ধুলোয় ধুলোময়। চেয়ার, টেবিল, সোফা, রিসেপশান কাউন্টার সব এলোমেলোভাবে ঘরের নানান দেওয়াল ঘেঁষে ডাঁই করা। তার ওপরে কয়েকটা চেয়ার আর সোফা উলটো করে চাপানো। কয়েকটা আসবাবপত্র সাদা পলিথিন শিট দিয়ে ঢাকা। শিটের ওপরে ধুলোর পুরু আস্তরণ।

ঘরের দেওয়ালে অন্তত গোটাদশেক টুইন টিউবলাইটের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিটিং। ওই পরিত্যক্ত ঘরটা আলোয় ঝলমল করছে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে একটা ডিজিটাল ঘড়ি। তার উজ্জ্বল লাল এল. ই. ডি. বাতিগুলো ভুল সময় দেখাচ্ছে।

রিসেপশান স্পেস-এ একটাও লোক নেই। জিশানের মনে হল, ঘরটা এতদিন ধরে পরিত্যক্ত যে, তা থেকে আরশোলা আর ছাতা-ধরা গন্ধ বেরোচ্ছে। তার সঙ্গে মিশে গেছে ধুলোর গন্ধ আর মদের গন্ধ।

এর নাম হসপিটাল! আর এরাই-বা কেমন পুলিশ!

অবাক হওয়া ভয়ের চোখে মিনির দিকে তাকাল জিশান। কী এক অদৃশ্য সংকেতে সাড়া দিয়ে মিনিও সেই মুহূর্তে তাকিয়েছে স্বামীর দিকে। চোখে-চোখে ওদের কী কথা হল কে জানে! মিনি কেঁদে ফেলল। ছোট্ট শানুকে জিশানের হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে আঁকড়ে ধরল বুকে। বাচ্চাটা বোধহয় ঘুমিয়ে ছিল—এই ঝটকায় জেগে গিয়ে কঁকিয়ে উঠল।

জিশান খুব ধীরে-ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। তাকাল তিন দেবতার দিকে। ওদের ঠান্ডা পাথরে তৈরি মুখগুলো এখন অপদেবতার মতো লাগছে।

মুখগুলোকে খুঁটিয়ে দেখল জিশান।

ওদের পোশাক জলে ভেজা। মাথার ভেজা চুল লেপটে রয়েছে কপালে, গালে। মুখের চেহারায় তিনজনের মিল না থাকলেও ওদের চোখজোড়া একইরকম : মরা মাছের চোখ।

ওদের তিনজনের দুজন বেঁটে, একজন বেশ লম্বা। উচ্চতার হিসেবেই জিশানের মনে হল, লম্বা লোকটাই গাড়িতে জিশানের পাশে বসেছিল।

প্রথম বেঁটে লোকটার মাথায় টাক। রোগা। রং কালো। মুখে গোঁফ-দাড়ির বালাই নেই। ফলে একটা বাচ্চা-বাচ্চা ভাব ফুটে উঠেছে। লোকটা বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল। মিনির দিকে তাকিয়ে ছিল।

দ্বিতীয় বেঁটে লোকটা বেশ মোটা, গোলগাল লালটু মুখ। ফরসা। ঠোঁটের ওপরে পাতলা গোঁফ। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। দেখে মনে হয়, বয়েস ছাব্বিশ কি সাতাশের বেশি হবে না। চোখ দুটো ছোট-ছোট। ভেতরে ঢোকানো। বারবার নাক টানছে। বোধহয় জলে ভিজে ঠান্ডা লেগেছে।

লম্বা লোকটাকে দেখে মনে হয় এটাই পালের গোদা। কখন যে সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে জিশান টের পায়নি। হয়তো রিসেপশান স্পেসের জরিপে ওর মন ব্যস্ত ছিল বলে সিগারেটের গন্ধ নাকে আসেনি।

লোকটার রং তামাটে। জলে ভেজা মুখ যেন কাঠখোদাই ভাস্কর্য। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে। দু-গালে ব্রণের দাগ। কপালের ওপরে ভেজা চুল লেপটে আছে। সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে দিচ্ছে জিশানের দিকে। ওর কালচে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যাচ্ছে। ঠোঁটের ভাঁজে সামান্য হাসির ছোঁওয়া থাকলেও চোখে তার লেশমাত্র ছিল না।

জিশানের বুকের ভেতরে দুরমুশ পড়ছিল। মিনির আতঙ্কের গোঙানি আর শানুর মিহি গলার কান্না ওর চিন্তা ওলটপালট করে দিচ্ছিল। কী করবে এখন? কী করবে?

জিশান লম্বা লোকটাকে প্রশ্ন করল, 'এটা...এটা হসপিটাল?'

লম্বা হাসল। সিগারেটে ছোট মাপের হ্যাঁচকা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। সোলাস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। এককালে হেভি নাম ছিল। ভালো-ভালো ব্রেনি ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ত। এখন আমরা পড়াই।' সঙ্গী দুজনের দিকে আড়চোখে তাকাল সে। ছোট্ট করে হাসল। ধোঁয়া ছাড়ল আবার।

অস্বাভাবিক জোরে বাজ পড়ার শব্দ হল। আলো ঝলসে উঠল জানলায়। গোটা বিল্ডিংটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

'আমাদের ছেড়ে দিন। বাচ্চাটা মরে যাবে।' ওর গলা কান্নায় ভেঙে পড়ছে দেখে জিশান নিজেই অবাক হয়ে গেল : 'আপনারা তো পুলিশের লোক। দয়া করুন...।'

'হ্যাঁ, পুলিশের লোক। তবে আমরা দু-দিকেই আছি।' বলে হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল লম্বা লোকটা।

মিনি গোঙানি মেশানো গলায় বলে উঠল, 'আমাদের একটা হসপিটাল কি নার্সিংহোমে নিয়ে চলুন। বাচ্চাটার আবার জ্বর এসে গেছে।'

লম্বা লোকটা সিগারেটে জোরালো টান দিয়ে টুকরোটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে মাথা নাড়ল : 'হ্যাঁ, নিয়ে যাব, নিয়ে যাব। কোনও চিন্তা নেই। আধঘণ্টার মধ্যেই তোমাদের ছেড়ে দেব।'

জিশান ভয়ের চোখে মিনির দিকে তাকাল।

টাকমাথা বেঁটে লোকটার দিকে তাকিয়ে লম্বা লোকটা কী একটা যেন ইশারা করল। ইশারা বুঝতে পেরে বেঁটে রিসেপশান কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। তার পিছনে ঝুঁকে পড়ে কী যেন খুঁজতে লাগল।

লম্বা লোকটা ফুসফুসে লুকিয়ে রাখা সিগারেটের ধোঁয়া একটু-একটু করে ছাড়ছিল। সেই কাজ করতে-করতেই জিশানকে জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'জিশান।'

হাসল লোকটা : 'ও. কে., জিশান। বাচ্চাটাকে এবার তুমি কোলে নাও। তোমার বউকে ফ্রি করে দাও।'

জিশান পাগলের চোখে লম্বার দিকে তাকাল। এসব কথার মানে কী? তোমার বউকে ফ্রি করে দাও। কেন?

লম্বাকে সে-কথাই জিগ্যেস করল ও।

'কেন?'

'কোশ্চেন কোরো না। যা বলছি তাই করো।' কথা শেষ করেই আর-এক সঙ্গীকে ইশারা করল লম্বা।

সঙ্গে-সঙ্গে বেঁটে-বাল্টু লোকটা মিনির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

লম্বা লোকটার দিকে অপলকে তাকিয়ে জিশান মনে-মনে একটা হিসেব কষছিল। ও কি পারবে না তিন ঘুষিতে এই লোকটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে? যদিও-বা পারে, তারপর? আরও তো দুজন বাকি থাকবে।

জিশান হিসেব করে দেখল, ও পেরে উঠবে না। ও যখন লম্বার সঙ্গে লড়বে তখন বাকি দুজন ওকে পিছন থেকে আক্রমণ করবে। অথবা, আরও সহজ—ওরা মিনি আর শানুর দখল নিয়ে নেবে।

জিশান লম্বা লোকটার দিকে তাকিয়ে হিসেব কষছিল। তাই টাকমাথা বেঁটে লোকটার দিকে নজর রাখতে পারেনি। যদি পারত, তা হলে হিসেব কষার ব্যাপারটা ও মাঝপথেই থামিয়ে দিত।

লম্বার ইশারায় ও ঘাড় ঘুরিয়ে টাকমাথার দিকে দেখল। সঙ্গে-সঙ্গে ওর শরীরের ভেতরে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল।

টাকমাথা লোকটার ডানহাতে একটা দু-ফুট লম্বা ঝকঝকে চপার। ওটা হাতে ঝুলিয়ে ও জিশানদের কাছে এগিয়ে আসছে।

মিনি অসহায়ভাবে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল।

লম্বা হেসে বলল, 'জোরে চেল্লালেও কোনও প্রবলেম নেই। এখানে আমরা ছাড়া শোনার মতো আর কোনও পাবলিক নেই।' জিশানের দিকে চোখের ইশারা করল : 'নাও। ঝটপট বাচ্চাটাকে নিয়ে বউকে ফ্রি করো। কাজের সময় এসব ক্যাওড়া কিচকিচ ভাল্লাগে না।'

টাকমাথা লোকটা তখন দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে চপারটা শূন্যে তুলে বাতাস কেটে শ্যাডো প্র্যাকটিস করছে আর হাসছে।

জিশানের চোখের সামনে একটা দুঃস্বপ্ন ভেসে উঠল। লালে মাখামাখি দুঃস্বপ্ন। ও তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে শানুকে কোলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে মিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

লম্বা লোকটা জিশানকে বলল, 'গুড বয়। এবার ছেলেকে নিয়ে ভেতরের ঘরে যাও।' বেঁটে-লালটু লোকটাকে লক্ষ করে সে বলল, 'যা, বসকে খবর দে। বল মাল রেডি। কত নম্বর ঘরে ডেলিভারি দেব জিগ্যেস কর...।'

বেঁটে-লালটু রিসেপশান স্পেসের ডানদিকের একটা দরজার দিকে হাঁটা দিয়েছিল। আর টাকমাথা লোকটা তরোয়াল খেলা থামিয়ে চপার তুলে জিশানকে ভেতরের করিডরের দিকে এগোতে ইশারা করল। মুখে বলল, 'জলদি। কুইক।'

মিনি বুকের কাছে দু-হাত জড়ো করে গুটিয়ে কাঁদছিল। আর জিশানের বুকের ভেতরটা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। ওদের তিনজনের মামুলি জীবনে এরকম ভয়ংকর ঘটনা কখনও ঘটবে ও ভাবতে পারেনি। আজ রাতেই কি শেষ হয়ে যাবে ওদের তিনজনের জীবন?

তখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেল জিশান। কোনও একটা সিঁড়ি ধরে একটা ভারী শরীর ধীরে-ধীরে নেমে আসছে।

জিশান থমকে দাঁড়াল। আওয়াজটা কোনদিক থেকে আসছে বুঝতে চেষ্টা করল।

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই ও চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, বেঁটে-লালটু লোকটা যে-দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা ও খোলার আগেই দরজার ওপাশ থেকে পাল্লায় প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল কেউ।

সেই ধাক্কায় বেঁটে-লালটু ছিটকে পড়ল মেঝেতে। সেখানেই রইল। দড়াম শব্দ করে দরজার পাল্লা দুটো হাট হয়ে খুলে গেল। দুদিকের দেওয়ালে বাড়ি খেয়ে আধাআধি ফিরে এল, কাঁপতে লাগল।

যে-লোকটি ঘরে ঢুকল তাকে লোক না বলে পাহাড় বললেই মানায় ভালো।

লম্বায় অন্তত সাড়ে ছ-ফুট। মাথার চুল কীর্তনিয়াদের মতো ঘাড় ছাপিয়ে নেমে এসেছে। কপালের ওপরেও চুলের ঝালর। তারই ফাঁকফোকর দিয়ে ছলছলে চোখ নজরে পড়ছে। ঈগলপাখির মতো নাক। তার নীচে মোটা গোঁফ। গোঁফের

পরেই তামাটে রঙের পুরু ঠোঁট। ঠোঁটজোড়া সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। তীক্ষ্ণ চিবুকে একখাবলা দাড়ি।

রিসেপশান স্পেস-এ কয়েক পা ঢুকে পাহাড়ের মতো লোকটা থমকে দাঁড়াল। একপলক চোখ বুলিয়ে পাঁচজন মানুষকে চেটে নিল।

লোকটার গায়ে একটা ছেঁড়া টি শার্ট। তার রং কালো। পায়ে নীল রঙের জিন্‌স। জিন্‌সের পায়া দুটো দেড়ফুট করে ছিঁড়ে বাদ দেওয়া। তাই হাঁটুর নীচ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লোমশ পা দেখা যাচ্ছে। তারপরই গাঢ় নীল রঙের স্নিকার—মোজার কোনও বালাই নেই।

লোকটার দু-হাতে নীল রঙের রিস্ট ব্যান্ড। আর ডানহাতে দুলছে একটা বাদামি রঙের বোতল।

এতক্ষণ যে-লোকটাকে জিশান পালের গোদা ভেবেছিল সে পাহাড়ের কাছে এগিয়ে গেল। মিনমিনে গলায় বলল, 'বস, নিয়ে এসেছি...।' কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে মিনির দিকে দেখাল।

পাহাড় মিনির দিকে দেখল। মিনির সারা গা বৃষ্টিতে ভেজা। পাতলা ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। ঘন-ঘন চোখের পলক পড়ছে। ওর ভয়ার্ত মুখটাকে জলরঙে আঁকা ছবি বলে মনে হচ্ছে।

'হুঁ-উ-উ...।' মুখে অদ্ভুত এক শব্দ করল বস। মিনির দিকে পা বাড়াল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বেঁটে-লালটুর বডিতে হোঁচট খেল।

বেঁটে-লালটুকে ভয়ংকর এক লাথি কষাল বস। 'ওঁক' শব্দ করে বেঁটে-লালটুর বডিটা কয়েক পাক গড়িয়ে গেল।

বিরক্তিতে গালাগাল দিল পাহাড়। শূন্যে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিল : 'এ লালিপপের বাচ্চাটা এখানে পড়ে কেন?' যেন দরজার ধাক্কা খেয়ে বেঁটে-লালটু যে পড়ে গেছে সেটা পাহাড় খেয়ালই করেনি।

প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে বাকি দুজন দৌড়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল বেঁটে-লালটুর ওপর। ওর অজ্ঞান বডিটাকে চটপট টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে দিল রিসেপশান কাউন্টারের দিকে।

ততক্ষণে বস মিনির দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে এসেছে।

মদের গন্ধটা এখন আর লুকোচুরি খেলছিল না—বরং সরাসরি নাকে এসে ধাক্কা মারছিল।

মিনির খুব কাছে এসে বস থমকে দাঁড়াল। ছলছলে মাতাল চোখে মিনিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর ফিসফিস করে উচ্চারণ করল, 'বিউটিফুল!'

মিনির মুখে মদের বাষ্পের হলকা এসে লাগল। ও ঝটকা মেরে মুখটা একপাশে সরিয়ে নিল।

পাহাড় হাসল। বাঁ-হাতের তর্জনি মিনির চিবুকে ছোঁয়াল। তারপর তর্জনির

চাপে মিনির মুখটা ধীরে-ধীরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। অনেকক্ষণ ধরে মিনিকে দেখল। শেষে ভরাট গলায় বলল, 'যা কান্নাকাটি করার করে নাও। পরে আর প্যানপ্যান কোরো না যেন।'

রিসেপশান স্পেসের শেষ প্রান্তে জিশান পলিথিন মোড়া বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। ও যেন এখানকার কেউ নয়। ও যেন বহু দূরে দাঁড়িয়ে একটা মর্মান্তিক সিনেমা দেখছে। ও দর্শক। ওর কিছু করার নেই।

পাহাড় থেমে-থেমে বলল, 'একে তিননম্বর ঘরে ডেলিভারি দে। ওটা পেয়িং বেড-এর ঘর। কন্ডিশন ভালো।'

জিশান আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে উঠল : 'না—।'

জিশান চায়নি, কিন্তু ওকে অবাক করে অবাধ্য চিৎকারটা কীভাবে যেন গলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বস ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জিশানের দিকে। এক ঝটকায় ডানহাতের বোতলটা ছুড়ে দিল দেওয়ালে। প্রচণ্ড শব্দে চুরমার হয়ে গেল বোতলটা। বোতলের তরল ছিটকে পড়ল। মদের বিশ্রী গন্ধে চারিদিক ম-ম করে উঠল।

আচমকা এই কাণ্ডে মিনি চমকে কঁকিয়ে উঠেছিল। বস ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। মাথা দুলিয়ে জিগ্যেস করল, 'ও কে রে? হাজব্যান্ড? হাজব্যান্ড? না বয়ফ্রেন্ড?'

না, উত্তরের অপেক্ষা করল না। পাহাড় পায়ে-পায়ে জিশানের দিকে এগোতে লাগল। ঘরের প্রত্যেকে আশঙ্কায় পাথর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

টাকমাথা সঙ্গীর হাত থেকে এক হ্যাঁচকায় চপার ছিনিয়ে নিল। জিশানের আরও কাছে এগিয়ে এল। ওর শরীরে জিশানের শরীর মিনির চোখে ঢাকা পড়ে গেল।

জিশানের খুব কাছে এসে বাঁ-হাতে ওর চিবুক উঁচিয়ে ধরল পাহাড়। তারপর গলাটা যথাসম্ভব মিষ্টি করে জিগ্যেস করল, 'কীসের "না" রে? কী "না" বলছিস?'

জিশান কাঁপছিল। ওর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছিল না।

পাহাড় চপারটা শূন্যে তুলল। ওটার ফলাটা জল্লাদের ভঙ্গিতে জিশানের মাথায় পেতে রাখল। তারপর ফিসফিসে গলায় বলল, 'আমি বলছি। আজ কোনও "না" শুনব না। সব হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—।'

এমন সময় জোরে বাজ পড়ল। অসহায় চূর্ণবিচূর্ণ জিশান মদের বাষ্পের বিষবাতাসে শ্বাস নিতে-নিতে কেঁদে ফেলল। আর ওর কোলে ছোট্ট শানুও কেঁপে উঠে কেঁদে ফেলল।

পাহাড় চমকে উঠল। চপারটা নামিয়ে বাচ্চার কান্নার উৎস আঁচ করে

জিশানের কোলের দিকে তাকাল। কিন্তু পলিথিন আর কাপড়চোপড়ের আড়ালে শানুকে ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছিল না।

'কে রে, কে কাঁদছে?'

'আমাদের বাচ্চা।' কান্না ভাঙা গলায় জিশান বলল।

যন্ত্রের মতো বাঁ-হাত বাড়াল পাহাড়। পলিথিন আর কাপড়ের আড়াল সরাল। পুঁচকে শানুকে দেখা গেল এবার। চোখ কুঁচকে কাঁদছে।

হাত থেকে চপার খসে পড়ে গেল। শানুর ওপর ঝুঁকে পড়ল পাহাড়। আঙুল দিয়ে ওর লালচে গাল ছুঁল।

'কাঁদে না, বাবু, কাঁদে না। লক্ষ্মী ছেলে। লক্ষ্মী সোনা আমার—।'

জিশান অবাক চোখে কাছের মানুষটাকে দেখতে লাগল। তারপর বলল,—'আমার ছেলেটার ভীষণ জ্বর। এখুনি হসপিটালে না নিয়ে গেলে মরে যাবে...।'

পাহাড় যেন বিদ্যুতের শক খেল। তাড়াতাড়ি শানুর কপাল ছুঁয়ে দেখল। তারপর নিজের মাথার চুলে হাত চালিয়ে আপনমনেই বলল, 'আমার...আমার বউটা মরে গেল। তারপর...তারপর...মা-কে না পেয়ে এইটুকুন ছেলেটাও মরে গেল। তারপর...।'

মিনি প্রায় ছুটে চলে এল শানুর কাছে। নিষ্ঠুর পাহাড়কে ভ্রূক্ষেপ না করে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। পিঠ চাপড়ে দোলা দিয়ে ওর কান্না থামাতে চেষ্টা করল।

জিশান জিগ্যেস করল, 'আপনার ওয়াইফের কী হয়েছিল?'

পাহাড় মিনির কোলে শানুকে দেখছিল। বলল, 'সবই কপাল! এই জানোয়ার শহর। চারদিকে জংলি জানোয়ার ঘুরছে।...বউটাকে তুলে নিয়ে গেছিল। তারপর...ও ফিরে এসে সুইসাইড করল। তারপর বাচ্চাটা মরে গেল। বাস...সব খতম...শুধু আমি বাকি রয়ে গেছি।'

বাইরে বাজ পড়ল আবার।

পাহাড় ওর লম্বা শাগরেদের কাছে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল। নোংরা খিস্তি দিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় দু-হাতে ওর দু-গালে একসঙ্গে চড় কষিয়ে দিল। ছোটবেলায় কাগজের ঠোঙা ফুলিয়ে হাতের চাপড়ে ফাটাত জিশান। এখন ঠিক সেইরকম কানফাটানো শব্দ হল। যমজ চড় খেয়ে লোকটা মেঝেতে খসে পড়ল। তারপর স্থির হয়ে গেল। বোধহয় বেঁটে-লালটুর মতো অজ্ঞান হয়ে গেল।

টাকমাথা লোকটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে একইরকম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পাহাড় ওর কাছে এগিয়ে গেল না। শুধু হুকুম ছুড়ে দিল, 'এক্ষুনি এদের গাড়ি করে নিয়ে যা। "ক্যাপিটাল নার্সিংহোম"-এ পৌঁছে দে। দেরি করলে বাচ্চাটার বিপদ হয়ে যাবে। জলদি বেরিয়ে পড়—।'

টাকমাথা বুলেটের গতিতে সদর দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পাহাড় মিনির কাছে এগিয়ে এল। বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে নিজের চোখ মুছে নিয়ে ছোট্ট করে বলল, 'সরি। ভুল হয়ে গেছে।'

জিশানের দিকে তাকাল পাহাড় : 'জলদি যাও। ছেলেটাকে বাঁচাও।'

জিশান আর মিনি তাড়াতাড়ি পা বাড়াল।

কিন্তু পাহাড় পিছন থেকে ডাকল : 'শোনো—।'

জিশান থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল।

পাহাড় লম্বা পা ফেলে ওর কাছে এগিয়ে এল। জিন্‌সের পকেট থেকে খাবলা মেরে কী যেন তুলে নিয়ে জিশানের জামার পকেটে গুঁজে দিল।

জিশান তাকিয়ে দেখল। একগাদা টাকা।

ওর কান্না পেয়ে গেল। কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু পারল না। ঠোঁট কাঁপল শুধু।

মিনি জলভরা চোখে বিশাল মানুষটাকে দেখছিল।

পাহাড় জিশানকে ঠেলা মারল : 'দেরি কোরো না। ছেলেটাকে বাঁচাও।'

জিশান আর মিনি সোলাস মেডিকেল কলেজ থেকে বাইরের ঝড় বৃষ্টিতে বেরিয়ে এল।

●

সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল শানু আর মিনি। তার সঙ্গে জিশানও। আজও শানু আর মিনিকে রক্ষা করতে জিশানকে অলৌকিক কিছু একটা করতে হবে—করতেই হবে।

জিশানের ভেতরে একটা মরিয়া রাগ তৈরি হল। শ্রীধর পাট্টা আর নিউ সিটির সিন্ডিকেটের প্রতি তীব্র ঘৃণা আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতো গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা শরীরে। বজ্রের শক্তি নিয়ে ওর ডানহাঁটু আছড়ে পড়ল জাব্বার মুখে। জিশান জাব্বার মাথাটা শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে ছিল। ওই সংঘর্ষটা হল মারাত্মক।

জাব্বার নাক থেবড়ে গেল। রক্ত ছড়িয়ে গেল ঠোঁটে, দাঁতে। ওর শক্তিশালী তীব্র মুঠি পলকে ঢিলে হয়ে গেল। ও একপাশে কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

জিশান সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইছিল, কিন্তু ওর মাথা টলছিল। সারা গায়ে নানারকম জ্বালা-যন্ত্রণা। নাকের পাশে যেখান দিয়ে রক্তের রেখা গড়িয়ে পড়েছে সেখানটা চুলকোচ্ছে। মাথার ওপরে চক্রাকারে উজ্জ্বল আলো, মাইকে মস্তনয়ের ধারাবিবরণী, দর্শকদের উন্মত্ত ক্ষুধার্ত চিৎকার—সব মিলিয়ে কেমন একটা ঘোর তৈরি হয়ে যাচ্ছিল।

সেই অবস্থাতেই দর্শকদের আসনগুলোয় অনুসন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিল জিশান। অসম্ভব জোরালো লাল রঙের পোশাক পরা একটা মেয়েকে খুঁজল। কিন্তু পেল না।

জাব্বা কাদা-মাটিতে পড়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু ও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। যাওয়ার কথাও নয়। ও একপাক গড়িয়ে শরীরটাকে চিত করে নিয়েছিল। তারপর সেই অবস্থাতেই ভয়ংকর এক গর্জন করে অদ্ভুত এক লাফ দিয়েছে। এবং জোড়াপায়ের প্রচণ্ড লাথি জিশানের তলপেটে বসিয়ে দিয়েছে।

জিশান ছিটকে উঠল শূন্যে। প্রায় উড়ে গিয়ে ছ'হাত দূরে আছড়ে পড়ল মাটিতে। তারপর পক্ষাঘাতের রুগির মতো অসাড় শরীরে চিত হয়ে পড়ে রইল। ওর শূন্য চোখ চেয়ে রইল ওপরের কালো আকাশের দিকে। উজ্জ্বল আলোর ঝলসানি পেরিয়ে তারাগুলো এমনিতে চোখে পড়ার কথা নয়, কিন্তু জিশানের চোখের সামনে প্রচুর তারা নাচানাচি করছিল। শরীরের কোনও যন্ত্রণাই ও আর টের পাচ্ছিল না।

জাব্বা তখন যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গিতে মুঠি উঁচিয়ে গর্তের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর উল্লাসে পশুর মতো হুঙ্কার ছাড়ছে। গ্যালারিতে উত্তেজনা টগবগ করছে। আকাশে বাতাসে শব্দের খই ফুটছে।

প্রচুর শব্দ জিশানের কানে ঢুকে পড়ছিল। দর্শকদের মধ্যে যারা জিশানকে সমর্থন করছিল তারা ওর নাম ধরে গলা ফাটাতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে জাব্বাকে খতম করার জন্য হিংস্র গলায় ওকে উৎসাহ দিতে লাগল। কেউ-কেউ ওকে কাপুরুষ বলে দুয়ো দিতে লাগল। আর ওর বিরোধী পক্ষ জাব্বার নাম ধরে অদ্ভুত তালে চিৎকার করতে লাগল। তার সঙ্গে স্লোগান তুলল : 'জিশান—খতম! জিশান—খতম!'

জায়ান্ট টিভির পরদায় বিভিন্ন দর্শকের ক্লোজ-আপ দেখানো হচ্ছিল। মাঝে-মাঝে ভেসে উঠছিল শ্রীধর পাট্টার মুখ। তার সঙ্গে উত্তেজিত গলায় মণীশ আর রাজশ্রীর ধারাবিবরণী।

টিভিতে দেখা গেল, গ্যালারিতে জাব্বা আর জিশানের সমর্থক দু-দল দর্শকের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেছে। সিকিওরিটি গার্ডের দল শকার হাতে সেই লড়াই নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। টিভির ধারাবিবরণী আর ছবি পিট ফাইটের জীবন্ত উত্তেজনা নিউ সিটির ঘরে-ঘরে নিখুঁতভাবে পৌঁছে দিচ্ছিল।

শুয়ে থাকা জিশানের মনে একটা আক্ষেপ তৈরি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ও খুব ক্লান্ত—আর পারবে না। মিনি-শানুর কাছে ফিরতে পারবে না। মনোহরকে দেওয়া কথা রাখতে পারবে না।

ঠিক তখনই জাব্বা দেওয়ালের এক কোণ থেকে র‍্যাক মাম্বা সাপটা মুঠো করে তুলে নিয়েছে। ছুড়ে দিয়েছে জিশানের বুকের ওপরে।

কয়েক লহমা সাপটা ব্যাকপ্যাকে কালো পাইপের মতো জিশানের বুকের ওপরে পড়ে রইল। ওর কালো রঙের জিম ভেস্টের সঙ্গে সাপটা মিশে গেল। পরমুহূর্তেই ওটা বিদ্যুৎগতিতে ছোবল মারল জিশানের গলায়।

জিশান যন্ত্রণায় ঝাঁকুনি খেল। সাপটার বিষ যে বের করে নেওয়া হয়েছে সে-কথা ভুলেই গেল। চেতন আর অচেতন জগতের সীমারেখায় একটা ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে জিশান মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হতে লাগল, ও আর পারবে না। প্রতি মুহূর্তে ও শেষ মুহূর্তের দিকে এগোচ্ছে।

এমন সময় এক তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল জিশান।

'জিশান! জিশা —ন!'

না, জায়ান্ট টিভি থেকে নয়—এই ডাক শোনা যাচ্ছে দর্শকদের গ্যালারি থেকে। একটা তীব্র মেয়েলি চিৎকার। সব হারানোর মুহূর্তে কেউ যেন জিশানের কাছে সাহায্য চেয়ে পাগলের মতো মরিয়া চিৎকার করছে।

ঝাপসা চোখে জিশান মেয়েটিকে খুঁজে চলল। কোথায়? কোথায়?

একটা লাল ঝলক দেখতে পেল। গ্যালারি থেকে ছুটে নেমে আসছে লাল জামা পরা একটা মেয়ে। ওর বয়কাট চুল পিছনদিকে উড়ছে। ও সিঁড়ির ধাপে পা ফেলে ছুটে নামার তালে-তালে সেই চুল লাফাচ্ছে।

রূপকথা!

কথা রেখেছে ও। সত্যি ও লাল ড্রেস পরে এসেছে। কোমর পর্যন্ত ঝুলহাতা শার্ট একটা। তার সঙ্গে প্যান্ট। সেটার রং কালো বা নীল একটা কিছু।

মেয়েটা পলকে চলে এল গর্তের কিনারায়। জিশানের দিকে তাকিয়ে গর্তের কিনারা বরাবর দৌড়ে পাক খেতে লাগল। আর জিশানের নাম ধরে উদভ্রান্তের মতো চিৎকার করতে লাগল।

কোনও সিকিওরিটি গার্ড রিমিয়াকে বাধা দেয়নি। বরং এই গেম শো-র জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য টিভি ক্যামেরা রিমিয়াকে ধরে ফেলল। জায়ান্ট টিভির পরদায় ওর ছবি ধরা পড়ল। ওর চিৎকার শোনা গেল লাউডস্পিকারে।

'জিশান! জিশান! ওঠো। উঠে পড়ো! তোমাকে জিততে হবে, জিশান—উঠে পড়ো। তুমি বলেছিলে আমি এই খেলা দেখতে এলে তোমার খুব জিততে ইচ্ছে করবে। মনে নেই সে-কথা? আমি তো খেলা দেখতে এসেছি। এবার তুমি তোমার কথা রাখো। ট্রাই হার্ড টু উইন। কাম অন, জিশান! বি আ ম্যান—।'

রিমিয়া চিৎকার করে কথাগুলো বলছিল আর গর্তের পাড়ে পাগলের মতো পাক খাচ্ছিল। ওর লাল জামাটার ওপরে জিশান নজর রাখতে চেষ্টা করছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ওটা ম্যাটাডরের লাল রেশমি রুমাল। আর বুল ফাইটের রিং-এর ভেতরে জিশান রক্তাক্ত আহত জেদি ষাঁড়।

রিমিয়াকে দেখতে-দেখতে—অথবা, ওর লাল জামাটা দেখতে-দেখতে—

জিশানের ভেতরে একটা গোঁ মাথাচাড়া দিল। ওর না শপথ ছিল মরার আগে ও মরবে না! মালিক আর মনোহরকে ও কথা দিয়েছে না!

আচমকা ব্ল্যাক মাম্বার ছোবল এসে পড়ল জিশানের গালে। গালটা যেন জ্বলে গেল। রক্তের রেখা গড়িয়ে পড়ল ফরসা গাল বেয়ে।

কোন এক অলৌকিক শক্তিতে জিশান উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে গর্তের কিনারায় বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকা রিমিয়া থমকে দাঁড়াল। বাচ্চা মেয়ের মতো আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগল। 'জিশান! জিশান!' বলে খুশিতে চিৎকার করতে লাগল।

জিশানের গা থেকে সাপটা খসে পড়েছিল মাটিতে। ওটার দিকে তাকাল জিশান। হিংস্রতার ঢেউ হঠাৎই উথলে উঠল ওর শরীরে। চোখের পলকে সাপটাকে পা দিয়ে চেপে ধরল। তারপর ঝুঁকে পড়ে দু-হাতের আঙুল বাঁকিয়ে কয়েক খাবলা মাটি তুলে সাপটার মাথা লক্ষ্য করে সজোরে চাপড় মেরে বসিয়ে দিল। একবার—দুবার—বারবার।

আঠালো মাটির নীচে সাপটা জ্যান্ত কবরে চলে গেল। সেই কবরের ওপরে জিশান পা দিয়ে দুরমুশ করতে লাগল। সাপটাকে দম আটকে মরতেই হবে—মরতেই হবে।

এবার জাব্বা।

জাব্বার দিকে তাকাল জিশান। ও তখনও দর্শকদের দিকে তাকিয়ে উল্লাসের অঙ্গভঙ্গি করছে। রিমিয়ার কাছাকাছি গিয়ে জাব্বা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মুখ উঁচু করে ওর দিকে তাকিয়ে ইশারায় নিজের গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোর জিশান...খতম।'

এতক্ষণ জাব্বা জিশানকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন পিট ফাইট শেষ হয়ে গেছে। জিশানের শক্তির শেষ বিন্দুটাও ও ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়েছে। তাই ও অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল। আর সেটাই ওর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল।

জাব্বাকে লক্ষ্য করে আচমকা দৌড় শুরু করল জিশান।

চোখের কোণ দিয়ে আক্রমণটা খেয়াল করে জাব্বা যখন জিশানের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ততক্ষণে কয়েক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেছে।

দুটো বলবান শরীরের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। শরীরে শরীর জট পাকিয়ে গর্তের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ওরা ঠিকরে পড়ল মাটিতে। তারপর দু-দিকে ছিটকে গেল।

জিশান বুঝতে পারছিল, যা কিছু করার তা তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ, ওর ক্ষমতা চুঁইয়ে-চুঁইয়ে প্রায় শেষের দিকে। সুতরাং, এখনই—এখনই।

জাব্বা নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, জিশান সেই মুহূর্তে তিনপাক গড়িয়ে পৌঁছে গেল ওর কাছে। চিত হওয়া অবস্থায় শরীরের নীচের অংশটাকে

একঝটকায় শূন্যে তুলে লাথি বসিয়ে দিল জাব্বার মুখে। আর প্রায় একইসঙ্গে ওর পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল।

জাব্বা আবার পড়ে গেল, কিন্তু তারই মধ্যে জিশানের বাঁ-চোখে একটা মারাত্মক ঘুসি বসিয়ে দিল।

জিশান উঠে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর চোখের সামনে পলকে সবকিছু মুছে গিয়ে অসংখ্য তারা ঝিলমিল করে উঠল আবার।

কিন্তু জিশান থামল না। ওই 'অন্ধ' অবস্থাতেই প্রতিরক্ষার পদক্ষেপ নিল। ক্ষিপ্রগতিতে জোরালো ঘুসি ছুড়ে দিল সামনে। এবং জাব্বার মুখ ঘুসির নাগালে পেয়ে গেল।

নজর পরিষ্কার করতে জিশান বারদুয়েক ঝটকা মেরে মাথা ঝাঁকাল। তারপর চোখ খুলতেই বুঝতে পারল, ও এখন একটা চোখে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ওর অন্য চোখটা গেল কোথায়? এখন কোনদিকে তাকিয়ে আছে সেটা? চোখটা কোটরে আছে তো, নাকি বাইরে বেরিয়ে এসেছে?

প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সময় নেই। এখন শুধু প্রতিরক্ষা। মারের বদলা মার।

জিশান ঝাপসা নজরে তাকাল জাব্বার দিকে। এবং তাকিয়েই অবাক হল।

জাব্বা কোথায়? ওর সামনে শ্রীধর পাত্রার মুখ। সে-মুখে কাদা-মাটি লেগে রয়েছে। রয়েছে রক্তের ছাপ।

জিশান হুমড়ি খেয়ে পড়ল শ্রীধরের শরীরের ওপরে। পাগলের মতো ঘুসি মেরে চলল। ঘুসির পর ঘুসি। শ্রীধরের মুখটা আরও লাল হয়ে যেতে লাগল। হামানদিস্তের ভেতরে রসুনের কোয়া ছেঁচার মতো জিশানের লোহার হাত শ্রীধরের মুখ ছেঁচতে লাগল।

চোখের সামনে জাব্বার মুখটা ফিরে এল আবার। ও চিৎকার করছিল। ওর শরীরটা মাথা ছেঁচে দেওয়া মাগুরমাছের মতো ছটফট করতে লাগল। ওর হাতের আঙুল কখনও জিশানের বাহু, কখনও বাতাস আঁকড়ে ধরছিল।

জিশানের ডানহাতের আঙুলের গাঁট ছড়ে গিয়ে মাংস বেরিয়ে পড়েছে. হাতের মুঠো রক্তে মাখামাখি। বেশিরভাগটাই ওর রক্ত—বাকিটা জাব্বার। কিন্তু ওর শরীর এতটাই অসাড় হয়ে গেছে যে, কোনও যন্ত্রণা ও আর টের পাচ্ছিল না।

জাব্বা হঠাৎই জিশানের গলার নাগাল পেয়ে গেল। ওর সাঁড়াশির মতো আঙুল চেপে বসল গলার নরম মাংসে। জিশানের মাথার ভেতরে একটা শিরা দপদপ করতে লাগল। ওদের যুযুধান শরীর দুটো আহত কেন্নোর মতো পাকাতে লাগল, পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে এপাশ-ওপাশ মোচড় দিয়ে লড়াই করে চলল।

জিশান বুঝতে পারছিল ওর ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ওকে লড়াই শেষ করতে হবে—অথবা, নিজে শেষ হয়ে যাবে। একটু আগে কবর দেওয়া সাপটার কথা মনে পড়ল ওর। জাব্বা সাপের চেয়ে কম কী।

মুহূর্তের মধ্যে স্যাঁতসেঁতে জমি থেকে একখাবলা মাটি তুলে নিল জিশান। এক প্রচণ্ড হুঙ্কার তুলে সেই মাটিসমেত হাত দেওয়ালে ঘুঁটে দেওয়ার ঢঙে আছড়ে দিল জাব্বার রক্তাক্ত মুখের ওপরে।

দম আটকে আসায় জাব্বার শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে গেল। জিশানের গলায় ওর হাতের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেল। মুখে ঢুকে যাওয়া মাটি থু-থু করে ছুড়ে দিল শূন্যে। তারপর সবে ও যখন বড় করে একটা শ্বাস টানতে শুরু করেছে অমনি জিশানের মাটিসমেত হাতের থাবা ওর মুখে আছড়ে পড়ল দ্বিতীয়বার। তৃতীয়বার। এবং আরও অনেকবার।

জিশান যেন পাগল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় 'সাপ'টাকে কবর দিতে চাইছে প্রাণপণে।

জাব্বার গলা দিয়ে চাপা ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল। একটানে ওর কাহিল শরীরটাকে উপুড় করে দিল জিশান। ভাঁজ করা হাঁটু নিয়ে শরীরের সমস্ত ওজন আছড়ে দিল ওর শিরদাঁড়ার ওপরে। তারপর ঘোড়ায় চড়ার মতো ওর পিঠে চেপে বসল। মাথাটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল পিছনদিকে।

জাব্বার ঘাড় ক্রমশ ভাঁজ হয়ে যেতে লাগল। মনে হচ্ছিল, জিশান ওকে জোর করে আকাশ দেখাতে চাইছে, আকাশের তারা দেখাতে চাইছে।

একটা 'মট' শব্দ হল। হয়তো জাব্বার ঘাড়ের হাড়ের ঠোকাঠুকির শব্দ। একটু আগেই মুখের মাটি থু-থু করে ফেলে দিয়ে জাব্বা হাঁ করে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল। সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ওর মুখ থেকে কোনও চাপা ঘড়ঘড় শব্দও বেরোচ্ছে না। ও হয়তো অক্ষম শরীরে শেষ মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছে।

জিশানও বুঝতে পারছিল আর মাত্র দু-এক ডিগ্রি। ঘাড়টাকে আর দু-এক ডিগ্রি পিছনদিকে বাঁকাতে পারলেই লড়াই খতম—জাব্বাও খতম।

কিন্তু হঠাৎই ওর সামনে ঝড়-বৃষ্টির সেই রাতটা ভেসে উঠল। পাহাড়ের মতো সেই ভয়াবহ মানুষটা সেদিন অনেক কিছুই করতে পারত—কিন্তু করেনি। করেনি বলেই আজ জিশান এখানে মিনি আর শানুর জন্য মরণপণ লড়াই করছে। পাহাড়ের মতো সেই মানুষটার শুধু শরীরটাই পাহাড় ছিল না, একপলকে ওর মনটাও হয়ে গিয়েছিল অনেক বড়—পাহাড়ের মতো। এখন জিশান কি সেরকম কিছু একটা...।

জাব্বার মাথাটা আচমকা ছেড়ে দিল জিশান।

গ্যালারি থেকে উন্মত্ত দর্শকের দল এতক্ষণ 'খতম। খতম।' বলে রণডঙ্কা বাজাচ্ছিল। জিশান জাব্বার মাথাটা ছেড়ে দিতেই সব চেঁচামেচি একলহমার জন্য

থেমে গেল। গ্যালারি থেকে একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাসের 'ফোঁস' শব্দ শোনা গেল যেন। তারপরই জিশানের নামে গ্যালারির প্রতিটি বিন্দু কেঁপে উঠল।

জাব্বার শরীরটা ছেড়ে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল জিশান। ও হাপরের শব্দ করে হাঁপাচ্ছিল। জাব্বা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। শরীর স্থির হলেও শ্বাসপ্রশ্বাসের সামান্য ওঠা-নামা চোখে পড়ছে। সেদিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর প্রতিদ্বন্দ্বীর গায়ে থুতু ছুড়ে দিল জিশান। টকটকে লাল রঙের থুতু দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে গেল।

জায়ান্ট টিভির পরদায় সুন্দরী রেফারিকে দেখা গেল এবার। মিষ্টি গলায় ছত্রিশরকম উল্লাস ফুটিয়ে রেফারি চিৎকার করে বলল, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্ট্‌লমেন, দ্য উইনার ইজ জিশা—ন। জিশান পালচৌধুরী।'

সঙ্গে-সঙ্গে গ্যালারিতে চিৎকারের নতুন ঢেউ ফেটে পড়ল। রিমিয়া গর্তের কিনারায় পাগলের মতো নাচতে শুরু করল। গ্যালারির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল প্রতিটি দর্শক এখন শুধু জিশানেরই সাপোর্টার।

লাউডস্পিকারে ব্যান্ডের বাজনা বেজে উঠল। গ্যালারিতে রঙিন বেলুন উড়তে লাগল, পটকা ফাটতে লাগল, হরেকরকম বাজির লাল-নীল-সবুজ আলোর রোশনাই ছড়িয়ে গেল রাতের আকাশে।

টিভিতে জিশানের কৃতিত্বের অডিয়োভিশুয়াল শুরু হয়ে গেল। ধারাভাষ্যকাররা বলতে লাগল, কিল গেম-এর জন্য এরকম হাই পোটেনশিয়াল ফাইটার সত্যিই আগে কখনও আসেনি।

জয়ীর অভিনন্দন কুড়োতে জিশান ওর রক্তাক্ত ডানহাতটা কোনওরকমে একবার ওপরে তুলল। তারপরই বাঁধভাঙা জলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া ক্লান্তির চাপে ও সটান খসে পড়ল মাটিতে।

সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে ইমার্জেন্সি মেডিকেল ইউনিট কাজে নেমে পড়ল। লুকোনো ক্রেন দুটোর ধাতব বাহু এগিয়ে এল গর্তের কেন্দ্রের দিকে। তার দুটো কেবিনে ছ'জন করে মেডিক। দক্ষ পরিচালনায় কেবিন দুটো গর্তের ভেতরে নামতে শুরু করল।

জায়ান্ট স্ক্রিনে একবার জিশানের ক্লোজ-আপ আর একবার জাব্বার ক্লোজ-আপ দেখানো হচ্ছিল। দেখানো হচ্ছিল ওদের পিট ফাইটের নানা অংশের স্লো মোশান ক্লিপিং। তারই মধ্যে ইনসেটে মেডিকদের তৎপরতা আর তদারকির লাইভ টেলিকাস্ট চলছিল।

জিশান অসাড় হয়ে মাটিতে পড়েছিল বটে কিন্তু ও অজ্ঞান হয়ে যায়নি। ওর চোখের পাতা এতটাই ভারি ঠেকছিল যে, শত চেষ্টা করেও ও চোখ খুলতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল দুটো লোহার বাটখারা কেউ ওর চোখের পাতার ওপরে বসিয়ে দিয়েছে। ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু ঘুম আসছিল না। কেমন একটা

তন্দ্রার ঘোরের মধ্যে সাবানজলের রঙিন বুদবুদের মতো ও যেন আলতোভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

ওর কানে নানান আওয়াজ ঢুকছিল। দর্শকদের চিৎকার, পটকার শব্দ, টিভির ধারাবিবরণী...সবই যেন স্বপ্নের মধ্যে শোনা শব্দের মতো ওর কানে আসছিল।

চোখ বুজেই জিশান শানুকে দেখতে পেল। বাচ্চাটা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেক নতুন-নতুন কথা শিখে গেছে। ওর হাসিটা এখন আরও শক্তিশালী চুম্বক হয়ে উঠেছে।

শানু ডাকল জিশানকে। যেন স্পষ্ট গলায় বলল, 'বাপি, চলে এসো।'

'যাই, সোনা। আর একটু—মাত্র একটা গেম। ব্যস, তারপরই আমি ফিরে যাব।'

'ওটা তো কিল গেম, বাপি?'

'হ্যাঁ, বাবা। ওটা কিল গেম। ওটা শেষ করেই আমি তোর কাছে ফিরে যাব...।'

'তাড়াতাড়ি এসো, বাপি। তোমাকে ছেড়ে আর ভালো লাগছে না।'

'আমারও...।'

তন্দ্রার মধ্যেই জিশান কেঁদে ফেলল। কতদিন ওর ছোট্ট সোনাকে ও দেখেনি।

লাউড স্পিকারে তখন মণীশের গলা শুনতে পাচ্ছিল জিশান।

'...এখন জিশান আর জাব্বাকে লেভেল ওয়ান ফিজিক্যাল রিড্রেসাল ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হবে। এক্সট্রিম কেয়ার ট্রিটমেন্ট করা হবে ওদের। সুপার চ্যাম্পিয়ান জিশান সেরে উঠলে ওকে আবার কিল গেম ট্রেনিং-এ ফেলা হবে। পালা করে রেস্ট আর ট্রেনিং দিয়ে দু-মাসের মধ্যে ওকে সুপারফিট করে তোলা হবে। তারপর...।'

জিশান জানে তারপর কী। তারপর ছোট্ট দুটো শব্দ : কিল গেম।

•

স্মার্ট জিমের ন্যানোমিরারের সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রীধর পাত্রা। ন্যানোস্ট্রাকচারের রিফ্লেকটিং পার্টিক্‌ল দিয়ে তৈরি বিশাল আয়নায় নিজেকে দেখছিলেন। আধুনিক প্রযুক্তির এই আয়নায় শ্রীধরের শরীরের প্রতিটি রোমকূপ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আয়নায় যা দেখলেন তাতে খুশি হলেন শ্রীধর।

ফরসা ছিপছিপে শরীর। মেয়েলি ঢঙে কথা বললেও শরীরটা মরদের

মতো। পটল কিংবা কচি শশার মতো ছোট-ছোট পোশ দিয়ে তৈরি। ফরসা পায়ে লোমের কোনও চিহ্ন নেই। জিমে ব্যায়াম শুরু করার আগে মালটিভাইটালাইজার তেল মেখেছেন বলে বুকের চামড়া চকচক করছে। একইসঙ্গে চকচক করছে গলার খাটো চেনটা। অনেকটা ডগ চেনের মতো—প্লাটিনাম আর হিরের 'পুঁতি' দিয়ে তৈরি। শ্রীধরের শরীরের একমাত্র অলঙ্কার।

শ্রীধরের চুল তেল মাখানো—টান-টান করে পিছনদিকে আঁচড়ানো। বটগাছের ঝুরির মতো সেই চুল কাঁধ ছুঁয়ে ঝালর হয়ে ঝুলছে।

ডানহাত তুলে চুলের ঝালরে আঙুল বোলালেন শ্রীধর। মনে-মনে ভাবলেন, চুল নয়—সিংহের কেশর। আর লোমহীন এই শরীরটা সিংহ।

ঠোঁটের লাল টুকটুকে লিপস্টিকের দিকে তাকালেন। ফ্লুওরেসেন্ট রং দিয়ে তৈরি বলে তা থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। কয়েকসেকেন্ডের জন্য ঠোঁট ছুঁচলো করলেন। ঘুরিয়ে দেখে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে গেলেন। সিংহের ঠোঁট। যার আড়ালে রয়েছে ধারালো দাঁত।

শ্রীধরের পায়ে কালো রঙের স্কিন-টাইট পলিস্ট্রাউজার। কোমরে দেড়ইঞ্চি চওড়া মেটাল সেগমেন্টেড বেল্ট। মনে হচ্ছিল, শ্রীধর যেন কোনও কমপিটিশান বা গেমের জন্য তৈরি।

আয়নায় নিজের ছবির দিকে স্থির চোখে তাকালেন। তারপর পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কাল্পনিক শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের মূকাভিনয় শুরু করলেন।

কার সঙ্গে লড়ছেন শ্রীধর? ওঁর তো কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাই সবসময় ওঁর লড়াই নিজের সঙ্গে। শ্রীধর নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। আর সেই চেষ্টা করেন বলেই নিউ সিটিতে শ্রীধর পাট্টাই শেষ কথা।

এই 'শেষ কথা' মানুষটার শুরুটা হয়েছিল ওল্ড সিটির নোংরা আবর্জনাময় ফুটপাথে। ছোটবেলা থেকেই এই লোকটা নিষ্ঠুর হিংস্র পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য লড়ছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরাটা ওর কাছে ছিল রোজকার ব্যাপার। তাতে অবশ্য কোনও অসুবিধে হয়নি কারণ, ওর বাড়ি বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু ছিল না। অন্যান্য বাড়িতে সাধারণত আর যারা থাকে—মানে, মা, বাবা, ভাই, বোন—ছেলেটার সেরকমও কেউ ছিল না.

আসলে জন্ম থেকেই ছেলেটা দেখছে ওর মা-বাবা নেই। ওর চারপাশে সব অচেনা মুখ আর অচেনা মানুষ। ওকে সবাই ডাকত পণ্টন বলে। সেখান থেকে কীভাবে যেন নামটা 'পিন্টু' হয়ে গিয়েছিল। দরমা আর প্লাস্টিক শিটের আড়ালে ছেলেটা 'মানুষ' হচ্ছিল। ফুটবল খেলায় বাইশটা মানুষ মিলে একটা বলকে যেমন লাথি মারে, ঠিক সেইভাবে বাইশ কিংবা চ্যাম্পিয়ন পায়ের লাথি খেতে-খেতে ছেলেটা বড় হচ্ছিল। কখনও এ-বাড়িতে ঠাঁই হয় তো কখনও ও-

বাড়ি। যদিও 'বাড়ি' মানে ছেঁড়া-ফাটা তালিমারা ঝুপড়ি।

ছেলেটার একটাই সম্পদ ছিল : গায়ের রং। ওইরকম টকটকে ফরসা হাতির দাঁতের মতো গায়ের রং ওর সঙ্গী-সাথী আর কারও ছিল না। ওকে সামনে রেখে বড়রা আলোচনা করত, নিশ্চয়ই ও খুব বড় ঘরের ছেলে—বাবা-মায়ের কোল থেকে ছোটবেলায় হারিয়ে গেছে। সেসব শুনে একটা অলীক আকাঙ্ক্ষা ছেলেটার ভেতরে লকলক করে উঠত। ও তখন থেকেই বুঝত 'বড় ঘর' মানে বড়লোক। আর বড়লোক মানে বড় ক্ষমতা। সেই বড় ক্ষমতা হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্য ছেলেটা ভেতরে-ভেতরে নেড়ি কুকুরের মতো জিভ বের করে লোভে হাঁপাত।

পয়সা রোজগার করার জন্য ছেলেটা তখন নিয়মিত চুরি করত, পকেট মারত, আর কখনও-কখনও ভিক্ষে করত। একইসঙ্গে ও বুঝত, এইভাবে চললে এককোটি বছর পরেও ওর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। ততদিনে ওর লোভের জিভ কয়েকশো মাইল লম্বা হয়ে যাবে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হবে না।

অন্য কেউ হলে হয়তো হতাশ হয়ে পড়ত, হাল ছেড়ে দিত। কিন্তু পিলটু অন্য ধাতুতে গড়া। ও প্রতি মুহূর্তে একটা সুযোগ খুঁজছিল। আর লড়াই করে বাঁচছিল।

আয়নার দিকে তাকিয়ে যেন পিলটুকে দেখতে পেলেন শ্রীধর। সেইসঙ্গে ভাগ্যফেরানো সেই দিনটাকেও দেখতে পেলেন। দিনটা ছিল মেঘলা। কিন্তু তারই আড়ালে চোদ্দোবছরের ছেলেটার জীবনে মোড় ঘোরানো একটা সূর্য লুকিয়েছিল।

তখন দুপুর হলেও আকাশে জমে থাকা গাঢ় ছাইরঙের মেঘ দুপুরটাকে সন্ধে করে দিয়েছিল। তারই মধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। একটা মাঝারি রাস্তার ধারে তিনটে প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িগুলোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল পরিত্যক্ত গাড়ির কবরখানা থেকে ওগুলোকে তুলে আনা হয়েছে। রং চটা, তোবড়ানো, বডির নানান জায়গায় চকোলেট কিংবা সাদা রঙের পুডিং ঘষা।

গাড়ি তিনটেয় কোনও লোক ছিল না—ড্রাইভারও না। তাই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে এই তিনটে গাড়িকেই টার্গেট করেছিল পিলটু। ওর ঢোলা প্যান্টের পকেটে লুকোনো ছিল একটা বড় স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা হাতুড়ি। এই দুটো সাধারণ যন্ত্র দিয়েই ও গাড়ির হেডলাইট, টেললাইট, ড্যাশবোর্ডের মিটার, আরও অনেক কিছু খুলে নিতে পারে। গত কয়েক বছরে ও এই কাজটায় বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। পকেট মারার চেয়ে এই কাজটা অনেক নিরাপদ। তাই গাড়ির পার্টস চুরি করে বিক্রি করাটাই পিলটুর আসল পেশা। যখন পার্টস চুরি করার মতো কোনও গাড়ি কপালে জোটে না তখন ও ঝুঁকি নিয়ে পকেট মারার কাজে হাত দেয়। সেখানেও কিছু না জুটলে তখন নিরুপায় হয়ে ভিক্ষা। শেষের কাজটায় গায়ের রংটা ওকে সাহায্য করে। কারণ ওর মতন টকটকে ফরসা ভিখারি ওল্ড

সিটিতে বিলুপ্ত প্রজাতি।

মাঝের গাড়িটার লক ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ড্যাশবোর্ডের নীচে উবু হয়ে বসে চোরাশিকারির মতন কাজ সারছিল। আর মাঝে-মাঝে মাথা উঁচু করে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছিল গাড়ির মালিক হতে পারে এমন কেউ গাড়ির দিকে আসছে কি না।

রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। কখনও-কখনও দু-একটা গাড়ি ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ তুলে ছুটে যাচ্ছে। পিল্টুর গাড়ির চালে বৃষ্টির ফোঁটা একঘেয়ে শব্দ করে নাচানাচি করছে। ও একমনে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ড্যাশবোর্ডটা খুলছিল আর ভাবছিল ড্যাশবোর্ডে লাগানো তিনটে মিটার খুলে বেচে দিতে পারলে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে। সেই টাকায় ও টোস্ট আর কলা মাংস খেতে পারবে। কতদিন যে ও মাংস খায়নি!

জিভে জল এসে গেল। খিদে চাগাড় দিয়ে উঠল।

আর ঠিক তখনই বেপরোয়া গতির কালো গাড়িটা মাতালের মতো এলোমেলো পথে ছুটে এল। চাকা আর ব্রেকের আর্তনাদ তুলে পার্ক করা তিনটে গাড়িকে নেহাতই ভাগ্যের জোরে এড়িয়ে রাস্তার ধারের একটা ল্যাম্পপোস্টে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল। ল্যাম্পপোস্টটা কাত হয়ে গেল। হেলে পড়তে গিয়েও কীভাবে যেন আটকে গেল।

গাড়ির ভেতর থেকে অ্যাক্সিডেন্টের দৃশ্যটা দেখতে পেল পিল্টু।

রাস্তায় লোকজন প্রায় ছিল না। কালো মেঘ আর বৃষ্টি বহু মানুষকেই বাড়িতে বন্দি করে রেখেছে। তা ছাড়া পিল্টু আগেই খেয়াল করেছিল, এ রাস্তায় বেশ কয়েকটা ভাঙাচোরা বাড়ি। চেহারা দেখে মনে হয় বাড়িগুলো সাপখোপ বাদুড় চামচিকের পারমানেন্ট অ্যাড্রেস। সাধারণত এরকম নিরাপদ অঞ্চল দেখেই পিল্টু রাস্তার ধারে পার্ক করা 'নিরাপদ' গাড়ি বেছে নেয়— তারপর কাজে হাত দেয়। সুতরাং অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা পিল্টু ছাড়া আর কেউ খেয়াল করেছে বলে মনে হল না।

ড্যাশবোর্ডের ওপরে চোখ তুলে পিল্টু উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সতর্ক নজরে অ্যাকসিডেন্ট করা গাড়িটাকে দেখছিল।

যেটা ওর সবচেয়ে অবাক লাগল সেটা হল, গাড়িটা ঝাঁ-চকচকে। কালো বডির ওপরে নানান জায়গায় স্টেইনলেস স্টিল। এরকম ফ্যান্ট্যাসটিক মডেলের গাড়ি ছেলেটা আগে কখনও ওল্ড সিটিতে দেখেনি। গাড়িটার সারা শরীর থেকে বিলাসিতা আর অহঙ্কার ফুটে বেরোচ্ছে। গাড়ির ছাদে গোল প্লেটের মতো কী একটা জিনিস খাড়া করে বসানো রয়েছে। প্লেট টিভিতে নিউ সিটির নানান প্রোগ্রাম দেখে পোড় খাওয়া ছেলেটার মনে হল, ওই প্লেটটা বোধহয় ডিশ অ্যানটেনা।

সবমিলিয়ে ছেলেটা সিদ্ধান্ত নিল, এই কালো গাড়িটা নিউ সিটির গাড়ি।

চাকা আর ব্রেকের শব্দ পেয়ে চমকে মাথা তুলে জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল। তারপর অ্যাক্সিডেন্টটা বলতে গেলে ওর চোখের সামনেই ঘটে গেছে। তখনই খেয়াল করেছে, গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই।

তা হলে কি ড্রাইভার মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল? নইলে এভাবে আঁকাবাঁকা পথে ছুটে এসে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মারার কারণ কী?

নতুন ঝকঝকে গাড়িটা এভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করায় ছেলেটার খুব খারাপ লাগল। আবার একইসঙ্গে ওর আনন্দও হল। কারণ, ড্রাইভারটা যদি এই ধাক্কার চোটে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে ওর কপাল খুলে যাবে। এই গাড়িটার কিছু পার্টস ও ঝটপট হাতিয়ে নিতে পারবে। আর ড্রাইভারের পকেটে কিছু মালকড়ি থাকলে তাও চেটেপুটে সাফ করতে পারবে।

হাতের কাজ ফেলে রেখে ছেলেটা গাড়ি থেকে বাইরে বেরোল। তখনই ও দেখল, অ্যাক্সিডেন্ট করা গাড়িটা থেকে নেমে এল সুট-বুট পরা একজন মাঝবয়েসি মানুষ। তার হাতে একটা চওড়া ফোন—বোধহয় স্যাটেলাইট ফোন।

লোকটার কপাল গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। গায়ের ছাই-রঙা সুটে রক্তের দাগ। লোকটা বাঁ-হাতে রুমাল চেপে ধরেছে কপালে, আর পাগলের মতো ফোনের বোতাম টিপে কাউকে ফোন করার চেষ্টা করছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

এমনসময় বিকট গর্জন তুলে একটা হাই-পাওয়ার মোটরবাইক ছুটে এল। বাইকটা ধুলো-কাদা মাখা। তার সামনে-পিছনে অনেকগুলো লাইট লাগানো। বাইকে বসে আছে দুজন লোক। মাথায় কালো হেলমেট, চোখে কালো সানগ্লাস। গায়ে কালো টি-শার্ট, পায়ে ফেডেড জিন্‌স। পিছনে বসে থাকা লোকটার হাতে একটা লম্বা নলওয়ালা পিস্তল।

সুট-বুট পরা লোকটা টলতে-টলতে ছুটে গেল একটা ধসে পড়া বাড়ির দিকে। ততক্ষণে বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে দুজন লোক রাস্তায় নেমে পড়েছে এবং ছুটে পালানো লোকটাকে তাক করে পিস্তলওয়ালা পরপর দুবার ট্রিগার টিপেছে।

'সুঁই—' করে দুবার শব্দ হল। পিন্টু বুঝল পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে।

ছুটে পালানো লোকটার কপাল ভালো—ওর গায়ে গুলি লাগল না। ও কপালে রুমাল চেপে ভাঙাচোরা বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেল। আর বাইকের পাবলিক দুজন সানগ্লাস হেলমেট সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে শিকারকে তাড়া করল।

পিন্টু তখন নিজের মতো করে অঙ্ক কষতে শুরু করল।

যদি ওই পোড়ো বাড়িটার ভেতরে গোলাগুলি চলে তা হলে দু-একটা লাশ পড়ার সম্ভাবনা আছে। তারপর সব গন্ডগোল মিটে গেলে, আততায়ীরা

কেউ লাশ করা যাবে। আর শরীরের আঘাত, আবক্ত, পকেটে যা কিছু

গুলোও হাতিয়ে নেওয়া যাবে।

সুতরাং তিনজন মানুষ বাড়িটায় ঢুকে পড়ার পর ছেলেটাও চোরের ম

টিপে-টিপে ঢুকে পড়ল।

ভেতরটা অন্ধকার। দেওয়ালের ধসে পড়া ফাঁকফোকর দিয়ে যেটুকু দি

লো ঠিকরে আসছে সেটাই একমাত্র আলো। মেঝেতে রাজ্যের ধুলো

বিশ। তারই ওপরে ছড়িয়ে পড়ে আছে লোহার রড, কাঠের টুকরো। সিঁ

র কাছাকাছি একটা বড় মাপের মাকড়সার জালও চোখে পড়ল।

বাড়িটার ভেতরে পুরোনো দুর্গন্ধ। ওরা চারজন ঢুকে পড়ায় যে-শব্দ

য়েছে তাতে লুকিয়ে থাকা বাদুড় আর চামচিকের দল ওড়াওড়ি শুরু ক

রেছে। দেখতে না পেলেও ওদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছি

যে-জায়গাটায় ওরা ঢুকেছে সেটা এককালে বোধহয় ঘর-টর কিছু ছি

খন ঘরের দেওয়ালগুলো প্রায় না থাকায় জায়গাটাকে বড়মাপের গোডাউন

ক্টরির শেড বলে মনে হচ্ছিল।

পিল্টু খুব সাবধানে পা ফেলে অন্ধকারের আড়ালে-আড়ালে এগোচ্ছি

রপর একটা ভাঙা দেওয়ালের পিছনে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ল। এ

দূরে উঁকি মেরে বাকি তিনজনকে খুঁজতে লাগল।

আধো-অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতেই ওদের দেখতে পেল।

কাছাকাছি আর-একটা ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ত

ঢ় মানুষটি। ওর মুখে যে-সামান্য আলোর আভা দেখা যাচ্ছে তাতে পি

ল লোকটা এখনও ফোনের বোতাম টিপে কাউকে ধরার চেষ্টা করছে,

ইসঙ্গে হাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

কিলার দুজন খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে। নিজেদের মধ্যে ইশারা করছে,

পে-টিপে জায়গা বদল করছে, ইট-কাঠ-লোহা কিছু পায়ে ঠেকলেই সেঁ

তাকিয়ে লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাতে যে শব্দ হচ্ছে তা নিয়ে ও

নও মাথাব্যথা নেই।

পিল্টুর চোখের সামনে ইঁদুর-বেড়াল খেলা চলতে লাগল।

হঠাৎই একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোছায়ামাখা পোড়ো ঘরের এখা

খানে একটা হলদে আলোর বৃত্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিলারদের কেউ টর্চ জ্বেলেছে।

দেওয়াল থেকে ঠিকরে আসা আলোর আভায় দুজন কিলারকেই দে

ল পিল্টু।

প্রথমজন পিস্তল উঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলে উঁকিঝুঁকি মেরে শিকা

খুঁজছে। আর দ্বিতীয়জন বাঁ হাতে একটা টর্চ ধরে রয়েছে।

পিলটু নিজেকে অন্ধকার খাঁজে আরও মিশিয়ে দিতে চাইল। ওর একটু-একটু যে ভয় করছিল না তা নয়। ও টের পাচ্ছিল, ওর হাত-পায়ের পেশি দপদপ করছে, কাঁপছে। কিন্তু এখন তো পালিয়ে যাওয়া যাবে না। ওকে দেখামাত্রই ওরা গুলি করবে। কারণ, খুনের সাক্ষী না রাখাটাই দস্তুর।

আচমকা মোবাইল ফোনের সুরেলা রিং টোন শোনা গেল।

একটা ধসে পড়া দেওয়ালের পিছনে আলোর আভা চোখে পড়ল। জ্বলছে-নিভছে। সেই আভায় শূন্যে ভেসে থাকা একটা মুখের আদলও দেখা গেল।

প্রথম লোকটার স্যাটেলাইট ফোন।

লোকটা বোধহয় বোতাম টিপে ফোন কেটে দিল। কারণ, রিং টোনটা হঠাৎ থেমে গেল। আর ফোনের আলোটাও হারিয়ে গেল। হয়তো ফোনের আলো চাপা দিতে ফোনটাকে পোশাকের আড়ালে কোথাও চটপট লুকিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু ততক্ষণে শব্দ এবং আলো লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি ছুটে গেছে। একবার নয়—অন্তত চারবার। চাপা 'সুঁই-সুঁই—' শব্দ হিসেব করে পিলটুর অন্তত তাই মনে হল।

একইসঙ্গে যন্ত্রণার আর্তনাদ শোনা গেল।

শিকারের গায়ে গুলি লেগেছে।

কিলার দুজন নিজেদের মধ্যে আঙুল তুলে ইশারা করল। পিস্তল হাতে লোকটা লম্বা-লম্বা পা ফেলে রাবিশ, লোহা, কাঠ ডিঙিয়ে আহত শিকারের দিকে ছুটে গেল। ভাঙা দেওয়ালের পিছনে গিয়ে শিকারের ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

ঠিক তখনই রিভলভারের গুলির শব্দে গোটা বাড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠল। পরপর দুবার।

সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িটায় যেন হইচই শুরু হয়ে গেল।

অন্ধকারে আস্তানা গেড়ে থাকা চামচিকের ঝাঁক মিহি কিচকিচ শব্দ করে উড়তে শুরু করল। বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। টর্চের আলোয় বেশ কয়েকটা ছটফটে উড়ন্ত শরীর দেখা গেল। একবার যাচ্ছে, একবার আসছে।

দ্বিতীয় কিলারের টর্চের আলো গিয়ে পড়েছিল তার সঙ্গীর ওপরে। সে দেখতে পেল দুটো শরীর জট পাকিয়ে পড়ে আছে। ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে একটা ছোটমাপের রিভলভার বের করে নিল। তারপর এক-পা-এক-পা করে দুটো শিথিল শরীরের দিকে এগোতে লাগল।

পিলটু সবকিছুই লক্ষ করেছে। ওর দমবন্ধ হয়ে আসছিল। বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পড়ছিল। কী এক অজানা ভয়ে ও পকেট থেকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা বের করে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল। তারপর ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎই উড়ন্ত দুটো চামচিকে ওর মুখে এসে ধাক্কা মারল। নিজের অজান্তেই ও হাতের ঝটকা দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে লাফিয়ে উঠল। মুখ দিয়ে ছোট্ট একটুকরো চিৎকারও বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চের আলো নিভে গেছে। দ্বিতীয় খুনিকে ছেলেটা আর দেখতে পাচ্ছিল না। হয়তো ওর চিৎকার শুনে অন্ধকারের ভাঁজে গা-ঢাকা দিয়েছে।

পিলটু এখন কী করবে? এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? টর্চ নিভিয়ে লোকটা গেল কোথায়? কোথায় গেল?

দ্বিতীয় খুনির সঙ্গে পিলটুর দূরত্ব ছিল মাত্র দশ বারো ফুট। সুতরাং পিলটুর চিৎকার ও স্পষ্টই শুনতে পেয়েছে। আর সেইজন্যই আলো নিভিয়ে দিয়েছে। যাতে অন্ধকারে অচেনা শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলাটা বেশ জটিল এবং কঠিন হয়ে ওঠে।

পিলটুর বুকের ভেতরে বিগ ড্রাম বাজাচ্ছিল কেউ। নিশাচর প্রাণীর মতো অন্ধকারে চোখ মেলে ও প্রাণপণে দেখতে চেষ্টা করছিল। বাড়িটার বোটকা দুর্গন্ধ ওর নাকে একেবারে চেপে বসছিল। চঞ্চল চামচিকেগুলো ওদের ওড়াউড়ি এখনও থামায়নি।

বাড়িটার সদরের দিকে নজর দিল পিলটু। সেদিকে তাকালে দরজার হাঁ করা ফ্রেমের মাপে দিনের মেঘলা আলো দেখা যাচ্ছে। পিলটু কি এখন সেদিক লক্ষ্য করে দৌড় দেবে? পকেট বা লকেট হারানোর মতলব এখন মুলতুবি থাক। আগে নিজের প্রাণটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে সুরক্ষিত করা দরকার।

পিলটু খুব সাবধানে উঠে দাঁড়াল। এবারে শুরু হবে ওর বিপজ্জনক মরণছুট। ওয়ান—টু—থ্রি—।

কিন্তু ছুট শুরু হওয়ার আগেই ওর মুখে আচমকা টর্চের আলো এসে পড়ল। টর্চ হাতে দ্বিতীয় খুনি ওর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে। সিগারেট আর মদের গন্ধ পেল পিলটু।

'কে তুই?' জড়ানো গলায় খুনি ওকে জিগ্যেস করল।

সঙ্গে-সঙ্গে পিলটু স্ক্রু-ড্রাইভারটা খুনির পেটে ঢুকিয়ে দিল।

পিলটু কখনও মাখন খায়নি। মাখনের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দিলে ঠিক কীরকম অনুভূতি হয় ও জানে না। কিন্তু তবুও ওর মনে হল ব্যাপারটা যেন অনেকটা সেইরকম।

একইসঙ্গে পিলটু ভয়ার্ত পশুর মতো তীব্র চিৎকার করে উঠেছে এবং লোকটাকে প্রচণ্ড জোরে এক ধাক্কা মেরেছে।

অন্ধকারে ইট-কাঠের ওপরে উলটে পড়েছে খুনি। হাত থেকে টর্চ ছিটকে গেছে। ছোট পিস্তল থেকে 'গুড়ুম' শব্দ করে একটা গুলি ছুটে গেছে ঘরের ভাঙাচোরা সিলিং-এর দিকে।

প্রচণ্ড ভয় থেকে মানুষের মধ্যে একটা কোণঠাসা বেপরোয়া ব্যাপার জেগে ওঠে। চোদ্দোবছরের ছেলেটারও তাই হল। ও হুড়মুড় করে পৌঁছে গেল মেঝেতে পড়ে থাকা টর্চটার কাছে। ওটা তুলে নিয়ে হাতুড়ির মতো বসিয়ে দিল খুনির মাথায়। [illegible] ঝটকায় টর্চ নিতে গেল।

[illegible]হিতার পেটে বেঁধা অবস্থাতেই লোকটা উঠে বসার চেষ্টা করছিল. কিন্তু টর্চের দ্বিতীয় আঘাত ওকে আবার মাটিতে পেড়ে ফেলল। একটা চাপা গোঙানি বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে।

পিল্টু বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছিল। ওর এবার মনে হল পালানো দরকার। কারণ, এতবার গুলির শব্দ হয়েছে, চিৎকার-চেঁচামেচি হয়েছে যে, লোকজন এসে পড়তে পারে। বরং একটু পরে ও ঘুরেফিরে এখানে আবার আসবে। তখনও যদি বড়িগুলো বেওয়ারিশভাবে পড়ে থাকে তা হলে চটপট ওর কাজ সেরে নেবে।

হাতের চর্চটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে পা বাড়াল। পনেরো-কুড়ি ফুট দূরেই হাঁ-করা সদর দরজা। সেই ফাঁক দিয়ে আলো আর বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে।

মেঝেতে পড়ে থাকা ইট-পাথর আর কাঠ ডিঙিয়ে ছেলেটা চার-ছ'পা এগোতেই মোবাইল ফোনের সুরেলা বাজনা শোনা গেল।

বাজনার সুরটা ছেলেটার চেনা। প্রথম লোকটার স্যাটেলাইট ফোন।

পিছন ফিরে তাকাল। দূরে অন্ধকারে রঙিন আলো জ্বলছে-নিভছে। কেউ ফোন করেছে লোকটাকে।

বিদ্যুৎঝলকের মতো একটা লোভ ঝলসে উঠল মাথায়। পরে যখন কাজ সারতে আসবে, আসবে। এখন স্যাটেলাইট ফোনটা নিয়ে চম্পট দিলে কেমন হয়?

লোভ আর আশঙ্কার লড়াইয়ে লোভ জিতে গেল।

পিল্টু ঘুরে দাঁড়াল। পায়ে-পায়ে ফিরে চলল স্যাটেলাইট ফোনটার দিকে।

যখন ও ফোনের খুব কাছে পৌঁছে গেল তখনও ফোনটা বাজছিল। ফোনের আলোয় দেখল দুটো কাহিল শরীর এখনও জট পাকিয়ে পড়ে আছে। তারই একটার হাতের মুঠোয় ফোনটা ধরা।

ঝুঁকে পড়ে ফোনটার দিকে হাত বাড়াতে যাবে অমনি বোতাম টিপে কলটা রিসিভ করল কেউ। গোঙানির স্বরে কেউ 'হ্যালো! হ্যালো!' বলতে লাগল।

আবছা আঁধারে দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত লাগছিল। জটপাকানো শরীর দুটোর দিকে তাকিয়ে পিল্টু 'হ্যালো' বলা মুখটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। অথচ জটের বাইরে বেরিয়ে থাকা একটা হাত কলটা রিসিভ করেছে।

ফোন থেকেও যে কেউ 'হ্যালো! হ্যালো!' বলছে সেটাও ক্ষীণভাবে পিল্টুর কানে আসছিল। ও কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

কয়েকসেকেন্ডের দ্বিধা কাটিয়ে ও ফোনটা দুর্বল হাতের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিল।

ওর মুখে ফোনের রঙিন আলো পড়ায় ফোনের আহত মালিক বোধহয় ওকে দেখতে পেল।

ভাঙাচোরা কাতর গলায় অন্ধকার মেঝের দিক থেকে কেউ বলে উঠল, 'খোকা, আমাকে বাঁচাও...।'

লোকটা এখনও বেঁচে আছে!

পিল্টু অবাক হল। কলটা কেটে দেওয়ার জন্য ও আন্দাজে ফোনের নানান বোতাম টিপতে লাগল। ফোনের 'হ্যালো! হ্যালো!'টা হঠাৎই থেমে গেল।

ফোনটা এবার কণ্ঠস্বরের দিকে ফেরাল পিল্টু। দেখল, গাড়ি থেকে নেমে আসা সেই সুট পরা মানুষটা। ওর কপাল মুখ সব রক্তে মাখামাখি। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। ওর বুকের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কালো টি-শার্ট পরা একটা দেহ। সেইজন্যই সুট পরা মানুষটা ফোনটা মুখের কাছে নিয়ে 'হ্যালো' বলতে পারছিল না।

'আমাকে বাঁচাও। তুমি...তুমি যা চাও তাই দেব...তাই দেব।' কাতর অনুনয়ের সুরে প্রৌঢ় বলল।

পিল্টু কী করবে ভেবে না পেয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার...নাম কী?'

কয়েকসেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'পিল্টু...।'

'পিল্টু, প্লিজ...আমাকে...আমাকে বাঁচাও। আমি নিউ সিটির পিস ফোর্সের...মার্শাল। ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্টের মার্শাল... বলধর পাট্রা। বলধর পাট্রা। আ-আমাকে বাঁচাও। আমার...আমার...গায়ে গুলি লেগেছে। অনেকগুলো। আমাকে...বাঁচাও। প্লিজ। এখানে ফেলে...যেয়ো না। তুমি যা চাও...সব দেব। প্লিজ...।' যন্ত্রণায় মোচড় খাওয়া কথাগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে মানুষটা প্রবল হাঁপাচ্ছিল। ফোনের আবছা আলোয় ওর চোখদুটো মরা মানুষের চোখের মতো লাগছিল।

কিন্তু এ কী শুনছে ছেলেটা!

বলধর পাট্রা! পিস ফোর্সের মার্শাল! চিফ! নিউ সিটিতে বলতে গেলে যার কথাই শেষ কথা! যার নামে বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে! শিরদাঁড়া দিয়ে বরফের স্রোত নেমে যায়। গলা শুকিয়ে যায়! যার ধমকে অনেকেই প্যান্ট ভিজিয়ে ফ্যালে!

রাস্তায়-রাস্তায় বসানো অসংখ্য প্লেট টিভির দৌলতে বলধর পাট্রার কুখ্যাতির কথা পিল্টুর অজানা ছিল না। ওল্ড সিটিতে সবাই বলে, বলধরের ডাকনাম হল 'শয়তান'। বলধর হিংস্রতায় এম. এ., পিএইচ. ডি. আর নিষ্ঠুরতায়

ডি. এসসি.।

সেই 'সাক্ষাৎ যম' অমানুষটা কাতর অসহায়ভাবে পড়ে আছে ছেলেটার পায়ের কাছে। বৃদ্ধ ভিখিরির মতো প্রাণভিক্ষা চাইছে এই কিশোরের কাছে! বলছে, 'তুমি যা চাও, তাই দেব...।'

পিল্টুর শরীরে রোমাঞ্চ খেলে গেল। ও পলকে সিদ্ধান্ত নিল। ফোনটা পকেটে রাখল। তারপর ঝুঁকে পড়ে কালো টি শার্ট পরা বডিটাকে টেনে সরাতে লাগল।

কয়েকবারের চেষ্টাতেই বডিটা বলধরের শরীরের ওপর থেকে নামিয়ে দিল পিল্টু। ওর দু-বগলে হাত ঢুকিয়ে টেনে ওকে সোজা করল। তারপর পিঠটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে কোনওরকমে বসাল।

বলধর যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল। 'আঃ! লাগছে...আস্তে...' এসব বলছিল।

পিল্টুর হাত চটচটে কীসে যেন ভিজে গেল। আঁশটে গন্ধ নাকে এল।

'ফোনটা...ফোনটা...আমাকে দাও...।'

বলধরের মিনমিনে দুর্বল স্বর যেন বহুদূর থেকে পিল্টুর কানে ভেসে এল।

ও কোনও কথা না বলে স্যাটেলাইট ফোনটা পকেট থেকে বের করে বলধরের ডানহাতে ধরিয়ে দিল।

কাঁপা আঙুলে ফোনের বোতাম টিপল বলধর। তারপর ফোনটা কানে চেপে ধরল।

মেঘ বোধহয় কিছুটা পরিষ্কার হয়েছিল। কারণ, হঠাৎই পিল্টু খেয়াল করল, দিনের আলো খানিকটা বেড়ে গেছে। চামচিকে কিংবা বাদুড়ের ওড়াউড়ির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। শব্দ বলতে শুধু বলধর আর পিল্টুর শ্বাস -প্রশ্বাসের শব্দ।

ও-প্রান্তে ফোনটা কেউ ধরতেই বলধর ক্লান্ত গলায় বলল, 'মার্শাল পাট্রা। পিস ফোর্স। এস. ও. এস। জলদি এসো। ইমার্জেন্সি —লেভেল থ্রি। জি. পি. এস. কো-অর্ডিনেট সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি বাই ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান। ওল্ড সিটি, ব্লক নাইন। ইমার্জেন্সি—লেভেল থ্রি। এস. ও. এস.। কাম রাইট নাউ। এখানে...আমি আর পিল্টু আছি। পিল্টু...ওল্ড সিটির ইয়াং বয়। কাম। মেক...ইট...কুইক। সেভ মি। সেভ মি...।'

স্রেফ ইচ্ছাশক্তির জোরে ফোনে একটানা কথা বলছিল বলধর। তারপর হঠাৎই চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো ওর কথা থেমে গেল। হাত থেকে ফোনটা খসে পড়ল। শরীরটা প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি কাত হয়ে গেল মেঝের দিকে।

পিল্টু তাড়াতাড়ি বসে পড়ল ওর হেলে পড়া শরীরের কাছে। ওকে আরও হেলিয়ে দিয়ে ওর রক্তাক্ত মাথাটা প্রায় কোলে নিয়ে নিল। বেশ বুঝতে পারল

ওর জামা-প্যান্টে রক্ত মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হোক। মার্শালের মাথা কোলে নিতে পারে ক'জন? মার্শাল ওকে বলেছে, ও যা চায় সব দেবে। সব।

বলধরের মাথা কোলে নিয়ে সেই 'সব'-এর আশায় বসে রইল পিল্টু। ওল্ড সিটিতে অনেক হয়েছে। এবার নিউ সিটির স্বপ্নকে ছুঁতে চায় ও।

পিল্টু বলধরকে ডাকল, 'স্যার। স্যার!'

কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

বলধরকে নাড়া দিল পিল্টু। তাতে বলধরের শরীরটা যেভাবে নড়ল পিল্টু আন্দাজ করল মার্শাল বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

এমনসময় মেঝেতে পড়ে থাকা ফোনটা আবার বাজতে শুরু করল।

ফোনটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ছেলেটা। কে ফোন করছে মার্শালকে?

ফোনটা তুলে নিল। আন্দাজ করে কল রিসিভ করার বোতামটা টিপল। তারপর ফোনে 'হ্যালো' বলল।

ওপাশ থেকে একটা ভারি গলা শোনা গেল : 'কে, পিল্টু?'

থতমত খেয়ে ছেলেটা বলল, 'হ্যাঁ—।'

'স্যার তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ।' কথা বলতে গিয়ে পিল্টুর গলা কেঁপে গেল। ও বুঝতে পারল পিস ফোর্সের কেউ ওর সঙ্গে কথা বলছে।

'তোমার কোনও ভয় নেই। আমাদের অ্যাকশান ফোর্স এক্ষুনি ওখানে পৌঁছে যাচ্ছে। ডোন্ট উয়ারি, ব্রেভ বয়। ওভার অ্যান্ড আউট।'

ফোন কেটে গেল। সব কথার মানে স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও ছেলেটা বুঝল পিস ফোর্স সামরিক পরিস্থিতির ঢঙে কাজে নেমে পড়েছে।

হলও ঠিক তাই। পিস ফোর্স সেই জরাজীর্ণ বাড়িটায় পৌঁছে গেল দশমিনিটের মধ্যেই।

আকাশ থেকে নীল-সাদা চারটে ওটার রাস্তায় নেমে এল। একইসঙ্গে কালো রঙের চারটে গাড়ি শব্দ করে ছুটে এসে তীব্রভাবে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল বৃষ্টিভেজা রাস্তায়। ডিশ অ্যানটেনা লাগানো একটা সাদা ভ্যান তার পাশাপাশি এসে থামল। তার গায়ে লেখা 'ইমার্জেন্সি মেডিকেল ইউনিট'। সেই ভ্যানের দরজা খুলে ছ'জন মেডিক নেমে পড়ল রাস্তায়। তাদের হাতে অক্সিজেন মাস্ক, ফাইবারের স্ট্রেচার আর 'এস. ও. এস.' মেডিকেল কিট। ওরা ব্যস্তভাবে ছুটে গেল ভাঙা বাড়িটার দিকে। কেউ একজন চিৎকার করে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছিল।

তারপরই অনেকগুলো হ্যালোজেন টর্চের আলোয় পিল্টুদের 'যুদ্ধক্ষেত্র'টা ভেসে গেল। মেঝেতে, দেওয়ালে, সিলিং-এ সেই উজ্জ্বল সাদা আলো অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় চলে বেড়াতে লাগল। ভারি বুটের শব্দে বাদুড় চামচিকেরা আবার

সচকিত হয়ে উঠল। উড়ে বেড়াতে লাগল।

আলোর কাটাকুটি খেলার আড়াল থেকে কেউ একজন ডাকল : 'পিল্টু—।'

'এই যে আমি এখানে।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সবক'টা দেহ আর মৃতদেহ পিস ফোর্সের দখলে চলে গেল।

এরপর যা হল তা পিল্টু স্বপ্নেও কখনও ভাবেনি।

শুটারে চড়ে ও আকাশপথে উড়ে চলল নিউ সিটির দিকে। নীচে, বহু নীচে, দেখা যাচ্ছে ওল্ড সিটির জরাজীর্ণ রুগ্ন চেহারা। একটা পুরোনো ঘা-এর মতো ছড়িয়ে রয়েছে শহরটা। আয়ু ফুরিয়ে আসা, বিছানায় মিশে থাকা, একটা রুগির মতো ধুকপুক করছে শহরটার হৃৎপিণ্ড। শ্রান্ত-ক্লান্ত শহরটা হাঁপাচ্ছে।

এই শহরে যদি আর ফিরতে না হয় তা হলে দারুণ হবে। সেই আশায় মনে-মনে প্রার্থনা করতে লাগল পিল্টু। আর একইসঙ্গে চাপা উত্তেজনায় ওর বুকের ভেতরটা ধকধক করতে লাগল। ছলনাময়ী ভাগ্যশ্রী এখন ওর জন্য কী উপহার সাজিয়ে রেখেছে কে জানে।

শিসের শব্দ তুলে নীল সাদা রঙের শুটার আকাশপথে ছুটছিল। ছেলেটার পাশে একজন পিস ফোর্সের লোক। ঝকঝকে পোশাক দেখে মনে হয় ফোর্সের কেউকেটা একজন হবেন। আর সামনের সিটে দুজন—তার মধ্যে একজন শুটারের পাইলট।

শুটারটা স্বচ্ছ ডোমে ঢাকা। ভেতরটা এয়ারকন্ডিশনড। সিটে বসে নিউ সিটির মিনিয়েচার ছবি দেখতে পাচ্ছিল ছেলেটা। ঠিক যেন আর্কিটেক্টের তৈরি একটা ঝিনচাক শহরের মডেল। মডেল তো নয়—স্বপ্ন। যেন সেই জীবন্ত স্বপ্নকে কেউ পরম যত্নে মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছে।

সেই স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ছেলেটা বিলাসিতার কল্পনা করছিল। আর ওর চোখের সামনে স্বপ্নটা খুব ধীরে-ধীরে বড় হচ্ছিল, সাকার হচ্ছিল। কারণ শুটার নামতে শুরু করেছিল।

স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ক্লান্তিতে ছেলেটা কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ল্যান্ডিং জোনে শুটার ল্যান্ড করতেই ছেলেটার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর পিস ফোর্সের লোকজন ওকে নিয়ে যা শুরু করল তাতে ছেলেটার মনে হল ও কোনও দেশের রাষ্ট্রপতি—অতিথি হয়ে নিউ সিটিতে এসেছে। এখানকার কর্মকর্তারা ওকে কোলে বসাবেন না মাথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছেন না।

পিস ফোর্সের লোকজন আর কর্মকর্তাদের কথাবার্তা শুনে ছেলেটা বুঝতে পারল, ওকে টপমোস্ট সিকিওরিটি জোনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে একটা

গোল্ডেন পেন্টহাউসে টপমোস্ট কমফোর্ট লেভেলে ওকে রাখা হবে। পিস ফোর্সের ছ'জন স্টাফ চব্বিশঘণ্টা ওর তদারকিতে থাকবে।

ছেলেটার মনে হল, স্বপ্ন যখন সত্যি হয় বোধহয় এরকম হঠাৎ করেই হয়। আর সেইজন্যই ও ব্যাপারটাকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না।

ঝকঝকে নতুন জামাকাপড় পরে পেন্টহাউসের বেডরুমে বিছানায় বসে ছিল ছেলেটা। ঘিয়ে রঙের সিল্কের চাদরে ঢাকা নরম বিছানা। তার ওপরে ধীরে-ধীরে হাত বুলিয়ে ও বুঝতে চাইছিল ব্যাপারটা স্বপ্ন, না বাস্তব।

বাস্তব হয়ে ওঠা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ছেলেটার দিন কাটতে লাগল। আর তারই মধ্যে চলতে লাগল জিজ্ঞাসাবাদ।

পিস ফোর্সের নানান স্তরের লোকজন ওর ঘরে আসতে লাগল। তারা পালা করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ওকে প্রশ্ন করতে লাগল। সেদিন দুপুরে বলহর পট্টিকে দেখা থেকে শুরু করে পিস ফোর্সের অফিসাররা অকুস্থলে এসে পৌঁছনো পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ওকে বারবার বলতে হচ্ছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, পিল্টুর কথা শুনে-শুনে ওরা ওর স্টেটমেন্টের রিয়েল টাইম ভিডিয়ো সিমুলেশান তৈরি করছিল। ওর ঘরের মধ্যে কমপিউটার এবং আরও কীসব যন্ত্রপাতি এনে তিনজন লোক সিমুলেশানের কাজে ব্যস্ত ছিল। আর দুজন অফিসার পিল্টুকে একের পর এক প্রশ্ন করছিল।

পিল্টুর উত্তর শুনে-শুনে ওরা সিমুলেশান তৈরি করছিল, কারেকশান করছিল, পিল্টুকে বারবার ওটা দেখাচ্ছিল। এইভাবে চারদিন কেটে যাওয়ার পর অডিয়ো-ভিশুয়াল সিমুলেশনটা ঠিকঠাক তৈরি হয়েছে বলে ওদের মনে হল।

পিল্টু যখন ফাইনাল সিমুলেশানটা দেখল তখন ও অবাক হয়ে গেল। সেইদিনকার ঘটনাগুলো নিয়ে কেউ যেন একটা সিনেমা তৈরি করেছে।

সেই সিনেমা শুরু হল। কমপিউটারের পরদার এককোণে সময় দেখা যাচ্ছে। ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে-সঙ্গে একসেকেন্ড-একসেকেন্ড করে সময় পালটে যাচ্ছে। পরদায় ঘটনা শুরু হল। ঝাঁ চকচকে কালো গাড়িটা মাতালের মতো ছুটে এসে রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল।

সিনেমাটা দেখে অবাক হয়ে গেল পিল্টু। কোথাও কোনও ভুল নেই। ও যেমন-যেমন স্টেটমেন্ট দিয়েছে, নানান প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা বলেছে, ঠিক সেই-সেই ঘটনাগুলোর চলমান ছবি এঁকে ওরা ওর চোখের সামনে সাজিয়ে নিয়েছে।

একটা আশ্চর্য ভিডিয়ো গেম দেখছিল পিল্টু। মানুষগুলো একটু পুতুলের মতো লাগছিল ঠিকই, তবে বাকি সবকিছু যেন আসলের মতো। গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ, মোটরবাইকের শব্দ, গুলির আওয়াজ—এমনকী বাদুড় আর চামচিকের ডানা ঝাপটানোর শব্দটাও ওরা আসলের মতো তৈরি করে ঠিকমতো জুড়ে

দিয়েছে।

পিল্টুকে নিয়ে এসব যখন চলছিল তখন বলধর পাট্টা নিউ সিটির এক্সট্রিম মেডিকেল কেয়ার ইউনিটে সেরে উঠেছিল। তার সেরে ওঠার খবর পিস ফোর্সের অফিসারদের কাছেই শুনছিল পিল্টু। বলধরের গায়ে চারটে গুলি লেগেছে, কিন্তু এখন সে বিপদের আওতার বাইরে। চিফ মেডিক অন্তত তাই বলেছেন।

পিস ফোর্সের অফিসাররা বলধরের স্টেটমেন্টও নিয়েছেন। সেই স্টেটমেন্ট পিল্টুর স্টেটমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে তবেই ফাইনাল ভিডিয়ো সিমুলেশানটা তৈরি করা হয়েছে। সেটা দেখে বলধর অ্যাপ্রুভ করেছে। সুতরাং এই ফাইনাল সিমুলেশনটাই এভিডেন্স আরকাইভে রাখা হবে।

মার্শাল বলধর পিল্টুর সাহসের খুব প্রশংসা করেছে। বলেছে, 'ও আমার স্পেশাল গেস্ট। ওর আদর যত্নে যেন কোনও ফাঁক না থাকে।'

না, কোনও ফাঁক নেই। কিন্তু সে তো মাত্র ক'দিন। তারপর, বলধরের এই রোমাঞ্চকর মামলার আঁচ মিটে গেলে, পিল্টুকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেওয়া হবে ওল্ড সিটিতে—ওর আগের জায়গায়, ছেঁড়া-ফাটা পলিথিনে ছাওয়া ঝুপড়ির নীচে। তখন একদিনের জন্য সত্যি হওয়া স্বপ্নটা আবার শুধু স্বপ্ন হয়ে যাবে। আবার ওকে ভিক্ষে করতে হবে, পকেট মারতে হবে, গাড়ির পার্টস চুরি করে বিক্রি করতে হবে।

স্ক্রু-ড্রাইভারটার কথা মনে পড়ল পিল্টুর। পিস ফোর্সের অফিসাররা ওটা ওকে আর ফেরত দেননি। বলেছেন, ওটা নাকি ওঁদের এভিডেন্স আরকাইভে রেখে দেওয়া হবে। সুতরাং, হাতুড়িটা সঙ্গে থাকলেও পিল্টুকে নতুন একটা স্ক্রু-ড্রাইভার কিনতে হবে। গাড়ির 'কাজ' শুরু করতে গেলে ওটা কেনা দরকার।

গোল্ডেন পেন্টহাউসে বসে পিল্টু যখন এসব কথা ভাবছে তখনই ও খবর পেল, বলধর পাট্টা পুরোপুরি সেরে উঠে ওর বাড়িতে ফিরে গেছে। এর সঙ্গে আরও যে-খবরটা ওকে দেওয়া হল সেটা শুনে ওর বুকের ধুকপুকুনি আচমকা বেড়ে গেল। হাতুড়ি পেটার শব্দ হতে লাগল বুকের ভেতরে।

বলধর পাট্টা ওকে ডেকে পাঠিয়েছে নিজের বাড়িতে।

আস্তানা বদলে গেল ছেলেটার।

এক একর সবুজ জমির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা আধুনিক বিমূর্ত ছাঁদে তৈরি একটা তিনতলা ছোট বাড়ি। তাকে ঘিরে পার্ক, দিঘি, গাছপালা—আরও কত কী! এই বাড়িতে থাকে একজনমাত্র মানুষ। তাকে ঘিরে হুকুম তামিল করার জন্য আছে আরও বারোজন পুরুষ।

বলধর পাট্টা আর একডজন পুরুষ। পিল্টু সেখানে গিয়ে মোট পুরুষের সংখ্যা চোদ্দোয় নিয়ে গেল।

আভিজাত্য আর অহঙ্কারে সাজানো একটা বিশাল মাপের ড্রইংরুমে

বলধরের মুখোমুখি হল ছেলেটা। বলধরকে ভালো করে দেখল।

মেরুন রঙের ড্রেসিং গাউন পরা প্রৌঢ় কাঠামোটা টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে। মাথার সামনের দিকে শতকরা প্রায় চল্লিশভাগ টাক পড়ে গেছে। বাকিটা কাঁচা-পাকা পাতলা চুলে ঢাকা। চোয়াল চওড়া। দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার মুখে বয়েসের ভাঁজ। তবে সেইসঙ্গে রুক্ষতার ছাপও আছে। ঠোঁটজোড়া বড় বেশিরকম লালচে। ড্রেসিং গাউনের হাতার বাইরে বেরিয়ে থাকা হাতের শিরা ফুলে আছে। হাতের আঙুলগুলো যে শক্তিশালী সেটা চওড়া গাঁট আর খসখসে চামড়া থেকে আঁচ করা যায়।

পিল্টু অবাক চোখে বসবার ঘরের জাঁকজমক দেখছিল। সেইসঙ্গে বিস্ময়ভরা চোখে বলধরকে দেখছিল। অগাধ ক্ষমতা এই মানুষটার। ক্ষমতার সাগরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা এক লাইটহাউস। সেই লাইটহাউসের চূড়া থেকে ক্ষমতার অবিরাম বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

ভারি গলায় বলধর বলল, 'পিল্টু—তাই তো নাম তোমার?'

বোবা পিল্টু মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

'পিলটু, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।' বলধর ধীরে-ধীরে বলল, 'তা ছাড়া তোমার সাহসও কম নয়। কারণ, সেইদিনকার ঘটনার ভিডিয়ো সিমুলেশানটা আমি দেখেছি। য়ু আর রিয়েলি ব্রেভ, পিল্টু। আই অ্যাম রিয়েলি প্রাউড অফ য়ু।'

শেষের ইংরেজি কথাগুলোর অর্থ ছেলেটা কিছুই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তবুও ও আন্দাজ করতে পারল যে, কথাগুলো প্রশংসার।

একটু থেমে বলধর পাট্টা আবার বলল, 'তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ, পিল্টু। ওই বিপদের সময় আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি যা চাও সব দেব। আজ সে-কথা আমি ভুলে যাইনি। বলধর পাট্টা একবার যা বলে তার কখনও নড়চড় হয় না।' একটু থামল, পিল্টুর কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ল : 'বলো, তুমি কী চাও। কোনওরকম সঙ্কোচ বা লজ্জা করবে না। বলো...।'

কয়েকমুহূর্ত বলধরের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেটা। ওর গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশে তাকিয়ে ও ঘরের দেওয়ালের কারুকাজ দেখছিল, বিচিত্র আলোকসজ্জা দেখছিল, বাতাসে নাক টেনে কেমন একটা গন্ধ টের পাচ্ছিল। আর বিস্ময়ে স্থবির হয়ে ভাবছিল, এটা পৃথিবী, না স্বর্গ?

'বলো, বলো—লজ্জা কোরো না।'

'আমি স্যার আপনার কাছে থাকতে চাই।'

তুবড়ির আগুনের ফুলকির মতো মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাগুলো। কথাগুলো বেরিয়ে যাওয়ার পরই পিল্টু ভয় পেল। বলধর রাগ করবে না তো! এক্ষুনি পিল্টুকে গলা ধাক্কা দিয়ে ওর নরকে পাঠিয়ে দেবে না তো।

কিন্তু বলধর রাগ করল না—বরং হাসল।

'তোমার বাড়িতে আর কে-কে আছে?'

'কেউ নেই।'

'কেউ নেই?' বলধর পাত্রের ভুরু কুঁচকে গেল।

'কেউ নেই। মা, বাবা, ভাই বোন--কেউ নেই।' সাহসী স্পষ্ট গলায় বলল ছেলেটা।

বলধর সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাথা পিছনে হেলিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। বিশাল ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে সেই হাসির প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

হাসির দমক থামলে চোখের কোণ থেকে জল মুছে নিল বলধর। বড়-বড় চোখে পিলটুর দিকে তাকিয়ে মজার সুরে বলল, 'আমারও কেউ নেই। মা, বাবা, ভাই-বোন—কেউ নেই।'

পিলটু আর কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। তাই চুপ করে রইল।

ওকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল বলধর। তারপর খুব ধীরে-ধীরে ওপর-নীচে মাথা নাড়ল।

ছেলেটার সাহস আছে। একটা স্ক্রু-ড্রাইভার কেমন অনায়াসে ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা জোয়ানের তলপেটে। যেখানে বলধরের কপালে নিশ্চিত মৃত্যু লেখা ছিল সেখানে এই ছেলেটা সেই কপাল-লিখন মুছে বলধরকে নতুন জীবন দিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংস খেলার সুযোগ করে দিয়েছে।

নাঃ, কোনও সন্দেহ নেই, ছেলেটা একটা তেজিয়ান কুঁড়ি। ওর গায়ে হয়তো রুক্ষ অভাবী জীবনের ধুলো-ঝড়-বৃষ্টির নোংরা মলিন প্রলেপ পড়েছে, কিন্তু কুঁড়িটাকে চেনা যাচ্ছে। অন্তত বলধর চিনতে পারছে। এর ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে আগামীদিনের ক্ষমতার ফুলের পাপড়ি। ছেলেটা বাচ্চা হলেও সিংহের বাচ্চা।

ঠোঁটের কোনা কামড়ে বলধর ভাবছিল। ক্ষমতার যে-শীর্ষে বসে সে ক্ষমতার সতেজ তরঙ্গ প্রতিমুহূর্তে বিকিরণ করে চলেছে সেই শীর্ষাসন সে কাকে দিয়ে যাবে? এ-কথা ভেবে-ভেবে কয়েকবছর ধরে রাতে ঘুমোতে পারে না বলধর। তার চারপাশে যারা আছে তাদের মধ্যেও সে খুঁজেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখেছে বারবার। কিন্তু সমাধান মেলেনি। যোগ্য কোনও উত্তরাধিকারীকে খুঁজে পায়নি বলধর। এদিকে ওল্ড সিটির গোপন ঘাতকদল বহুদিন ধরেই তাকে খুন করার জন্য ছক কষছে, সুযোগ খুঁজছে। দ্বিমুখী এই চিন্তার চাপ এতদিন বলধরের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

বোধহয় আজকের দিনটার জন্যই। সমাধানের এই মুহূর্তটার জন্য। গোপন ঘাতকরা ওকে গুলি করেছিল বলেই আগামীদিনের বলধর পাত্রকে খুঁজে পেয়েছে বলধর। এই কুঁড়িটাকে অত্যন্ত যত্নে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

পিল্টুর চিবুকে আঙুল ছোঁয়াল। হেসে বলল, 'তুমি আমার কাছে থাকবে। আমি তোমাকে নতুন নাম দেব। নতুন জীবন দেব। লেখাপড়া শেখাব। পিস্তল চালানো শেখাব। তোমাকে চ্যাম্পিয়ান তৈরি করব। লোকে জানবে তুমি আমার বহুবছর আগে হারিয়ে যাওয়া ভাই। হঠাৎ করে ওল্ড সিটিতে তোমাকে আমি খুঁজে পেয়েছি। বুঝেছ?'

ছেলেটা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও বলধরকে জড়িয়ে ধরল, আবেগে কেঁদে ফেলল। আর তারই মধ্যে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'স্যার, স্যার...। আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না, স্যার...।'

'স্যার নয়—দাদা, দাদা—।' ছেলেটার মাথায় আদরের হাত বোলাতে-বোলাতে বলধর বলল, 'পিল্টু নামটা ভুলে যাও। এখন থেকে তোমার নাম শ্রীধর—শ্রীধর পাট্টা।'

শ্রীধর...শ্রীধর পাট্টা। নতুন নামটা ছেলেটা নিঃশব্দে উচ্চারণ করতে লাগল বারবার।

সেই মুহূর্তে পিস কোর্সের আগামীদিনের মার্শালের জন্ম হয়েছিল। নতুন এক বলধর পাট্টার জীবনরেখা শুরু হল।

জন্মদিনটা আজও মনে আছে শ্রীধরের। ১৯ মে, বুধবার, ২৩৩২ সাল। এক সিংহের আস্তানায় নতুন এক সিংহের জন্ম হয়েছিল।

আজ, এখন, এই সিংহটা প্যানোমিরারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পল্টনের কথা ভাবছে। আর ভাবতে গিয়ে বারবার মনে হয়, ওটা যেন কোনও প্রাচীন যুগের এক আবছায়া স্বপ্ন। অথবা বড়জোর মনে-মনে কোনও কাল্পনিক কমপিউটারের মনিটরে কোনও আজব সিমুলেশান দেখছেন।

শ্রীধরকে গড়ে তোলার ব্যাপারে বলধর কোনওরকম কামতি রাখেনি। ওকে দিয়ে জিমে ব্যায়াম করিয়েছে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়েছে। শিখিয়েছে রাজনৈতিক কূটকৌশল—তার সঙ্গে হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা।

হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতায় বলধর যদি ছিল পিএইচ. ডি. আর ডি. এসসি., তা হলে শ্রীধর একেবারে নোবেল লরিয়েট।

বলধরকে 'দাদা' ডেকে বড় হতে লাগলেন শ্রীধর। আর সেইসঙ্গে 'দাদাগিরি'-তেও প্রশিক্ষণ নিতে লাগলেন। মানুষের শরীরকে কতরকমভাবে যন্ত্রণা দেওয়া যায় আজ শ্রীধর তা জানেন। তিনি জানেন কীভাবে ভয়কে ব্যবহার করতে হয়। জানেন আরও বহু গোপন কৌশল।

লড়াইয়ের শ্যাডো প্র্যাকটিস শেষ করলেন। এয়ারকন্ডিশনড জিম হওয়া সত্ত্বেও শ্রীধরের শরীরে ঘামের একটা পাতলা স্তর তৈরি হয়েছিল। একটু দূরে দেওয়ালে রুপোর তৈরি একটা ডিজাইনার হ্যাঙার লাগানো ছিল। তাতে ঝুলছে খরগোশের লোমের মতো মোলায়েম একটা ঘিয়ে রঙের টাওয়েল। সেই

টাওয়েলটা তুলে নিয়ে শরীর মুছলেন শ্রীধর। আয়নায় নিজেকে বারবার দেখলেন। প্রতিবিম্বের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রায় ভুলে-যাওয়া নামটা কয়েকবার আলতো করে ডেকে উঠলেন : 'পিল্টু! পিল্টু!...পল্টন,...।'

নিজের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কুড়িটা বছর বড় দীর্ঘ সময়। সেদিনের ছেলেবেলার কিশোর আজ চৌতিরিশ বছরের পোড়খাওয়া এক কুখ্যাত মার্শাল। নিউ সিটির লোকজন শ্রীধরের ভয়াবহতা বোঝাতে রসিকতা করে বলে, শ্রীধর যদি কোনও ফুলের বাগানে পা রাখেন তা হলে বাগানের সব ফুল পলকে শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে যাবে।

আজ বলধর নেই। সে মারা গেছে প্রায় আটবছর। প্যানক্রিয়াসে ক্যান্সার হয়ে খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছে। কিন্তু তার আগে বলধর তার কাজ সম্পূর্ণ করে গেছে। পুরোপুরি নিজের ছাঁচে শ্রীধর পাত্রাকে তৈরি করে গেছে। নিউ সিটিকে এক পূর্ণাঙ্গ মার্শাল উপহার দিয়ে গেছে। বলধরের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে দিয়েছেন শ্রীধর। বলধরের প্রাসাদে তিনি এখন একা থাকেন। তাঁর সঙ্গে থাকে তদারকির বারোজন পুরুষ।

বলধরের চিকিৎসায় চূড়ান্ত আন্তরিক ছিলেন শ্রীধর। কোনও মানুষের পক্ষে যা-যা করা সম্ভব তার সবটাই করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের খাতায় বলধরের সময় ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই 'বলধর যুগ' শেষ হল। শুরু হল 'শ্রীধর যুগ'। নিউ সিটির মানুষের চোখে শ্রীধর পাত্রা হলেন শহরের শৃঙ্খলা আর শাসনের দেবতা।

শ্রীধর নামে হয়তো পিস ফোর্সের মার্শাল। কিন্তু কীভাবে-কীভাবে যেন সুপারগেমস কর্পোরেশন আর সিন্ডিকেটের ওপরেও তাঁর ক্ষমতা কায়েম হয়ে গেছে। শহরের ক্ষমতা-সাম্রাজ্যের যে-অঞ্চলেই কোনও পুতুলনাচ দেখা যাক না কেন, তার সুতো আসলে বাঁধা রয়েছে শ্রীধরের আঙুলে।

গায়ের ঘাম মুছে তোয়ালেটা আবার হ্যাঙারে রেখে দিলেন। পায়ে-পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলেন একটা স্টেইনলেস স্টিলের কাবার্ডের কাছে। কম্বিনেশান লকের বোতাম টিপে-টিপে কাবার্ডের পাল্লা খুললেন। ভেতরে কয়েকটা তাকে নানান টুকিটাকি জিনিস।

তারই মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট শিশি তুলে নিলেন শ্রীধর। শিশিটা চোখের সামনে তুলে ধরে চকচকে নজরে তাকালেন ওটার দিকে। শিশির ভেতরে গাঢ় স্বচ্ছ তরল। ঢাকনা খুলে শিশিটা শূন্যে উঁচু করে ধরলেন। মুখ হাঁ করে তাকালেন ওপরদিকে। কয়েক ফোঁটা তরল ঢেলে দিলেন হাঁ-এর ভেতরে। মুখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালেন এপাশ-ওপাশ। জিভ দিয়ে টাকরায় তৃপ্তির শব্দ করলেন কয়েকবার। শ্রীধরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—সিংহের চোখের মতো। ঢাকনা এঁটে শিশিটা আবার তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

এই ওষুধটা এক অদ্ভুত এনার্জি সল। বিদেশ থেকে এই তরল আমদানি করেন শ্রীধর। শুধুমাত্র নিজের জন্য। নিউ সিটির আর কেউ জানে না এই তরলের রহস্য। সারাদিনে কয়েকবার এই ওষুধটা নেন শ্রীধর। এটা ওঁর শরীরে নতুন শক্তি তৈরি করে। এটা খাওয়ার পরই মনে হয় শরীরের ভেতরে অফুরান শক্তি বাজপাখির মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে।

এই আশ্চর্য ওষুধের গোপন রহস্য শ্রীধরকে জানিয়ে গেছে বলধর। নিজের অভ্যাসের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে 'ছোট ভাই'-কে। এ ছাড়া বলধর আরও একটা 'অভ্যাস' শ্রীধরকে ধরিয়ে গেছে। লিপস্টিক। ফ্লুওরেসেন্ট লিপস্টিক। তবে ছড়া কেটে কথা বলার ব্যাপারটা শ্রীধরের নিজস্ব।

কাবার্ডের দরজা বন্ধ করলেন। তোয়ালে দিয়ে আর একবার গা মুছে জিমের লাগোয়া ড্রেসিংরুমে চলে এলেন।

নিজের শত্রুদের কথা ভাবতে লাগলেন শ্রীধর।

বলধরের শত্রু ছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক। ক্ষমতায় যদি কেউ থাকে তার শত্রু থাকবেই। সেই কারণেই বলধর নিজের জন্য বিশেষ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছিল। নিজের বিশ্বস্ত গুপ্তচর সে ছড়িয়ে রেখেছিল নিউ সিটির মানুষজনের মধ্যে আর সিন্ডিকেটের নানান স্তরে—এমনকী সিন্ডিকেটের সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও মিশে ছিল বলধরের অনুচরের দল। তাদের সবাইকে বলধর নিয়মিত টাকা দিত। বছরের পর বছর ক্ষমতায় থেকে বলধর সবাইকে টাকা চিনতে শিখিয়েছে। বোঝাতে চেয়েছে, টাকাই সব। বোঝাতে চেয়েছে, 'মূল্যবোধ' শব্দটার আসল অর্থ 'মূল্যের বোধ'—অর্থাৎ, অর্থমূল্যের বোধ। 'মূল্য' আর 'দাম' শব্দ দুটোর মধ্যে কোনও তফাত নেই। ঠিক যেমন ইংরেজি 'ভ্যালু' আর 'প্রাইস' শব্দ দুটোর মধ্যে কোনও তফাত নেই।

সেই পথেই পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন শ্রীধর। গুপ্তচর, টাকা ইত্যাদির বিনিময়ে নিজেকে সুরক্ষিত করার বন্দোবস্ত যেমন করেছেন তেমনই ইমার্জেন্সি সিচুয়েশানের জন্য নিজের আওতায় রেখেছেন স্পেশাল গুটার। জেট ইঞ্জিন লাগানো এই শক্তিশালী গুটার শ্রীধর নিজেই চালাতে পারেন। এই গুটারের মধ্যে লুকোনো রয়েছে অ্যান্টি ডেসট্রাকশন স্টিল বক্স। থার্মাল ইনসুলেশান দেওয়া এয়ারটাইট এবং ওয়াটারপ্রুফ সেই বাক্সের ভেতরে রয়েছে শ্রীধরের ইমার্জেন্সি ফান্ড—কয়েক লক্ষ মার্কিন ডলার।

যদি কখনও প্রয়োজন হয় শ্রীধর এই স্পেশাল গুটারে করে নিউ সিটি ছেড়ে উড়ে যাবেন পৃথিবীর যে-কোনও দেশে। সেখানে নিরাপদে জীবন কাটাবেন। একইসঙ্গে ক্ষমতায়নের পুনর্বাসনের অপেক্ষায় থাকবেন। তারপর প্রথম সুযোগেই ফিরে আসবেন নিউ সিটিতে।

কাবার্ডের পাল্লা বন্ধ করে আপনমনে মাথা নাড়লেন শ্রীধর। হাসলেন।

যতই এসব ব্যবস্থা থাকুক না কেন শ্রীধর জানেন, এসবের কোনও প্রয়োজন হবে না। শ্রীধর পার্টিতে আছেন, এবং থাকবেন। কখনও-কখনও নিজেকে সত্যি অমর বলে মনে করেন শ্রীধরের। তিনি কখনও চান না নিউ সিটিতে তিনি ছাড়া আর কোনও 'হিরো' তৈরি হোক। যখনই শ্রীধর এরকম সম্ভাবনা দেখেছেন তখনই 'ব্যবস্থা' নিয়েছেন। দ্বিতীয় আর কোনও ব্যক্তিত্বকে মাথা তুলতে দেননি। জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছেন নিউ সিটির 'মালিক' কে।

কিন্তু জিশান? এই জিশান পালচৌধুরী ছেলেটা? ওল্ড সিটি থেকে কিল গেম-এর পার্টিসিপ্যান্ট খুঁজতে গিয়ে ওকে বেছে নিয়েছিলেন শ্রীধর। ভেবেছিলেন, নানান খেলায় ছেলেটা জিতবে, কিন্তু কিল গেম পর্যন্ত পৌঁছবে না। বড় জোর পিট ফাইট পর্যন্ত যাবে। তারপর...।

অথচ জাব্বার মতো বর্ন কিলারের হাতে ছেলেটা শেষ হয়নি। উলটে জাব্বাকে চুরচুর করেও ওকে খতম করেনি। ওকে জীবনভিক্ষা দিয়েছে।

সারা শহর এখন জিশান বলতে পাগল।

একের-পর-এক খেলায় জিতে ছেলেটা ধীরে-ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পিট ফাইটে ও জাব্বাকে বাগে পেয়েও খতম না করে ছেড়ে দেওয়ায় শহরবাসীরা অনেকে খুশি হয়েছে। তারা জিশানকে নিয়ে দিন-রাত চর্চা করছে।

নিউ সিটিতে ছড়ানো গুপ্তচরের মারফত সব খবরই পাচ্ছেন শ্রীধর।

টিভির নানান চ্যানেলে জিশানের নানান গেম-এর পারফরম্যান্স নিয়মিত রিপিট টেলিকাস্ট হচ্ছে। ওকে নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের প্রোডাক্ট প্রোমোট করছে। দিন-রাত টেলিভিশানে শুধু জিশান আর জিশান।

শ্রীধর বুঝতে পারছিলেন, এই ছেলেটাকে নিয়ে শহরে 'হিরো ওয়রশিপ' শুরু হয়ে গেছে। জনগণ চাইছে কিল গেম-এ জিশান জিতুক। অসম্ভবকে সম্ভব করুক। জিশান পালচৌধুরী ওদের চোখে সুপারহিরো।

কিন্তু কিল গেম-এ তো আজ পর্যন্ত কেউ বাঁচেনি!

এই গেম-এর আইডিয়াটা প্রথম শ্রীধরের মাথায় আসে। তারপর সুপারগেমস কর্পোরেশনের গেম ডিজাইনাররা গেমটাকে ফাইনাল শেপ দেয়। যদিও মিডিয়ার মাধ্যমে সবসময় প্রচার করা হয় কিল গেম-এর সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর 0.07, শ্রীধর জানেন আসলে ওটা 0.0। নন-জিরো ইনডেক্সটা দেওয়া আছে শুধু ইন্টারন্যাশনাল গেম কোডকে বুড়ো আঙুল দেখানোর জন্য।

জিশানের সুপারহিরো হয়ে ওঠার ব্যাপারটা শ্রীধরের মনে কাঁটার মতো খচখচ করতে লাগল।

না। না। কিল গেম-এ জিশানকে হারতে হবে।

হারতেই হবে।

●

ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে জিশানের মনটা উদাস হয়ে গেল।

এখন ক'টা বাজে? খুব বেশি হলে সাড়ে পাঁচটা। টিভির মেয়েটি ভোর ছ'টায় মিষ্টি গলায় ওকে ডেকে ওঠার অনেক আগেই জিশান ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে এলিভেটরের কাছে। ওর ভীষণ ছাদে যেতে ইচ্ছে করছিল। ওখানে আকাশ অনেক বড়।

এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই পিস ফোর্সের একজন গার্ডকে দেখা গেল। কোমরে ঝুলছে শকার।

জিশানকে দেখে গার্ডের চোয়ালের রেখা নরম হল। মুখের রুক্ষ ভাব মিলিয়ে গেল।

গার্ড জিগেস করল, 'এখন কেমন আছ?'

'আগের চেয়ে অনেক ভালো।'

জাব্বার সঙ্গে লড়াই শেষ হওয়ার পর জিশানকে লেভেল ওয়ান ফিজিক্যাল রিড্রেসাল ইউনিটের এক্সট্রিম কেয়ার সেল-এ রাখা হয়েছিল। সেখানে আধুনিক চিকিৎসার চূড়ান্ত ম্যাজিক দেখেছিল জিশান। মেডিকদের মুখে শুনেছিল, ওর পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙেছে, বাঁ-পায়ের ঊরুর একটা পেশি মারাত্মক চোট পেয়েছে, ডান হাঁটুর মালাইচাকি সরে গেছে, ডানহাতের তর্জনি আর মধ্যমার হাড়ে চিড় ধরেছে। এসব সমস্যা ছাড়াও সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা আর যন্ত্রণা তো ছিলই।

জিশানকে জোড়াতালি দিয়ে ঠিক করতে ডাক্তারবাবুদের প্রায় কুড়ি দিন লেগে গেল। যখন ও ফিজিক্যাল রিড্রেসাল ইউনিট থেকে ছাড়া পেল তখনও ওর পাঁজরে আর ডানহাতের আঙুলে স্টিকিং পলিমার ড্রেসিং। এই ড্রেসিং ওয়াটারপ্রুফ—জল লাগলেও কোনও ক্ষতি হয় না।

রিড্রেসাল ইউনিটের বেডে শুয়েই অনেক অভিনন্দন পেয়েছিল জিশান। ডক্টররা, নার্সরা ওকে 'কনগ্রাচুস' জানিয়েছিল – এবং সেটা শুধু জাব্বাকে হারিয়ে জেতার জন্য নয়, জাব্বাকে প্রাণভিক্ষা দেওয়ার জন্যও। মিমিও ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ছোট্ট করে ওকে বলেছিল, 'জিশান, আমার স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। য়ু ক্যান ডু ইট।'

জিশানের অবাক লেগেছিল। ওর মনে পড়ছিল পিট ফাইটের স্টেডিয়ামের কথা। সেই ভয়ংকর রাতে গ্যালারির মানুষগুলো রক্তের জন্য বীভৎস পিপাসায় গর্জন করছিল, হাত-পা ছুড়ছিল। তখন জিশান বুঝতে পারেনি সেখানে অন্যরকম মানুষও রয়েছে। এখন ও নতুন করে বুঝতে পারছিল বৈচিত্র্য মানুষের প্রধান ধর্ম। পয়সার অন্য পিঠটা ও অল্প অল্প দেখতে পাচ্ছিল।

রিভ্রেসাল ইউনিট থেকে জিশান যখন গেম পার্টিসিপ্যান্টস ক্যাম্পাস-এ ফিরে এসেছিল তখন পুলিশ ফোর্সের বেশ কয়েকজন গার্ড ওকে দেখামাত্রই ওকে ঘিরে ধরে হইচই বাধিয়ে দিয়েছিল।

'ওয়েলকাম, জিশানভাইয়া। ফাইটার নাম্বার ওয়ান।' একজন অচেনা গার্ড বলেছিল।

তারপরই চেনা দুজন গার্ডকে দেখতে পেয়েছিল জিশান। লম্বা এবং বেঁটে। জিশান আর ফকিরচাঁদকে নেক্রোসিটি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া স্নেক লেক কমপিটিশনের আগে বেঁটে গার্ডটি সকলকে লুকিয়ে জিশানকে স্নেক রিপেলান্ট অয়েল দিয়েছিল। সোজা কথায় বলতে গেলে জিশানের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

বেঁটে গার্ড ওর কাছে এগিয়ে এল। সন্ধের শুরুতেই লোকটার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। জিশানের বুকে দুটো চাপড় মেরে জড়ানো গলায় বলল, 'তুমি সত্যিকারের হিরো, জিশান। তুমি ইচ্ছে করলে জাব্বার গর্দানটা মটাস করে ভেঙে দিতে পারতে—কিন্তু দাওনি। তোমার দিল আছে। বুদ্ধিও। তুমি ভালো করেই জানো, জাব্বাকে মেরে এই খতমের খেলা বন্ধ করা যাবে না। তুমি শুধু হিরো না, ভাই, তুমি একেবারে হিরো নাম্বার ওয়ান।'

কথা শেষ করে জিশানকে জড়িয়ে ধরল। ওর বুকের কাছে একটা চুমু খেল। তারপর হাত তুলে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে শুরু করল। অন্য গার্ডরা সঙ্গীর এই কাণ্ড হাততালি দিয়ে উপভোগ করতে লাগল।

লম্বা গার্ড কোথা থেকে যেন ছিটকে চলে এল জিশানের সামনে। চাপা গলায় বলল, 'শাবাশ, জিশান, শাবাশ। তোমার জবাব নেই। তুমি বেঁচে থাকলে সবার ভালো হবে। কিন্তু...।'

জিশান বিষণ্ণ হাসল। সামনে কিল গেম। সুতরাং ওই 'কিন্তু'টাই আসল কথা।

লম্বা গার্ড চটপট জিশানের কাছ থেকে সরে গিয়ে ওর বেঁটে সঙ্গীর হাত চেপে ধরল ঃ 'অ্যাই, কী করছিস কী। কেউ দেখে রিপোর্ট করলে কী হবে? চল, চল—শিগগির চল।'

এক ঝটকায় লম্বা বন্ধুর হাত ছাড়িয়ে নিল বেঁটে ঃ 'কোন সালা রিপোর্ট করবে? কোন সালা?' টলোমলোভাবে মাথার ওপরে হাত ঘুরিয়ে বলল, 'এখানে তো শুধু আমরাই আছি, নাকি? কী ভাই, তোমরা কি কেউ ওই শ্রীধরের বাচ্চাকে রিপোর্ট করবে? হ্যাঁ?'

আশ্চর্য। বাকি গার্ডরা এলোমেলো গুঞ্জন তুলে বলল, 'না, না—কীসের রিপোর্ট! জিশান আমাদের হিরো নাম্বার ওয়ান। শুরু থেকে তো আমরা ওর গেম দেখছি। ও একেবারে লা-জবাব।'

বেঁটে গার্ড উত্তেজিতভাবে লম্বা সঙ্গীর ইউনিফর্ম খামচে ধরল : 'দেখলি, সবাই কী বলছে! দেখলি।'

সবমিলিয়ে হইহট্টগোল বেড়ে উঠছে দেখে শেষ পর্যন্ত জিশানই সবাইকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ করতে লাগল। তারপর কথা না বাড়িয়ে ও এগিয়ে গিয়েছিল এলিভেটরের দিকে।

জিশানের অদ্ভুত লাগছিল। এই সাধারণ মানুষগুলো, যারা এখানে স্রেফ দু-পয়সা আয়ের জন্য সিকিওরিটি গার্ডের চাকরি নিয়েছে, জিশানের জেতায় এতটা খুশি হয়েছে! এর একটা কারণ বোধহয় সিন্ডিকেট এবং শ্রীধর পাট্টার প্রতি ওদের ঘৃণা। থমথমে আতঙ্কের নিয়মিত শাসন আর মৃত্যু দেখতে-দেখতে ওদের ভেতর থেকে বমির ভাব উথলে উঠেছে। মুখের ভেতরে যে থুতু আর জল টের পাচ্ছে তার স্বাদ টক।

নাইহাটিলা গ্রামে থাকা গার্ডের কথা মনে পড়ল জিশানের। শান্ত, নরম, ছবির মতো ওর সেই গ্রাম। আর বছরপাঁচেক চাকরি করেই ও গ্রামে ফিরে যাবে। এখানে একটা মুহূর্তও ছেলেটার ভালো লাগছে না।

জিশান ক্রমশই যেন বুঝতে পারছিল, আসলে অনেকেই এখানে ভালো নেই।

জিপিসি-তে ফিরে আসার পর আরও দশদিন জিশানকে ডাক্তারদের নির্দেশ মতো চলতে হয়েছে। ওকে এখন সফট এক্সারসাইজ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে চলছে ফিজিয়োথেরাপি মেশিনের ট্রিটমেন্ট। আর সপ্তাহখানেক পর থেকেই ওর কিল গেম ওয়ার্ম-আপ ট্রেনিং শুরু হবে। তারপর...।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিশান। অবাক হয়ে খেয়াল করল, ওর মধ্যে এখন উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, আশঙ্কার তেমন কোনও ছায়াপাত নেই। নিউ সিটিতে আসার শুরুর দিকটায় এই আবেগগুলোই জিশানকে শাসন করত। তারপর কয়েকমাস ধরে নানান খেলায় অংশ নিয়ে জীবন মরণের ওঠা-পড়া দেখতে দেখতে এইসব আবেগ কবে জমাট বেঁধে বরফ হয়ে গেছে! জিশান এখন অনেক ধীর, স্থির, শান্ত।

এলিভেটরের ভেতরে ঢুকল জিশান। নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হল।

'কোথায় যাবে?' গার্ড জিগ্যেস করল।

'ছাদে যাব। ঘরের মধ্যে কেমন যেন দম আটকে আসছে।'

'হবেই তো! এতদিন ধরে ফ্যামিলি ছেড়ে এখানে একা-একা থাকা...।'

'তুমিও তো এখানে একা-একা আছ—।'

এলিভেটর উঠতে শুরু করেছিল। ডিসপ্লে প্যানেলের দিকে একপলক তাকিয়ে জিশানের দিকে মুখ ফেরাল গার্ড। হেসে বলল, 'ফারাকটা বুঝতে পারলে না, ভাই! আমি এখানে একা আছি নিজের ইচ্ছেয়—চাকরি করছি, তাই। আর

তুমি এখানে আছ শ্রীধর পাট্টার ইচ্ছেয়। মানে, বন্দি।'

মানুষটার এই অদ্ভুত ব্যাখ্যায় জিশান বেশ অবাক হয়ে গেল। ও গার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অন্যান্য গার্ডের তুলনায় এর বয়েস কিছুটা বেশি। সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে। সুঠাম সুন্দর চেহারা। তবে মুখে যেন একটা আবছা লড়াইয়ের ছাপ রয়েছে।

গার্ড জিগ্যেস করল, 'তোমার সামনে তো কিল গেম?'

জিশান কোনও কথা বলল না—শুধু ওপর-নীচে মাথা নাড়াল।

'তোমাকে সবসময় টিভিতে দেখায়। তোমার গেমগুলো দেখায়—ট্রেনিং দেখায়। নিউ সিটির প্রায় সবাই তোমাকে চিনে গেছে।'

জিশান চুপ করে রইল। গার্ডকে দেখতে লাগল।

'মনোহর সিং তোমার দোস্ত ছিল?'

সঙ্গে-সঙ্গে জিশানের মনখারাপ হয়ে গেল। বুক ঠেলে একটা শ্বাস বেরিয়ে এল।

গার্ড বলে চলল, 'হ্যাঁ...তোমাকে আমি টিভিতে কাঁদতে দেখেছি। পিট ফাইটে মনোহর সিং-এর সঙ্গে লড়াইয়ের অ্যানাউন্সমেন্টের সময়। তারপরে মনোহরকে যখন কুকুরগুলো ছিঁড়ে খেল, তখনও।'

জিশানের বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল। মনোহর নামের হাসিখুশি অশিক্ষিত উদার মানুষটার স্মৃতি ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর চোখের সামনে।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। সামনে বিশাল ছাদ। ভোরের কোমল আলোয় স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। এই স্নিগ্ধ শূন্যতা জিশানকে আরও বিষণ্ণ করে তুলল।

গার্ড বলল, 'এখানে দশবছর চাকরি হয়ে গেল। অন্য কারও জন্যে কোনও ক্যান্ডিডেটকে চোখের জল ফেলতে দেখিনি। তোমার ভেতরে এখনও মানুষ আছে, ভাই। কিল গেম-এ তুমি জিতলে আমার খুব ভালো লাগবে।'

জিশান এবার বলল, 'কিন্তু শুনেছি কিল গেম-এ আগে কেউ জেতেনি—।'

'ঠিকই শুনেছ।' আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখাল গার্ড : 'ওপরের ওই অদৃশ্য লোকটার কাছে অনেকেই তো অসম্ভব উদ্ভট অনেক কিছু চায়। কোনওদিন পাবে না জানে, তবু চায় তো!' হাসল। অনাবিল হাসি : 'তো আমিও তাই চাইছি।' একটু থেমে তারপর : 'আমি একা নয়—অনেকেই চাইছে তুমি কিল গেম-এ জেতো।'

জিশান হাসল। সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। বলল, 'লড়ব—জান কবুল করে লড়ব।'

গার্ড জিশানের দিকে হাত বাড়াল। জিশানও।

হ্যান্ডশেক করে গার্ড বলল, 'গুড লাক, জিশান।'

'থ্যাংক য়ু।'

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হল। জিপির্সি-র গেস্ট হাউসের ছাদে জিশান একা। ওকে ঘিরে সুবিশাল ভোরের আকাশ।

জিশানের মনে হল, আকাশের এই বিশাল ক্ষমতা আর মমতা ওকে আগলে রেখেছে। কিল গেম-এর আঁচ থেকে আকাশ ওকে বাঁচাবে।

ছাদে দুজন গার্ড পাহারায় ছিল। জিশানকে দেখে ওরা তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল। ওদের একজন ভুরু উঁচিয়ে ইশারায় জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার?'

জিশান বলল, 'কিছু না। ঘুম আসছে না। ঘরের ভেতরে ভাল্লাগছে না। তাই ছাদে পায়চারি করতে এলাম।'

'কী করে ভালো লাগবে! তোমার ওপরে যা ধকল গেছে!'

আর একজন বলল, 'তোমার কথা পান্ডা আর মূর্তির কাছে শুনেছি। ওরা তোমার কথা খুব বলছিল।'

জিশানের ভুরু কুঁচকে গেল : 'কে পান্ডা আর মূর্তি?'

'ওই যে—বেঁটে আর লম্বু মানিকজোড়। আমাদের মতো সিকিওরিটি গার্ড। বেঁটেটা পান্ডা। আর লম্বুর নাম মূর্তি।'

জিশান চুপ করে রইল।

প্রথমজন বলল, 'আমরা নিজেদের মধ্যে তোমার কথা বলাবলি করি। তুমি খুব হিম্মতওয়ালা।'

ওর সঙ্গী নীচু গলায় বলল, 'তোমার সামনে কিল গেম। তোমাকে হেল্প করা উচিত। যদি মনখারাপ না করো একটা কথা বলব?'

জিশান মনে মনে মনখারাপ না করার জন্য তৈরি হল। জিগ্যেস করল, 'কী?'

'কিল গেম-এর সারভাইভাল ফ্যাক্টর 0.07 বলে সিন্ডিকেট যেটা ঢেঁড়া পিটিয়ে প্রচার করে সেটা ফল্স। ওটা আসলে 0.0। কিল গেম-এ, কেউ বাঁচে না। ওই গেম সিটি থেকে কেউ বেঁচে ফিরে আসে না।'

জিশান মলিন হাসল : 'জানি...।'

'তোমাকে আমরা যতরকমভাবে পারি হেল্প করব। কারণ, আমরা চাই তুমি জেতো। তবে কী করে জিতবে জানি না।'

জিশান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর কিছু সমর্থক আছে জেনে ওর ভালো লাগছে। তবে সেই সমর্থন ওকে কোথাও পৌঁছে দেবে না।

'না—তোমাকে আর ডিসটার্ব করব না।' বলে গার্ড দুজন সরে গেল। যার-যার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পজিশন নিল।

জিশান ছাদের কিনারার দিকে হেঁটে গিয়ে পুব আকাশের দিকে তাকাল। ভোরের আলো ফুটে গেছে—এবার সূর্য ফোটার পালা।

রিজ্রেসাল ইউনিট থেকে জিপিসি-র গেস্টহাউসে ফেরার দিন গার্ডদের খুশির হইচই জিশানকে অবাক করেছিল। আজও গার্ড তিনজনের প্রতিক্রিয়া ওকে অবাক করল। ওরাও জানে, কিল গেম-এর সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর 0.0। খাঁচার ভেতরে ইঁদুর-বেড়াল খেলা। বেড়ালের হাতে ইঁদুর মরবেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ছাদের সাঁইতিরিশ তলার উচ্চতায় দাঁড়িয়ে নিউ সিটির 'ছবি' দেখছিল জিশান। নানান বাড়ির আকাশছোঁয়া কাঠামোগুলোয় অতি-আধুনিক স্থাপত্যের চিহ্ন। জিশানের বারো বছর বয়েসে নিউ সিটি যা ছিল এখন তা নেই। সময় গড়িয়ে চলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানকার নাগরিক জীবনে বহুরকম নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। তারই একটা হচ্ছে বিনোদন—পুরুষালি বিনোদন। কে জানে, আগামী আট-দশবছরে সুপারগেমস্ কর্পোরেশনের গেম ইনভেন্টরসরা হয়তো শুধু মেয়েদের নিয়ে নানান ধরনের রোমাঞ্চকর খেলা আবিষ্কার করবেন। তারপর আসবে পুরুষ এবং মহিলাদের মিশিয়ে আরও নতুন ধরনের গেম-এর পরিকল্পনা। তারপর... তারপর...।

তার পরের ব্যাপারটা ভাবতেই জিশানের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। যদি শ্রীধর পাট্টা আর তাঁর গেম ইনভেন্টর সাঙ্গপাঙ্গরা তাঁদের বিকৃত স্যাডিস্ট মনোভাব নিয়ে শিশু আর কিশোরদের জন্য আরও নোংরা চরিত্রের, আরও বেপরোয়া, সব মরণপণ 'খেলা' আবিষ্কার করেন? যদি ম্যানিম্যাল রেসে ক্ষুধার্ত গ্রাডহাউন্ডের সঙ্গে কিশোর প্রতিযোগীরা দৌড়য়? যদি অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হয় ভয়ংকর কোমোডো ড্রাগন? যদি স্নেক লেক কমপিটিশানের কনটেস্ট্যান্ট হয় আট-ন' বছরের বালক-বালিকার দল?

জিশান আর ভাবতে পারছিল না। ওর বমি পাচ্ছিল। এ কয়েকমাসের অভিজ্ঞতায় ওর মনে হচ্ছিল, এরকমটা হতেই পারে –যদি না কেউ সময়মতো বাধা দেয়।

কিন্তু কখন সেই সময়?

ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে জিশানের মনে হল, ওর বুকের ভেতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিল : 'এখন! এখন। এখন।'

ততক্ষণে দিগন্তের ক্যানভাসে সূর্য উঠে পড়েছে।

●

বেশ কয়েকদিন ধরে একটা চিন্তা জিশানের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। চিন্তাটাকে অনেকবার তাড়ানোর চেষ্টা করেছিল ও, কিন্তু চিন্তাটা যায়নি। বারবার ও নিজেকে বোঝাচ্ছিল যে, এটা একটা অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু ওর ছেলেমানুষ মন মানতে চায়নি।

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে ও পান্ডা আর মূর্তির শরণাপন্ন হল।

ওদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে নিয়েই জিশান গেস্টহাউসের একতলার ফোয়ারার কাছে কয়েকদিন ধরে ঘুরঘুর করছিল। কিন্তু ওদের দেখা পাচ্ছিল না। কে জানে, হয়তো ওদের জিপিসি থেকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে!

পরপর তিনদিন জিশানের উসখুসুনি দেখে একদিন রাতে একজন গার্ড জিশানকে কাছে ডাকল। জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার বলো তো। ক'দিন ধরে তুমি এখানটায় ঘুরঘুর করছ কেন?'

জিশান ইতস্তত করতে লাগল।

তখন গার্ডটি বলল, 'আরে ইয়ার, তুমি কিল গেম-এ কোয়ালিফাই করেছ। তোমার জন্যে রুল-টুল আর অত স্ট্রিক্ট নেই। বলো, কী বলবে?'

'আমি...আমি পান্ডা আর মূর্তির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। খুব জরুরি ব্যাপার...।'

পিট ফাইটের আগে হলে এই গার্ডই হয়তো জিশানকে পাঁচটা প্রশ্ন করত। কিন্তু এখন কোনও কথা জিগ্যেস করল না। শুধু বলল, 'কোনও চিন্তা কোরো না। কাল সন্ধেবেলা সাতটা নাগাদ ঘুরতে-ঘুরতে এখানে চলে এসো। পান্ডা আর মূর্তি থাকবে। আমি খবর দিয়ে দেব।'

সেটাই হয়েছিল। পরদিন সন্ধেবেলা সেই দুজন গার্ডের সঙ্গে দেখা হল জিশানের। ওদের একপাশে ডেকে নিয়ে গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা বলল জিশান।

শুনে মূর্তি একেবারে আঁতকে উঠল। বলল, 'কীসব আজেবাজে বকছ! এ কী করে হয়! ধরা পড়লে বা জানাজানি হলে কেলেঙ্কারি হবে। অবশ্য সেই কেলেঙ্কারি দেখার জন্যে আমি বা পান্ডা কেউই আর বেঁচে থাকব না। শ্রীধর পাট্টা আমাদের বটিচচ্চড়ি করে খেয়ে নেবে।'

মূর্তির আতঙ্ক দেখে পান্ডা হাসল। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেশা করা জড়ানো গলায় সঙ্গীকে বলল, 'ওসব ফালতু কথা ছাড় তো। শ্রীধর পাট্টার চেয়ে আমার কি আই. কিউ. কিছু কম আছে? আমি এমন টেকনিকে কাজ হাসিল করব যে, পাট্টার বাপ-ঠাকুরদাও টের পাবে না।' জিশানের দিকে ফিরে বলল, 'কোনও ভয় নেই, জিশানভাইয়া—সব হয়ে যাবে...।'

জিশান চাপা গলায় বলল, 'আমি দশহাজার টাকা দেব।'

পান্ডা লাল চোখ বড়-বড় করে জিশানের দিকে তাকাল। যেন মঙ্গলগ্রহের প্রাণী দেখছে।

'টাকা? তোমার কাছ থেকে টাকা নেবে?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করল পান্ডা। তারপর : 'যদি নিতেই হয় তা হলে নেব কিল গেম-এর পর। তুমি তখন একশো কোটি টাকার প্রাইজ মানি জিতবে। তার থেকে কিছু আমাদের দিয়ো...এই গরিব ভাই দুটোকে দিয়ো।'

জিশান বুঝল, পান্ডা আসলে কী বলতে চাইছে। ও কিল গেম-এ জিতলে তবে না পান্ডা আর মূর্তিকে টাকা দেবে! আসলে ওরা জিশানকে উইশ করছে।

জিশান কোনও কথা বলল না। মলিনভাবে হাসল। ফোয়ারার জলটাকে হঠাৎই ওর চোখের জল বলে মনে হল। ও চারপাশে তাকাল। রাতের আকাশ দেখল। বাতাসের ঘ্রাণ নিল। গেস্ট হাউসের উঁচুতলার দিকে তাকাল। তারপর পান্ডা আর মূর্তিকে দেখল।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল : 'ছোটবেলায় আমি এই শহরে থাকতাম। তারপর...তারপর...এই শহর ছেড়ে ওল্ড সিটিতে চলে গেছি। বহুবছর এই শহরটাকে দেখিনি। তাই কিল গেম-এর আগে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে...ভীষণ ইচ্ছে করছে। সেইজন্যেই তোমাদের হেল্প চেয়েছি।'

পান্ডা অবাক হয়ে বলল, 'ও, তাই! তুমি এই শহরে ছিলে। যাকগে, কোনও প্রবলেম নেই। কাল সাড়ে সাতটায় তুমি এখানটায় চলে এসো—আমরা থাকব। তারপর তোমায় গোটা শহরটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব...।'

জিশান ফোয়ারার জলের ধারার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর মনে পড়ছিল মিনির কথা, শানুর কথা। মা-বাবার কথাও। এই শহরটা ছেড়ে যাওয়ার দিনে বাবার চোখের জলের কথা মনে পড়ে গেল জিশানের।

ও পান্ডার হাত চেপে ধরল। ছেলেমানুষের মতো অনুনয় করে বলল, 'আমার হাতে আর সময় নেই। কিল গেম-এ শেষ হয়ে যাওয়ার আগে শহরটাকে একবার দেখতে চাই।'

পান্ডা চোখ বড়-বড় করে নেশাতুর দৃষ্টিতে তাকাল জিশানের দিকে : 'কিল গেম-এ শেষ? তুমি?' অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল পান্ডা। তারপর হাসি থামলে বলল, 'জিশানের শেষ নেই।'

●

জিপিসি-র সিকিওরিটি কন্ট্রোল রুমে জিশানকে নিয়ে এল পান্ডা আর মূর্তি।

এরকম আধুনিক ঝকঝকে কন্ট্রোল রুম ফিউচারিস্টিক সিনেমাতেও দেখা যায় না। চারদিকে শুধু কাচ আর স্টেইনলেস স্টিল। এ ছাড়া ওয়াল মাউন্টেড কম্পিউটার আর অসংখ্য টাচ-স্ক্রিন ডিসপ্লে। বাঁ-দিকের বিশাল দেওয়ালের পুরোটাই একটা গ্রাফিক ডিসপ্লে স্ক্রিন। সেখানে জিপিসি-র নানান মনিটরড জোন দেখা যাচ্ছে। ছবির সঙ্গে-সঙ্গে জোনগুলোর নম্বর আর নাম চোখে পড়ছে। পাঁচ কি ছ'সেকেন্ড পরপর ছবিগুলো পালটে যাচ্ছে—ঠিক যেমন কম্পিউটার কার্ড গেমে তাস পালটে যায়।

কন্ট্রোল রুম-এর এসি এতটাই জোরালো যে, জিশানের শীত করতে

লাগল।

ঘরে পাঁচজন সিকিওরিটি অফিসার বিভিন্ন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে একমনে কাজ করছিল। ওদের পরনে গাঢ় নীল ইউনিফর্ম—তার কোনও-কোনও জায়গায় সাদা বিডের পাইপিং।

এ ছাড়া আরও একজন অফিসার ঘরের ডানদিকের এককোণে একটা গ্লাস কিউবিকলে বসে ছিল। তার সামনের টেবিলে একটা আর্ক কম্পিউটার স্ক্রিন। লম্বা, ধনুকের মতো বাঁকানো তার এল. সি. ডি. পরদা।

জিশানরা ঘরে ঢুকতেই কিউবিকলের অফিসার চোখ তুলে তাকাল। এবং পরমুহূর্তেই চটপট আঙুল চালিয়ে কম্পিউটারের কিবোর্ডের কয়েকটা বোতাম টিপে দিল। তারপর একগাল হেসে উঠে দাঁড়াল।

কিউবিকলের বাইরে বেরিয়ে এল অফিসার।

মাথায় কাঁচাপাকা চুল। তামাটে মুখে হাসির ভাঁজ। লম্বা-চওড়া চেহারা। দেখে সিকিওরিটি অফিসার বলে সমীহ হয়।

ভদ্রলোকের কোমরে কালো রঙের পার্টিকল গান। এই বন্দুকের সুইচ টিপলেই হাই-এনার্জি পার্টিকল স্ট্রিম বেরিয়ে আসে। শত্রুকে অকেজো করে দেয়। পিস ফোর্সের উঁচু স্তরের অফিসাররা এই বন্দুক ব্যবহার করে।

'হাই, জিশান।' বলে জিশানের দিকে হাত বাড়াল অফিসার : 'উইশ য়ু লাক ইন কিল গেম।'

হ্যান্ডশেক করে জিশান বলল, 'থ্যাংক্স।'

এবার পান্ডা আর মূর্তির দিকে তাকিয়ে অফিসার বলল, 'তোমরা এ-ঘরে ঢোকামাত্রই এই গেস্টহাউস বিল্ডিং-এর চারটে অডিয়ো-ভিশুয়াল সারভেইল্যান্স জোন আমি ডি-অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছি। ফলে এখানে জিশানকে কেউ ওয়াচ করতে পারবে না। তা ছাড়া সিকিওরিটি সেন্ট্রালের তিনটে অফিসে আমার কোর লিডারদের সঙ্গে কথা বলা আছে। ওরা তো এককথায় রাজি...।'

পান্ডা জিশানের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল। ছোট্ট করে বলল, 'জিশান ম্যাজিক।'

জিশান ঠোঁটে হাসল।

এরপর জিশানকে 'তৈরি' করার পালা।

পান্ডা আর মূর্তি জিশানকে খোলসা করে কিছু বলেনি। কিন্তু ওকে পাশের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে ওরা যা শুরু করল সেটা থিয়েটারের গ্রিনরুমকেও হার মানায়। অফিসারটির তত্ত্বাবধানে আনমোল নামে একজন সিকিওরিটি গার্ড জিশানের ভোল পালটানোর কাজে হাত দিল।

পান্ডা আর মূর্তি নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল। আর পান্ডা মাঝে-মাঝেই শ্রীধর পাট্টার মুণ্ডপাত করে উত্তেজিত সব মন্তব্য ছুড়ে দিচ্ছিল।

প্রথমে জিশানকে বলা হল, জামাকাপড় ছেড়ে সিকিওরিটি গার্ডের ইউনিফর্ম পরে নিতে।

অফিসার পান্ডাকে লক্ষ করে বলল, 'জানো, এই স্পেয়ার ইউনিফর্মটা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে স্টোর থেকে ম্যানেজ করতে হয়েছে। প্রত্যেকটা ইউনিফর্মে ম্যাগনেটিক সেন্সর লাগানো আছে। আমি রূপমকে বলেছিলাম। ও স্টোরের সারভেইল্যান্স চিফ। ও হেল্প না করলে হত না।'

জিশান ইউনিফর্মটা পরতে-পরতে অচেনা রূপমকে ধন্যবাদ দিল। ওর মনে হল, এই অন্যরকম প্রতিবাদী মানুষগুলো জিশানকে সাহায্য করেই সিন্ডিকেটের অবিচারের বিরুদ্ধে ওদের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। জিশান কিল গেমে কোয়ালিফাই করে গার্ডদের সহানুভূতি জিতে নিয়েছে। ফাঁসির আসামির শেষ ইচ্ছে পূরণের মতোই ওরা জিশানের 'শেষ' ইচ্ছেগুলো পূরণ করে চলেছে।

গার্ডের সাহায্যে কয়েকমিনিটের মধ্যেই জিশানের পোশাক বদল শেষ হল। অফিসার ওকে শকার, স্মার্ট কার্ড সব দিল। হেসে বলল, 'ওই আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। নিজেকে একবার দেখে নাও—।'

একটা মেটাল ক্যাবিনেটের খোলা পাল্লার ভেতরদিকে একটা ঝকঝকে আয়না লাগানো ছিল। জিশান আয়নাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কী আশ্চর্য। একটা কালো ইউনিফর্ম জিশানকে কী সাংঘাতিক পালটে দিয়েছে। এখন ও বলতে গেলে নিউ সিটির নিরাপত্তার যান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা অংশ হয়ে গেছে।

গার্ড জিশানের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর হাতে ছাই রঙের একটা মেকাপ বক্স। বলল, 'এবার একটু হালকা মেকাপ...ব্যস...।'

পান্ডা হেসে বলল, 'আনমোল একসময় যাত্রাদলের মেকাপম্যান ছিল। তারপর পেটের দায়ে এই বেশি মাইনের হতচ্ছাড়া চাকরিতে এসেছে। ওর মেকাপ কমপ্লিট হওয়ার পর তোমার ওয়াইফই তোমাকে আর চিনতে পারবে না—শ্রীধরের বাচ্চা তো কোন ছাড়।'

আনমোলের দিকে তাকাল জিশান। বয়েস তিরিশ ছুঁয়েছে কিনা সন্দেহ। ফরসা মুখে ব্রণের দাগ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। মুখ থেকে পিপারমিন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। চোখ ছোট-ছোট, তবে নজর তীক্ষ্ণ।

দক্ষ হাতে জিশানের মুখে কাজ শুরু করল আনমোল।

ঘরের দেওয়াল-ঘড়ির হিসেবে সময় লাগল উনিশ মিনিটের কয়েকসেকেন্ড বেশি। কিন্তু ওই অল্প সময়েই আনমোল জিশানকে পালটে দিল।

পান্ডা আর মূর্তি ওদের 'নাইট সাফারি'-র প্ল্যান নিয়ে অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করছিল। অফিসার বলল, 'বেশি রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই। শুধু সেফ জায়গাগুলোই জিশানকে ঘুরিয়ে দেখাও। নানান জোনের গার্ডদের সঙ্গে

ওকে মিশিয়ে দেবে। তা হলেই ওকে আর কেউ নজর করতে পারবে না। নইলে...বুঝতেই তো পারছি...যদি আমাদের মার্শাল কোনওরকমে ব্যাপারটা টের পায় তা হলে আমরা কেউই আর বাদ যাব না। একজন ধরা পড়লেই ও টরচার করে তার পেটের সব কথা বের করে নেবে। একটা লোককে কী করে না মেরেও মেরে ফেলা যায় সেটা শ্রীধর পাট্টা ভালো করেই জানে। সুতরাং, কেয়ারফুল...।"

অফিসারের সঙ্গে কথা শেষ করে পান্ডা আর মূর্তি জিশানকে নিয়ে সিকিওরিটি কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এল। করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল।

চকচকে বাদামি গ্রানাইট পাথর বসানো মেঝেতে আয়নার মতো প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। জিশানের দুপাশে পান্ডা আর মূর্তি। প্যারেডের মতো সমান তালে পা মিলিয়ে ব্যস্তভাবে হেঁটে চলেছে। দেখে মনে হবে, ওরা কোনও মিশনে চলেছে। কন্ট্রোল রুমের অফিসার পান্ডা আর মূর্তিকে ঠিক এইভাবে হেঁটে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। জিশানের নিরাপত্তার জন্য এটা ওদের একরকম ছদ্মবেশ।

করিডরের দৈর্ঘ্য শেষ হতেই কয়েকধাপ সিঁড়ি। তারপর স্মার্ট ডোর। নির্দিষ্ট স্লটে নিজের স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করল মূর্তি। দরজা খুলে গেল। সামনেই খোলা চত্বর। চত্বরের বাইরে একফালি মিহি ঘাসজমির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কিউ-মোবাইল। তার গায়ে সিন্ডিকেটের লোগো আঁকা।

জিশান চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

জায়গাটা একদম ফাঁকা এবং অন্ধকার। পান্ডা চাপা গলায় বলল যে, এটা গেস্টহাউসের পিছনদিক। এদিকটায় শুধু গার্ডরাই চলাফেরা করে। ওদের ব্যবহারের জন্য যেসব কিউ-মোবাইল গেস্টহাউসে আসা-যাওয়া করে সেগুলো এখানেই পার্ক করা হয়। এখানে এসে গাড়িগুলো থামে, গার্ডরা ওঠা-নামা করে।

জিশানদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কিউ-মোবাইলটার কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে আরও ছ'টা কিউ-মোবাইল পার্ক করা রয়েছে। পার্কিং জোনে লাল আলো জ্বলছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে এটা 'রেড অ্যালার্ট' জোন।

দূরে চারজন গার্ডকে দেখতে পেল জিশান। ওদের দিকে ইশারা করে পান্ডা হাত নাড়ল। ওরাও হাত নেড়ে জবাব দিল।

গাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে পান্ডা পকেট থেকে একটা রিমোট বের করে বোতাম টিপল।

কিউ-মোবাইলের চারটে দরজা ডানার মতো খুলে গেল। জিশান দেখল, গাড়িতে কেউ নেই। তা হলে গাড়িটা চালাবে কে?

চোখে এই প্রশ্ন নিয়ে পান্ডার দিকে তাকাল জিশান।

পান্ডা হাসল। বলল, 'আমি চালাব। কোনও ভয় নেই। আমার এই গাড়ি ড্রাইভিং-এর লাইসেন্স আছে। অনেক গার্ডকেই কিউ-মোবাইল ড্রাইভিং-এর ট্রেনিং দেওয়া হয়। কেউ সে-ট্রেনিং নেয়, কেউ নেয় না।'

পান্ডা পাইলটের সিটে বসে পড়ল। ওর বাঁ-পাশে জিশান। আর তার পর মূর্তি। শকারগুলো খুলে ওরা গাড়ির পিছনের সিটে রেখে দিল।

রিমোট টিপতেই গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

পান্ডা গাড়ি স্টার্ট দিল। সঙ্গে-সঙ্গে অটোমেটিক এসি চালু হয়ে গেল।

দক্ষ হাতে গাড়িটাকে চওড়া রাস্তায় নিয়ে এল পান্ডা। তারপর মসৃণ পথ ধরে নিঃশব্দে গাড়ি ছোটাল।

একটু পরে পান্ডা আপনমনে বলতে লাগল, 'জানো ভাই, জিশান, ছোটবেলা থেকেই আমার গাড়ি চালানোর খুব শখ। আমার বাপের গাড়ি রং করার দোকান ছিল। তো ওইসব পুডিং ঘষা রং চটা গাড়ি—লুকিয়ে ওগুলোর চাবি নিয়ে চালাতাম। টের পেলেই বাপ খ্যাচখ্যাচ করত। বলত, খদ্দেরদের গাড়ি। আমি পাত্তা দিতাম না। গাড়ি আমাকে টানত।'

মূর্তি বলল, 'গুরুর দিকে ও সিন্ডিকেটের গাড়ি চালাত। একটা অ্যাক্সিডেন্ট করার পর থেকে সিকিওরিটি গার্ড হয়েছে।'

'যাকগে, ওসব বাদ দাও—' জিশানকে কনুইয়ের খোঁচা দিল পান্ডা : 'নিউ সিটির কী-কী দেখবে বলো...।'

জিশান পান্ডার দিকে তাকাল। অন্ধকারে আবছা পান্ডার মুখ। তার ওপরে রাস্তার মেটাল ল্যাম্প থেকে ছিটকে আসা আলোর হাইলাইট।

কী বলবে জিশান? বাড়ির ঠিকানা, আর বাবার চোখের জল—নিউ সিটির এটুকুই তো মনে আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'এন—টুয়েলভ কমা থার্টি সিক্স। এই ঠিকানায় আমি থাকতাম। আজ থেকে প্রায় দেড়যুগ আগে।'

'তাই?' অবাক চোখে জিশানের দিকে তাকাল মূর্তি। পান্ডাও।

নিউ সিটিকে অনেকগুলো ছোট-ছোট জোনে ভাগ করা আছে। জোনগুলোর নাম এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। এইরকম প্রতিটি জোনের এক-একটি অঞ্চলের নির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক বা কো-অর্ডিনেট আছে। সেই সংখ্যা দিয়েই কোনও জোনের একটি বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করা হয়। জিশানের শুধু এটুকুই মনে আছে : এন—টুয়েলভ কমা থার্টি সিক্স।

জিশান সংক্ষেপে ওর ছোটবেলার কথা বলতে লাগল।

গেম পার্টিসিপ্যান্টস ক্যাম্পাস পেরিয়ে কিউ-মোবাইল অনেকক্ষণ আগেই বড় রাস্তায় এসে পড়েছিল। রাস্তার দু-ধারের আলোয় ছবির মতো পথটা দেখতে

পাচ্ছিল জিশান। রাস্তাটার রুপোলি রং। ধাতুর পাতের মতো চকচকে। তারই ওপরে ছোট-ছোট গুটি। ঠিক যেন ব্যাঙের চামড়া। গাড়ির চাকা এই রাস্তায় সহজে পিছলে যাবে না। বাড়তি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক সেই নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে।

রাস্তায় বড়-বড় ইলেকট্রনিক বিলবোর্ড চোখে পড়ছিল। সেগুলোর বেশিরভাগই প্রসাধন আর নেশার হরেকরকম উপকরণের বিজ্ঞাপন। জিশান অবাক হয়ে দেখছিল, বিজ্ঞাপনের চলমান ছবিগুলো ঠিক যেন আসলের মতো—ত্রিমাত্রিক।

মূর্তিকে সে-কথা জিগ্যেস করতেই ও বলল, 'এখানে নিয়মিত ফরেন টেকনোলজি কেনা হয়। কথায়-কথায় সবাই জাপান আর আমেরিকা দেখায়। ওই বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো সব হলোগ্রাম ইমেজ...তাই ওরকম আসলের মতো দেখাচ্ছে।'

একটু পরেই রঙিন হলোগ্রাম ইমেজ দেখে-দেখে জিশানের চোখ সয়ে গেল।

কিন্তু শুধু বিলবোর্ড নয়, নানান অফিস বিল্ডিং-এর চেহারা আর আলোকসজ্জা দেখেও তাক লেগে যায়। মনে হয় যেন শহরটা সৌন্দর্যে স্বর্গের খুব কাছাকাছি। যদিও স্বর্গের সৌন্দর্য কেমন জিশান জানে না।

ওল্ড সিটির কথা মনে পড়ে গেল জিশানের। কষ্ট হল। মনে হল, একটা লেসার বিলবোর্ডের খরচ দিয়ে ওর শহরের দশটা গরিব পরিবারের একমাস খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরকম একটা সুন্দর বিল্ডিং-এর বদলে ওল্ড সিটিতে অনায়াসে গড়ে তোলা যায় দুটো ভদ্রস্থ হাসপাতাল, কিংবা হাফডজন স্কুল।

কিউ-মোবাইল ছুটছিল। আর জিশান মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এতটাই আকর্ষণীয় হতে পারে। আধুনিক এই প্রযুক্তির পাশাপাশি কী সাংঘাতিক ওইসব আদিম হিংস্র খেলা। বাইরের এই রঙিন সুন্দরের আড়ালে কী অদ্ভুতভাবেই না ঘাপটি মেরে বসে আছে ভয়ংকর কুৎসিত।

জিশানের বমি পেয়ে গেল। আচমকা 'ওয়াক' তুলল দুবার।

মূর্তি জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

জিশান মুখে হাত চাপা দিয়ে কাশল, বলল, 'কিছু না।'

পান্ডা ওর দিকে একবার তাকাল শুধু—কিছু বলল না।

দশ কি পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে পান্ডা গাড়িটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এল যাকে স্বপ্নের জগৎ ছাড়া আর কিছু বলে ভাবা যায় না। একটা বিশাল এলাকা জুড়ে নানান উচ্চতার বিমূর্ত ছাঁদের বাড়ি। তার সর্বত্র উৎসবের আলোকমালা। হাজার রঙের লেসার-ছবি বাড়িগুলোর গায়ে অদ্ভুত ছন্দে চলে-

ফিরে বেড়াচ্ছে।

পান্ডা পার্কিংজোনে গাড়িটা পার্ক করতে-করতে বলল, 'এই কমপ্লেক্সটার নাম "ই-ল্যান্ড"—এন্টারটেইনমেন্ট ল্যান্ড। ফূর্তি-জোনও বলতে পারো। চার কিলোমিটার বাই চার কিলোমিটার এলাকা। টুয়েন্টি ফোর সেভেন খোলা...।'

রিমোট দিয়ে গাড়ির দরজা খুলল পান্ডা। নামতে-নামতে মূর্তিকে বলল, 'এই, শকারগুলো নিয়ে নে। কোমরে ঝোলাতে হবে।'

জিশান আর মূর্তি অন্য দরজা দিয়ে নামল। পিছনের সিট থেকে শকারগুলো তুলে নিল মূর্তি। জিশানকে একটা দিল, আর বাকি দুটো হাতে করে পান্ডার কাছে গেল।

পান্ডা কিউ-মোবাইলের দরজা বন্ধ করল। তারপর রিমোটের অন্য একটা বোতাম টিপে গাড়িটা 'ফার্মলক' করে দিল।

জিশান অবাক হয়ে সুবিশাল ইলেকট্রনিক হাঙ্গামার দিকে তাকিয়ে ছিল। যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকেই এন্টারটেইনমেন্ট। নন-স্টপ বিনোদন।

চঞ্চল আলোর রঙিন আভা জিশান, পান্ডা আর মূর্তির মুখে খেলা করছিল।

ওরা তিনজনে এগোল 'ই-ল্যান্ড'-এর দিকে। দেখে মনে হচ্ছিল, পিস ফোর্সের তিনজন গার্ড ব্যস্তভাবে ডিউটিতে চলেছে।

স্বপ্নের জগতে ঢুকে পড়ল জিশান। ওর মনে হল, ও অলৌকিক কোনও শহরে এসে পড়েছে। যেখানে অটোমেশান, ইলেকট্রনিক্স আর অপটিক্স তাদের 'ছলাকলা'র মরণপণ প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

পান্ডা আর মূর্তির সঙ্গে হাঁটছিল জিশান। সব জায়গায় স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করার ব্যাপারটা ওরা দুজন সামলাচ্ছিল। আর জিশান ওপরদিকে তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আশ্চর্য জগতের অভিঘাতটা শুষে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

পান্ডা ওকে বলছিল, '. এখানে দোকানপাট আছে, ব্যাঙ্ক আছে, ক্লাব আছে, গেম্‌স পারলার আছে, নকল সমুদ্র আছে, সি-বিচ ছাড়া কী নেই!'

কথা বলতে-বলতে একটা মল-বিল্ডিং-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঢুকে পড়ল ওরা।

চারিদিকে শুধু কাচ আর কাচ, আলো আর আলো। আলো যেমন নানান রঙের, কাচের দেওয়ালগুলোও তাই। এ ছাড়া রয়েছে স্বচ্ছ ফাইবারের সিঁড়ি আর মেঝে। সিঁড়ি চলছে, কোথাও-কোথাও মেঝেও।

তাজ্জব জিশানকে নিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল পান্ডা আর মূর্তি। তারপর একটা গেম্‌স পারলারের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। পারলারের কাচের দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে মূর্তি বলল 'ওই দ্যাখো—।'

জিশান তাকাল। এবং নিজেকে দেখতে পেল।

কাচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে, পারলারের ভেতরে জায়ান্ট টিভি চলছে এবং সেখানে জিশানকে দেখা যাচ্ছে।

পান্না জিশানের হাত ধরে টানল। ওরা তিনজন পারলারে ঢুকে পড়ল।

জিশান অবাক হয়ে দেখল, টিভিতে কিল গেমের প্রোমো চলছে। তাতে জিশানের নানারকম ক্লিপিংস দেখানো হচ্ছে। জিশান ঘরে পায়চারি করছে, খেলার মাঠে বল খেলছে, অ্যানালগ জিমে ব্যায়াম করছে, কানে হেডফোন লাগিয়ে শুটিং প্র্যাকটিস করছে, কমব্যাট পার্কে কোমোডো ড্রাগনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, টিভি ক্যামেরাম্যানকে দু-হাতে মাথার ওপরে তুলে নিয়েছে, স্নেক লেকে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে, জাব্বার সঙ্গে মরিয়া লড়াই চালাচ্ছে...।

এবং তারপর কিল গেমের বিজ্ঞাপন। খুব শিগগিরই কিল গেমের দিনক্ষণ জানানো হবে। সেই খেলার সিধা প্রসারণের সময় যাঁরা বিজ্ঞাপন দিতে চান তাঁরা অন-লাইনে বুকিং করুন। তারপরই পরদায় ফুটে উঠছে কয়েকটি ওয়েবসাইট আর সাইবার লিংকের অ্যাড্রেস।

পারলারে ভিড় ছিল। নানান বিডিও গেম খেলায় ব্যস্ত নানাবয়েসি ছেলে-মেয়ে। তা ছাড়া আরও অনেকে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। জিশান লক্ষ করল, ওকে নিয়ে কিল গেমের প্রোমো চলছে দেখে টিভির সামনে ভিড় বাড়ছিল। এবং টিভিতে ওর মুখ দেখানোমাত্রই হইচইয়ের জোয়ার উঠছিল।

আশপাশের মানুষজনের কথা শুনতে পাচ্ছিল জিশান।

কেউ ওর মূর্তির প্রশংসা করছিল। কেউ বলছিল, 'লোকটাকে কী হ্যান্ডসাম দেখতে!' কেউ বলছিল, জাব্বার মতো একজোড়া পালোয়ানের সঙ্গে ও অনায়াসে মহড়া নিতে পারে। আবার আর-একজনের মন্তব্য : 'আমার মনে হচ্ছে ছেলেটা কিল গেমে জিতে যাবে...।'

পান্না জিশানকে খোঁচা দিল। জিশান ওর দিকে ফিরে তাকাতেই পান্না চোখ টিপল। যার অর্থ হল : 'দেখছ, সবাই তোমার কথা বলছে!'

যতক্ষণ কিল গেমের প্রোমো চলল ততক্ষণ টিভির সামনে ভিড় লেগে রইল। দর্শকদের উচ্ছ্বাস জিশানকে অবাক করে দিল। গার্ডরা ওকে যে পছন্দ করে তার পিছনে হয়তো শ্রীধর পাট্টাকে অপছন্দের কারণ রয়েছে। কিন্তু পারলারে বিনোদনের সন্ধানে আসা জনগণ? ওরা কি চাইছে জিশানের ভালো হোক, জিশান জিতুক? নাকি আসলে চাইছে কিল গেম জমে উঠুক?

পান্না আর মূর্তির হাত ধরে টান মারল জিশান। তারপর ওরা তিনজনে গেমস পারলার থেকে বেরিয়ে এল।

মূর্তি বলল, 'জিশান, তোমাকে নিয়ে লোক কিন্তু হেভি এক্সাইটেড। তোমার বিজ্ঞাপনগুলোও পাবলিককে হেভি টানছে...।'

'বিজ্ঞাপন? তার মানে?' জিশান অবাক হয়ে মূর্তিকে দেখল।

তখন পান্ডা বলল, 'প্রায় একমাস ধরে সিন্ডিকেট এই কাজটা শুরু করেছে। তোমার ডিফারেন্ট টাইপের ক্লিপিংস দেখিয়ে তার ফাঁকে-ফাঁকে নানান প্রোডাক্টের অ্যাড চলছে। এরপর...কিল গেমের আগে...তোমাকে নিয়ে ক'দিন শুটিং চলবে। নতুন-নতুন জিনিসের বিজ্ঞাপন। গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া থেকে শুরু করে প্রোটিন ফুড আর ক্রাঞ্চি মিল পর্যন্ত...।'

জিশান চুপ করে রইল। একটা ক্লাবের পাশ দিয়ে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। তার কাচের দেওয়ালে রঙিন এল. সি. ডি. ডিসপ্লে-তে ইংরেজিতে লেখা 'ফানডম'। তার নীচে লেখা : 'ডু নট এন্টার ইফ য়ু আর অ্যাবাভ সিক্সটিন।'

জিশান সেদিকে তাকিয়ে আছে দেখে পান্ডা হেসে বলল, ' "ই-ল্যান্ড"-এ যে ক'টা ক্লাব আছে তার একটার নামও নাইট ক্লাব নয়। কেন জানো?'

জিশান পান্ডার দিকে তাকিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল। জানে না।

পান্ডা আর মূর্তি এ ওর গায়ে চাপড় মারল, হাসাহাসি করল। তারপর মূর্তি বলল, 'ক্লাবগুলো দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে বলে এগুলোর নাম নাইট ক্লাব নয়।'

'তা ছাড়া নানান ক্লাবের নানারকম বয়সের লিমিট আছে।' পান্ডা বলল। আঙুল তুলে 'ফানডম'-এর নীচের লেখাটা দেখাল : 'ওই যে...ওইরকম।'

এরপর "ই-ল্যান্ড"-এর আরও অনেকগুলো বিল্ডিং ঘুরে দেখল ওরা। ট্রান্সপারেন্ট ফাইবারের এসকালেটরে চড়ে বহুবার পর-নীচ করল। হরেকরকম বিনোদনের পসরা দেখে জিশানের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। বেশ কয়েকটা দোকানে জায়ান্ট স্ক্রিন টিভিতে নিজেকে দেখতে পেল জিশান। ওকে নিয়ে তৈরি দু-তিনটে বিজ্ঞাপনও দেখল।

আশ্চর্য! এই বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা ও কিছুই জানে না।

পান্ডা আপনমনে বলল, 'তোমাকে সিন্ডিকেট প্রাইজ মানি দিচ্ছে ঠিকই—কিন্তু সেই টাকা কড়ায়-গন্ডায় উশুল করে নিচ্ছে। তোমাকে নিয়ে ওরা মিডিয়া হাইপ তৈরি করছে। কিল গেমের ব্যাপক পাবলিসিটি করছে—তাতে প্রচুর অ্যাড পাওয়া যায়।'

জিশান চুপ করে রইল। সিন্ডিকেটের অঙ্কটা মনে-মনে বোঝার চেষ্টা করল। বিজ্ঞাপনের শুটিং করতে হবে ওকে! এত পাবলিসিটি দিয়ে জনপ্রিয় করে তুলে তারপর ফায়দা তোলার পালা। আর সবশেষে রয়েছে পাঁঠাবলির লাইভ টেলিকাস্ট।

'ই-ল্যান্ড' থেকে বেরিয়ে ওরা কিউ-মোবাইলে উঠে আবার রওনা দিল। নানান রাস্তা ঘুরে জিশানের ছোটবেলার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল।

জায়গাটা দেখে জিশানের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। পুরোনো কিছুই আর নেই। নতুন-নতুন সব বাড়ি-ঘর তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

'এইখানে একটা দোতলা বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে আমি থাকতাম।' পা[illegible]কে তাকিয়ে বলল জিশান। মনে-মনে ও ছোটবেলায় ফিরে যাচ্ছিল। ওদের বাড়িটা ঠিক কোন জায়গায় ছিল সেটা আঁচ করার চেষ্টা করছিল।

রোজ ঘুম থেকে উঠে যে-বারান্দাটায় গিয়ে ও দাঁড়াত সেটা কোনদিকে ছিল যেন? সূর্যটা কোনদিক থেকে ওঠে? কোনটা পুবদিক?

আকাশের দিকে তাকাল জিশান। একটুকরো চাঁদ, তারা, আর অন্ধকার। পুবদিক কোনদিকটা হতে পারে সেটা আন্দাজ করে 'বারান্দা'টা আবার খুঁজল। পেল না।

সবকিছু কেমন গুলিয়ে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জিশান। শুধু বিড়বিড় করে বারবার বলতে লাগল, 'এইখানে আমাদের বাড়ি ছিল। এইখানে...আমাদের... বাড়ি...ছিল...।'

বাবার ডাক শুনতে পেল জিশান। বাবা ওকে ডাকছে ঃ 'জিশু! জিশু—!'

জিশান চোখ মুছল। চোয়াল শক্ত করল। পুরোনো মুছে গিয়ে ভালোই হয়েছে। মনে-মনে ভাবল জিশান। পুরোনো সবকিছু থাকলে স্মৃতি ওর চোখের জলে আরও ঢেউ তুলত। 'পুরোনো'কে ঝাপসা করে দেওয়ার জন্য 'নতুন'কে ধন্যবাদ জানাল। মনটা আরও শক্ত করতে চাইল।

শহরের আরও অনেক জায়গা ঘুরিয়ে দেখানোর পর কিউ-মোবাইল জিপিসি-র পথ ধরল। এই কয়েকঘণ্টার শহর ভ্রমণে জিশান নিজের অনেক ছবি দেখেছে। বেশ কয়েকটা বিলবোর্ডেও জিশান পালচৌধুরী হাজির। চারিদিকে ওর এত ছবি!

'ছবি' হয়ে যাওয়ার আগে এখানে বোধহয় এরকমটাই হয়।

●

গেস্টহাউসে নিজের রুমে ফিরে আসার পর জিশানের খুব ক্লান্ত লাগছিল—তবে চোখে ঘুম আসছিল না। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিল। চোখের নজর ঘরের সিলিং-এর দিকে। সেদিকে তাকিয়ে এক অন্ধকার সিনেমার পরদায় ও যেন নিজের জীবনের ছায়াছবি দেখছিল।

গত কয়েকটা মাসে কত ঘটনাই না ঘটে গেছে ওর জীবনে! ওর ওল্ড সিটির বস্তিবাড়িতে শ্রীধর পাত্রা হাজির হওয়ার পর থেকেই শান্ত সুন্দর জীবনটা

কেমন বদলে গেল। ওর ওল্ড সিটির হতমান অবস্থার মধ্যে কোনও সৌন্দর্য ছিল না ঠিকই, কিন্তু ওর জীবনের ভেতরে সৌন্দর্য ছিল।

আর এখানে! নিউ সিটির অঙ্গসজ্জায় সৌন্দর্যই প্রথম এবং শেষ কথা। কিন্তু তার গভীরতা শরীরের ত্বক পর্যন্তই। তারপর...ত্বকের গভীরতার পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে কুৎসিতের জয়জয়কার। তাই কিল গেমে 'মৃত্যুপথযাত্রী' জিশানকে নিয়েও ওরা নির্লজ্জ ব্যাবসা শুরু করে দিয়েছে।

কেন জানি না, জিশান মনে-মনে ভীষণ ভেঙে পড়ছিল। আর কতদিন...আর কতদিন ও কুৎসিতের সঙ্গে এরকম মরিয়া লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে?

কিল গেম পর্যন্ত সুপারগেমস্ কর্পোরেশন জিশানকে নিয়ে চূড়ান্ত ব্যাবসা করবে। তারপর...কিল গেম শেষ হলে...অথবা, জিশান শেষ হলে...ওরা নতুন আর-একজন 'সুপারহিরো'র সন্ধানে নেমে পড়বে।

কিন্তু ওই তিনটে খুনির সঙ্গে 'ক্যাট অ্যান্ড মাউস' গেমে জিশান যদি জিতে যায়!

তা হলে জিশান হয়ে যাবে 'মেগা সুপারহিরো'। ওকে নিয়ে সিন্ডিকেট আরও কিছুদিন রমরমা ব্যাবসা চালাবে। প্রাইজমানি ছাড়াও ওকে নিউ সিটির একটা ফ্ল্যাট গিফ্‌ট করবে। আরও সব নানান কোম্পানি ওকে হরেকরকম উপঢৌকন দেবে। তার মধ্যে গাড়ি তো আছেই! তা ছাড়াও থাকবে আধুনিক জীবনযাত্রার নানান সরঞ্জাম।

তখন মিনি আর শন্টুকে নিয়ে জিশান ওল্ড সিটি ছেড়ে চলে আসতে পারবে। চিরকালের জন্য। দুঃখের জগৎ থেকে ওরা তিনজন চলে আসবে সুখের জগতে।

কিন্তু ওল্ড সিটির বাকি মানুষজন? ওরা কি ছন্নছাড়া জীবন আর অভাবের জাঁতাকলে পিষে মরবে?

যতই চিন্তা করছিল ততই জিশানের পাগল-পাগল লাগছিল। ও বিছানায় ছটফট করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ও বিছানায় উঠে বসল। বল রিমোটের বোতাম টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দিল। তারপর দেওয়ালের প্লেট টিভিটার দিকে তাকাল।

জিপিসি-র এই গেস্টহাউসে আসার পর জিশান [illegible] দু-এক সপ্তাহ নানান চ্যানেলের প্রোগ্রাম দেখেছিল। তারপর থেকে ও [illegible]-এর চ্যানেল আর চালায় না। ওইসব চ্যানেল দেখলে ওর মনের ওপর চাপ পড়ে। তাই ও নিয়ম করে দু-চারটে নিউজ চ্যানেল ছাড়া অন্য কোনও চ্যানেল আর দ্যাখে না। আর বেশিরভাগ সময় টিভিটাকে অন-লাইন ইনটারঅ্যাকটিভ মোডে রাখে, যাতে সিন্ডিকেট বা সুপারগেমস্ কর্পোরেশনের সঙ্গে ওর যোগাযোগ থাকে। এ ছাড়া টিভিটাতে একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে—সিন্ডিকেট যখন ওর সঙ্গে যোগাযোগ

করতে চায় তখন যদি টিভিটা অফ থাকে তা হলে সেটা নিজে থেকেই অন হয়ে যায় এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ চ্যানেল চালু হয়ে যায়।

আর টিভি যদি চালু থাকে এবং তাতে অন্য চ্যানেল চলতে থাকে, তা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চ্যানেল সোয়াপ হয়ে গিয়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ চ্যানেল পরদায় চলে আসে।

টিভির দিকে তাকিয়ে জিশান ওর আজকের নাইট সাফারির কথা ভাবছিল। ভাবছিল, ওকে নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের মাতামাতির কথা।

রিমোটের বোতাম টিপে টিভি অন করে দিল জিশান। চ্যানেল সার্ফ করে একটা গেমের চ্যানেলে গিয়ে থামল। লাইভ টেলিকাস্ট নয়—সেখানে তখন একটা 'হাংরি ডলফিন' গেমের ভিডিয়ো রেকর্ডিং দেখাচ্ছে। সমুদ্রের জলে ডলফিনের সঙ্গে মিশে আছে ডলফিনের 'ছদ্মবেশ' নেওয়া হিংস্র হাঙর। তাদের মধ্যে সাঁতারে বেড়াচ্ছে প্রতিযোগী।

হঠাৎই শুরু হল কমার্শিয়াল ব্রেক। আর সেই ব্রেকের সময়ে টিভির পরদায় দেখা দিল জিশান। ওকে নিয়ে বিজ্ঞাপন শুরু হল।

অ্যানালগ জিমে জিশান ব্যায়াম করছে। বাটারফ্লাই ক্লাপস। রুমে এসি থাকা সত্ত্বেও ওর ত্বকের ওপরে ঘামের চকচকে স্তর। হঠাৎ সেই ছবি সরে গিয়ে একটা ভাইটালাইজিং পাউডারের কনটেইনারের ছবি। পাশে একজন স্লিম সুন্দরী তরুণী। মিষ্টি গলায় পাউডারের নানান গুণপনার কথা বলছে। পাউডারের কৌটোটাকে উষ্ণ আদরের ভঙ্গিতে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। আদুরে ঢঙে হাস্কি ভয়েসে বলছে, 'তুমি আমার। আমার তুমি।' তারপরই জিশানের হাসিমুখ। আবার জিশানের ব্যায়াম। আবার পাউডারের কৌটো।

বিজ্ঞাপনটা শেষ হওয়ার পর জিশান ভাবতে বসল। টিভিতে তখন অন্য বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে গেলেও সেদিকে ওর মন ছিল না।

এই বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা জিশান জানতেও পারেনি। জিশানকে জানানোর দরকারও মনে করেনি কেউ। ওর ব্যায়ামের ছবির ক্লিপিং-এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে ওই ভাইটালাইজিং পাউডারের ছবি, মেয়েটির ছবি। তারপর এডিটিং-এর কারসাজিতে ছবিগুলো বিনুনির মতো জড়িয়ে দিয়েছে। তারই মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে জিশানের হাসিমুখ। কোনওসময় ও হয়তো মনোহর বা খোকনের সঙ্গে হাসি-মশকরা করছিল, তখন লুকোনো টেলিক্যামেরায় তুলে নিয়েছে ওর হাসিমুখের ছবি।

জিশানের খুব রাগ হল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও বুঝল, এ রাগের কোনও মানে নেই। ওর ফোঁসফোঁসানিই সার—ওর কামড়ে কোনও বিষ নেই।

হতাশা আর ক্ষোভে ওর চোখ জ্বালা করতে লাগল।

বিছানার মাথার দিকে তাকাল জিশান। বালিশের পাশেই পড়ে আছে এম.

ভি. পি.—মাইক্রোভিডিয়োফোন।

মিনিকে ভীষণ ফোন করতে ইচ্ছে করল।

দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত দেড়টা।

মিনি নিশ্চয়ই এখন ঘুমিয়ে আছে। আর মা-কে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট শানু। তা ছাড়া এই মাঝরাতে মিনির এম. ভি. পি. নিশ্চয়ই সুইচ অফ করা আছে।

এতসব ভাবনার পরেও জিশান শরীরটা ঝুঁকিয়ে হাত বাড়িয়ে এম. ভি. পি.-টা মুঠো করে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে ওর মনে হল, মিনি এসে গেছে হাতের মুঠোয়।

সোজা হয়ে বসল। এম. ভি. পি.-টা মুখের সামনে তুলে ধরল। তারপর বোতাম টিপল।

আজকের রাতটার মধ্যে বোধহয় ম্যাজিক আছে। কারণ, ফোনের বাজনা তৃতীয়বার শেষ হওয়ার আগেই মিনি ফোন ধরল।

ছোট্ট এল.সি.ডি. পরদায় ওকে দেখতে পেল জিশান।

ঘরের অন্ধকারে ভাসছে মিনির সদ্য-ঘুম-ভাঙা মুখ। ফোনের আলোর আভায় ওর মুখটা অলৌকিক দেখাচ্ছে।

'মিনি—।'

'জিশান! কী হয়েছে? এত রাতে!' ঘুম জড়ানো গলায় মিনি বলল। ওর কথায় আশঙ্কা উঁকি মারছে।

'না, কিছু হয়নি।'

'না—বলো। তুমি লুকোচ্ছ। প্লিজ বলো—।'

'না, মিনি—কিচ্ছু না। বিশ্বাস করো।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আসলে তোমাকে ভীষণ ফোন করতে ইচ্ছে করল। দেখতে ইচ্ছে করল। আমি...শুধু-শুধু তোমার ঘুম ভাঙালাম...।'

'তাতে কী আছে! তোমার ফোন আসতে পারে ভেবে আমি রোজ ফোনটা অন করে বালিশের পাশে রেখে শুই।'

'আমার এখানে আর ভাল্লাগছে না।' বাচ্চা ছেলের বায়নার ঢঙে বলল, 'আমার কিছু ভাল্লাগছে না।'

'ভালো লাগবে কেমন করে! নিউ সিটি মোটেই ভালো লাগার জায়গা নয়...সবাই জানে...।'

জিশান আর মিনি কথা বলতে লাগল। ওদের কথা আর ফুরোতে চায় না। কিন্তু বরাদ্দ দশমিনিট ধীরে-ধীরে ফুরিয়ে আসছিল।

জিশান বেশ বুঝতে পারছিল, ওরা দুজনেই কিল গেমের কথা এড়িয়ে যাচ্ছে। যেন ব্যাপারটাকে অস্বীকার করলেই ওটা উধাও হয়ে যাবে।

সময় ফুরিয়ে আসছিল বলে জিশান মিনিকে ওর নাইট সাফারির কথা বলল। বলল পান্ডা আর মূর্তির সাহায্যের কথা। আনমোলের কথা। সিকিওরিটি কন্ট্রোল রুমের অফিসারের কথা।

পান্ডা আর মূর্তির কথা মিনি জিশানের কাছে আগেই শুনেছিল। এখন জানতে পারল, আরও অনেক সিকিওরিটি গার্ড জিশানের ভালো চাইছে। চাইছে জিশান জিতুক।

জিশান এবার বিজ্ঞাপনের কথা বলল। বলল, কীভাবে সিন্ডিকেট ওকে বিপণনের কাজে লাগাচ্ছে।

'...আমার হাত-পা বাঁধা। কিছু করতে পারছি না। মিনি, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে...।' জিশান কেঁদে ফেলল।

'হ্যাঁ—জানি, তোমার ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায় কী। তোমাকে সহ্য করতেই হবে। প্লিজ, কেঁদো না...।'

জিশান চোখের জল মুছে বলল, 'এরপর হয়তো ওরা স্লিপিংস ইউজ না করে আমাকে দিয়ে অ্যাডের শুটিং করাবে। একটা বলির পাঁঠাকে নিয়ে আর কত হেনস্থা করবে ওরা! ওই শয়তানটা...ওই হারামজাদা শ্রীধর পাট্টা...ওকে খতম করতে পারলে...।'

'শোনো, জিশান।' ওকে বাধা দিয়ে বলল মিনি, 'এইসব হেনস্থার জবাব তোমাকে দিতে হবে কিল গেমে।'

'কিল গেমে!' হঠাৎ করে কিল গেমের প্রসঙ্গ সরাসরি উঠে আসায় জিশান অবাক হল। মিনির ছবির দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ। কিল গেমের দিন ঠিক হলে ওই গেম সিটিতেই তোমাকে জবাব দিতে হবে। ওই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—।'

চোয়াল শক্ত করল জিশান : 'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ।' মাথা নাড়ল : 'ওই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই জবাব দিতে হবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'চব্বিশ ঘণ্টা নয়—তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিটের মধ্যে—।'

'হ্যাঁ। তুমি...।'

দশ মিনিট ফুরিয়ে গেল। এম.ভি.পি.-র পরদায় মিনির ছবি দপ করে নিভে গেল।

জিশান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ও যেন এতক্ষণ স্বর্গে ছিল—এই মুহূর্তে নরকের অন্ধকূপে খসে পড়ল।

এম.ভি.পি.-টা সুইচ অফ করে বালিশের কাছে ছুড়ে দিল। বল রিমোটের বোতাম টিপে প্লেট টিভি অফ করল। তারপর ঘরের আলোটাও নিভিয়ে দিল।

অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর।

সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিল।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে! হঠাৎই টিভির ইনটারঅ্যাকটি
ল দপ করে চালু হয়ে গেল।

আলোর ঝলকানিতে চমকে উঠল জিশান। তাকাল টিভির দিকে।

একজন সুন্দরী মিষ্টি গলায় ওর নাম ধরে ডাকল : 'জিশান! জিশান

মেয়েটি বোধহয় ভেবেছে জিশান ঘুমিয়ে আছে।

আরও দু-একবার ডাকার পর জিশান বিছানা ছেড়ে উঠল। টিভির কা
বলল, 'বলো। জেগে আছি।'

হাসল মেয়ে : 'সরি, জিশান। ডিসটার্ব করছি। তোমাকে আমাদের পি
র্সের মাননীয় মার্শাল ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি রেডি হয়ে নাও। পিস ফোর্সে
রা ঠিক সাত মিনিট পর তোমাকে নিতে আসবে। থ্যাংক য়ু।'

ইনটারঅ্যাকটিভ চ্যানেল অফ হয়ে গেল। মেয়ে মিলিয়ে গেল।

রিমোটের বোতাম টিপে আলো জ্বালল জিশান। ওয়ার্ডরোবের কাছে গি
খুলল। একটা ছাই রঙা কর্ডের প্যান্ট আর নীল রঙের পোলো নেক টি
পরে নিল।

শ্রীধর পাট্টা ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন!

কিন্তু কেন?

সাত মিনিট শেষ হতে না হতেই দরজায় কলিংবেল। গার্ডরা এসে গেছে

দরজা খুলল জিশান। পিস ফোর্সের তিনজন গার্ড। অভিব্যক্তিহীন মুখ
রে শকার—সুইচ অন করা।

না, গার্ডদের একটা মুখও ওর চেনা নয়।

'চলো—মাননীয় মার্শাল...।' ওদের একজন বলতে শুরু করেছিল।

'জানি।' লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে জিশান বলল। এবং ওদের সঙ্গে রওন

করিডর ধরে যেতে-যেতে জিশান ওদের কাছে বারবার জানতে চাইল
পাট্টা ওকে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ওরা কোনও জবাব দি

আরও অনেকবার জিশান একই কথা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তা সত্ত্বে
ও জবাব নেই।

এলিভেটরে করে নামার সময় জিশান ওদের অনুনয় করে বলল, 'প্লিজ
। যদি জানা থাকে আমাকে বলো। প্লিজ।'

গার্ডরা নিজেদের মধ্যে একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর বল

গল্ল। ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আজ রাতে গেস্টহাউস ছেড়ে বেরিয়েছিলে?'

জিশান কোনও উত্তর দিতে পারল না। হতবাক হয়ে গার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আর একজন গার্ড বলল, 'তুমি জিপিসি-র ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরিয়েছিলে। মনে হয় শ্রীধর পাত্রা সেটা জানতে পেরেছেন...।'

জিশানের বুকের ভেতর দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নামতে শুরু করল। আবার তা হলে 'রোলারবল'?

কিন্তু শ্রীধর জানতে পারলেন কেমন করে।

॥ *প্রথম খণ্ড সমাপ্ত* ॥

তেইশ ঘন্টা ষাট মিনিট

অনিশ দেব



নায়ক জিশান।

রিয়্যালিটি শো। কিল গেম!

মৃত্যু ঝুলছে সূক্ষ্ম সুতোয়!...

অসহ্য টেনশন আর রুদ্ধশ্বাস রহস্যের মিশেলে বাংলাসাহিত্যের দীর্ঘতম ফিউচারিস্টিক থ্রিলার।

